এ যুগের যুদ্ধ

এ যুগের যুদ্ধ

গোপাল হালদার

পুথিঘর
২২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—সতীশচন্দ্র রায়
২২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর, ১৯৪২

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে
যুদ্ধ-বিজ্ঞানে অক্লান্ত জিজ্ঞাসার জন্য
শ্রীমান্ শিবশঙ্কর মিত্রকে
যুদ্ধ-বিদ্যায় অশ্রান্ত উৎসাহের জন্য
'এ যুগের যুদ্ধ'
সমর্পণ করিলাম

নিবেদন

প্রধানত একটি কথাই আমার বলিবার ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে আরও-একটি কথা আমার নিবেদন করা দরকার। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইবার কথা তাহার পরে আজ প্রায় তিন মাস হইতে চলিয়াছে। এই বিলম্বের জন্য দায়ী লেখক। প্রকাশকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় লেখকের জন্য; লেখকেরও চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হয় তাহার অসুস্থতার জন্য। পাঠকবর্গ প্রকাশককে তাই অপরাধী করিবেন না, সম্ভব হইলে ক্ষমা করিবেন লেখককেও—এইটিই আমার নিবেদন।

বলিবার কথা এই যে, আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নই, অ-ব্যবসায়ী; আমার লেখাও অ-ব্যবসায়ীর জন্য। কিন্তু বাংলা দেশে যুদ্ধ সম্বন্ধে আজ অ-ব্যবসায়ী কাহাকেও ভাবিতে সাহস হয় না। তবে কে-কে এই গ্রন্থ পড়িবেন না, আমি তাহাই বলিতে চাই—(১) যাঁহারা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সংবাদের অপেক্ষাও অতিরিক্ত সংবাদ রাখেন; যেমন, 'চিয়াং কাইশেক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন চীন হইতে বিতাড়িত হইয়া'; 'টিমোশেংকোর জেল হইয়াছে', 'মস্কো (১৯৪১এ) সন্ধির জন্য আবেদন করিয়াছে'; ইত্যাদি। (২) যাঁহারা বার্লিন, টোকিও, রোম, সাইগন, বা লণ্ডন ইত্যাদি বেতারের উপাদেয় বাগ্‌যুদ্ধ বা 'বিজ্ঞাপন' লইয়া গবেষণা করেন। (৩) যাঁহারা 'এক কথায় যুদ্ধে কে জিতিবে, কে হারিবে' জানিতে

চান। (৪) যাঁহারা ষ্ট্র্যাটেজির সূক্ষ্মতম হিসাব দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, '২২শে আগস্ট, ১৯৩৯-এ লণ্ডনে জার্মানরা পৌছিবে'; 'হিটলার মস্কৌতে পৌছিবেন ১৭ই নবেম্বর, ১৯৪১এ', ইত্যাদি। (৫) যাঁহারা প্রত্যেকটি যুদ্ধের ট্যাকৃটিকাল ফলাফল আঁাক কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন। (৬) যাঁহারা যুদ্ধের রূপ বুঝিবার জন্য মানচিত্র দেখেন না, দেখেন পাঁজি। (৭) যাঁহারা আত্মিক বলের পরিমাণ করিয়া যুদ্ধ বুঝেন; যেমন, 'হিটলার ব্রহ্মচারী, মাছ-মাংস খান না; অতএব তাঁহার জয় অনিবার্য'। (৮) যাঁহারা মনে করেন হিটলারের পরাজয় ঘটিতে আর দেরি নাই, ইত্যাদি। ইঁহারা এই গ্রন্থ যেন না পড়েন। আমি সাংবাদিক; আমার উপাদান সংবাদপত্রের মারফৎ পাওয়া, সহজ-বোধ্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, তাহা কোথাও গোপন করি নাই। যাঁহারা সংবাদ-পত্রের সংবাদ পড়িয়াই আমার মত 'এ যুগের যুদ্ধ' বুঝিতে চান, আমি তাঁহাদেরই এই গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি। এক জন সহযাত্রীর সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইবে। দেখিবেন, এ আলোচনা আছে কতটুকু আর নাই কতখানি; অনেক কথা এত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেই পাঠক ভুল বুঝিতে পারিবেন; অনেক কথা আমার এত সামান্য জানা যে, ইচ্ছা না করিলেও পাঠক ভুল ধরিতে পারিবেন। লেখার দোষে ও ছাপার দোষে কিছু কিছু ভুল বুঝিবার কারণ রহিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে 'সংযোজনী ও সংশোধনী'তে যতটুকু পারি তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই সহযাত্রীদের কাছেই আমার একটি কথা বলিবার ছিল :—

এ গ্রন্থ না পড়িলেও যেন তাঁহারা প্রতিদিনই যুদ্ধের সংবাদ পড়েন—কোন্‌টি 'জ্ঞাপন' ও কোন্‌টি 'বিজ্ঞাপন' তাহা ধরিতে দেরি হইবে না;—আর পড়িবার সময়ে মানচিত্রের যেন তাঁহারা সাহায্য গ্রহণ করেন।

এই কথা কয়টি এই গ্রন্থের ভূমিকা নয়, নিবেদন মাত্র। কারণ সমস্ত গ্রন্থখানিই এযুগের এই অসমাপ্ত মহাকাব্যের ভূমিকা স্বরূপ।

পাটনা

১৭ই নবেম্বর, ১৯৪২

লেখক

গ্রন্থ-সূচী

যুদ্ধের গোড়ার কথা

পৃথিবী আজ রণোন্মাদ। এই মুহূর্তে তাহার পক্ষে আর অন্য কোনো কথা ভাবাই অসম্ভব। যুদ্ধের কথাই এখন ভাবিতে হইবে, যুদ্ধের হিসাবেই দেখিতে হইবে সমস্ত কিছু। কারণ, সমরক্ষেত্রে একবার ভাগ্য নির্ণীত হইয়া গেলে সেই নির্দেশ আর সহজে পাল্টানো যায় না। পৃথিবীও আজ তাই সেই যুদ্ধের কথাই ভাবিতেছে, যুদ্ধের হিসাবই করিতেছে।

কিন্তু যুদ্ধের হিসাব সহজ নয়। যুদ্ধক্ষেত্র আজ বহুবিস্তৃত—প্রায় পৃথিবী জোড়া—নিত্য নূতন যুদ্ধক্ষেত্র দেখা দিতেছে। তাহার উপর প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের যুদ্ধই আজ বহু বিচিত্র—নরওয়ের, ফ্রান্সের, ক্রীটের, মালয়ের প্রত্যেকটি যুদ্ধেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধ-কালের মধ্যেই—যুদ্ধ যখন চলিতেছে—তখনি নিত্য-নূতন যুদ্ধাস্ত্র বাড়িতেছে। যুদ্ধের নীতি (War Policy) ও যুদ্ধের পদ্ধতি বা টেকনিক (Technique) তখনি আবার দিনে দিনে গড়িয়া উঠিতেছে।

অবশ্য একটা কথা আছে—একেবারে ন[illegible] হয়তো এই সব দিকে কিছুই হয় না। কোনো নূতন অস্ত্রই হয়তো একেবারে নূতন নয়, কোনো নূতন যুদ্ধপদ্ধতিও তেমনি নূতন আবিষ্কার নয়। আর রণনীতি (War policy) হয়তো পিছনকার রাজনীতিরই জের; সমর-সমাবেশ (Strategy) ও রণকৌশল (Tactics) হয়তো চিরন্তন প্রয়াসেরই নূতন প্রয়োগ মাত্র। তাহা ছাড়া, যাহা কিছু নূতন অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ-কৌশল দেখা দেয় তাহা কাটাইবার মত অস্ত্র-শস্ত্র, কৌশলও শীঘ্রই আসিয়া জুটে। যেমন, 'ম্যাগনেটিক্ মাইন'। মাইনের উহা একটা প্রকারভেদ মাত্র। আর এই 'গোপন অস্ত্র' হিটলার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার দশদিনের মধ্যেই তাহার গুপ্তমন্ত্র ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা ধরিয়া ফেলিলেন। তখনি তাহা এড়াইবার উপায়ও বাহির হইয়া গেল। এইরূপ ট্যাংক, বিমান, কামান লইয়া দুই পক্ষে পাল্লা চলিয়াছে, কেহই কাহাকে একেবারে ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না। যেখানে দুই পক্ষই প্রায় সম স্তরের সেখানে এক পক্ষের আবিষ্কার অন্য পক্ষও সহজেই গ্রহণ করে। তবে আজিকার জিনিস কাল পুরানো হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালে নূতন আবিষ্কারের তাগিদ সর্বাপেক্ষা বেশি; তাই অস্ত্র-শস্ত্রের এই দশা ঘটিতেছে খুব তাড়াতাড়ি। তবু মোটামুটি মনে রাখা ভালো—History teaches us that no entirely new weapon has radically affected the course of any war। কথাটি লিডেল্ হার্টের (*The Current*

of War p. 16)। ইহার মধ্যে দুইটি কথায় তবু জোর দেওয়া দরকার—*entirely* এবং *radically*। **একেবারে** নূতন এমন কোনো অস্ত্র বড় আবিষ্কার হয় না যাহাতে যুদ্ধের গতি **মৌলিক** পরিবর্তিত হয়। কিন্তু নূতন অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় আর তাহাতে যুদ্ধের গতিও পরিবর্তিত হয়। যুদ্ধ-কৌশলেরও তেমনি নূতন প্রয়োগ দেখা যায়—এইবারকার যুদ্ধে ট্যাংকের ও বিমানের সহযোগিতায় জার্মানি এমনি কৌশলের প্রয়োগ করে—যাহার সংক্ষেপে নাম বিদ্যুদাক্রমণ বা ব্লিৎসক্রীগ (blitzkrieg) অবশ্য ইহার পিছনে আছে তাহার যুদ্ধের নূতন মতবাদ (Doctrine of War)—যাহাকে বলা চলে সর্বগ্রাসী যুদ্ধ বা টোটেল যুদ্ধ (Total War)। এই সবে মিলিয়া আবার যুদ্ধ একটা নূতন রূপ (nature) গ্রহণ করিয়াছে—নানা ক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্য দিয়া এ যুগের যুদ্ধের সেই রূপ ক্রমশ প্রকটিত হইতেছে।

এক একটি যুদ্ধের হিসাবেও তাই এই সব কথা খতাইয়া দেখিতে হয়—যুদ্ধ-পদ্ধতি, অস্ত্রসজ্জা, রণকৌশল, কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। সেই যুদ্ধে দুই পক্ষের কোন্ দোষগুণ বুঝা গেল তাহা দেখিতে হয়; আর উহার ফলে দুই পক্ষের শক্তির কতটা ক্ষয়-বৃদ্ধি হইল, তাহাও বুঝিয়া লইতে হয়। এক একটি যুদ্ধের হিসাবও এই সব কারণে দরকারী। না হইলে একটি যুদ্ধ হয়তো কিছুই নয়, তাহাতে পূর্ণ যুদ্ধের (War) এক একটা পর্বেরও হয়তো সত্যকার ঠিকানা পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তাহার সাক্ষ্যটা ঠিকমত মিলাইয়া পড়িতে পারিলে যুদ্ধের রূপ আর

যুদ্ধের পরিণতি, দুইয়েরই ইঙ্গিত হয়তো মোটামুটি লাভ করা যায়।

যুদ্ধ বুঝিতে হইলে তাই যুদ্ধের গোড়ার হিসাবটা প্রথম বুঝিয়া লইতে হয়।

এক

যুদ্ধ, রাষ্ট্র, সমাজ

এই যুদ্ধের গোড়ার হিসাব আসলে মানুষের সামাজিক গরমিলের হিসাব—এখানে তাহা আমাদের আলোচনা না করিলেও চলে। 'যুদ্ধ কেন বাধিল?'—যাঁহারা এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই শেষ পর্যন্ত এই উত্তরে গিয়া পৌছিবেন—যুদ্ধ বাধিল অনেকটা ভার্সেইর পাপে; সে পাপেরও পিছনে আছে পুঁজিবাদের সমস্যা, আমাদের ধন-বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা। এই আলোচনায় তাঁহারা তাই ঠেকিবেন গিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে—এই যুদ্ধের পরিণাম এখনো অনেক দূরে—একেবারে ধন-বৈষম্যের অবসানেই হয়তো এ যুগের যুদ্ধের অবসান। এইটা এই যুদ্ধের সামাজিক হিসাব—মূলের হিসাব। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের যে রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাতেও এই সামাজিক হিসাবের জের টানা চলিতেছে, তাহা ভুলিবার উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধকে আমরা এখানে বিশেষ করিয়া যুদ্ধ হিসাবেই দেখিতে চাই—সামাজিক একটা ব্যাধি বা ব্যাধির লক্ষণ হিসাবে দেখিতে চাই না;—মূল সামাজিক হিসাব মনে রাখিয়াই যুদ্ধকে যুদ্ধ হিসাবে দেখিব।

এই কারণেই আমরা যুদ্ধের রাষ্ট্রনীতিক দিকটিকেও এখানে

বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে চাই না। মানুষের রাষ্ট্রও তাহার সমাজ-ব্যবস্থারই একটি রূপ মাত্র—কাজেই রাষ্ট্রনীতিও সমাজনীতির একটি অংশ। আর যুদ্ধ একটা রাষ্ট্রীয় প্রয়াস। সেই হিসাবে যুদ্ধের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় হিসাব ঢুকিবেই। কথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

তথাপি যুদ্ধ-ক্ষেত্রের হিসাব পূর্বাপর মিলাইয়া পড়িতে গেলেই দেখিব—যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রত্যেক যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পিছনে আছে দুই পক্ষের রাষ্ট্র-ক্ষেত্র, তাহাদের রাষ্ট্রনীতি (Politics) আর পররাষ্ট্রনীতি (Foreign politics), তাহাদের রণনীতি (war policy) ও তাহাদের সামরিক পূর্ণ-সমাবেশ (Grand Strategy) ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে—যুদ্ধ আসলে রাষ্ট্রনীতির একটা কৌশল, ক্লাউসেভিৎসের মতে 'true political instrument', তাহার শেষ অস্ত্র।[১] এই কথা অর্থ-শাস্ত্রের

১ পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত মনে করা হয় ক্লাউসে-ভিৎস্‌কে (Clausewitz)। তাঁহার যুদ্ধের বিষয়ে লেখা গ্রন্থই এখনো সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত (*On War*, Tr., J. J. Graham, 1908); তাহা ভিত্তি করিয়াই আলোচনা চলে। ক্লাউসেভিৎস্‌ ছিলেন জার্মান, নেপোলিয়ন যুগের যুদ্ধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষ হইয়াছেন। যেনার (Jena) যুদ্ধে তিনি নেপোলিয়নের হাতে বন্দী হন; আবার রুশ-অভিযান হইতে ওয়াটর্‌লু পর্যন্ত ছিলেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁহার মনীষার ও অভিজ্ঞতার ফল এই গ্রন্থ—এ যুগের যুদ্ধেরও আলোচনা শুরু হয় উহার সূত্র লইয়া। সমরশাস্ত্রের উহাই যেন ব্রহ্মসূত্র।

পণ্ডিত কৌটিল্যও জানিতেন, পশ্চিমের সমরশাস্ত্রের পণ্ডিত ক্লাউসেভিৎস্‌ও বলিতেন ['War is nothing but the continuation of politics by other means']। অবশ্য রাষ্ট্রনীতি ডান পা বাড়াইবে না বাম পা বাড়াইবে, সন্ধি না বিগ্রহ, কূটনীতির (diplomacy) পথ না যুদ্ধের (war) পথ—তাহা ঠিক করে রাষ্ট্রনীতিকগণ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রও তাহা ঠিক করে নিজের যুদ্ধ-শক্তি ও পরের যুদ্ধ-শক্তির হিসাব লইয়া।

যুদ্ধের কর্তৃত্ব

তাহা হইলে যুদ্ধের কর্তৃত্ব কাহার হাতে থাকিবে—রাজনীতিকদের হাতে, না সেনাপতিদের হাতে? এই প্রশ্ন লইয়া তর্ক উঠিয়া থাকে। ইহা যুদ্ধ-কর্তৃত্বের (Leadership) তর্ক। জার্মানদের মধ্যেই এই তর্কটা তুমুল হইত। তাহার কারণও ছিল। জার্মানিতে রাষ্ট্রের সর্বাধিকারবাদ অবশ্য একরকম ফিথ্‌তে-হেগেলের আমল হইতে সুপ্রচলিত। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রে বরাবরই ক্ষাত্রবাদ বা মিলিটারিজমের প্রতিষ্ঠা বেশি; তাই জার্মান রাষ্ট্রের উপর সেনাপতি-মণ্ডলেরও (Reichwehr) প্রাধান্য বেশি। এইজন্যই সেখানে মন্ত্রিমণ্ডলের অপেক্ষা সেনাপতি-মণ্ডলের, রাজনীতিকের অপেক্ষা সেনাপতিদের ক্ষমতা, অন্তত যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই, অপ্রতিহত বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও স্বাভাবিক। ক্লাউসেভিৎসের

মত ইহার মোটেই স্বপক্ষে নয়, ট্রিটস্কেও সেই মতাবলম্বীই।[১] ফন্ মোল্‌টকেরও মনে পরিষ্কার ধারণাই ছিল যে, যুদ্ধ আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালানো হয়,—তাই রাজনীতিকদের কথাই চরম কথা হইবে। ('War is the forcible action of a people in order to achieve, or to maintain a purpose of the state')। কিন্তু তিন-তিনবার চ্যান্সেলর বিসমার্কের সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য ঘ[illegible] একবার তিনি সেনাপতির পদত্যাগ পত্র পর্যন্ত দেন। রাজনী[illegible]কের ক্ষমতা যুদ্ধকালে কোথায় শেষ হইবে তাহা মোটামুটি তি[illegible] নির্দেশও করিয়াছিলেন—Politics must not enter into the operations, যুদ্ধ-কার্যে পলিটিক্সের স্থান নাই। ইহাতেও সীমানা খুব সুচিহ্নিত হইল বলা চলে না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সবই যুদ্ধের সহিত জড়াইয়া পড়ে—সেখানে রাজনীতিকদের কথা শুনিলে চলে কি? গত যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মান সেনাপতি লুডেনডর্ফ আর পথ নাই দেখিয়া চাহিয়াছিলেন অবাধে [illegible]কল শক্তির জাহাজ ডুবাইতে (unrestricted submarine [illegible]r), জার্মান নৌ-বাহিনীর দ্বারা ব্রিটেন আক্রমণ করিতে; [illegible]র্মান

১ "To subordinate political to military considerations is absurd, for it was politics that made the war. Politics is the directing brain, and war only its instrument, and not the other way around. It is the military point of view that must be subordinated to the political".—Clausewitz. "War is only violent form of politics."—Trietske.

রাজনীতিকেরা এই সবে অস্বীকৃত হইলেন। ফন্ লুডেনডর্ফ পরাজয়ের পরে সর্বগ্রাসী যুদ্ধের বা টোটেল যুদ্ধের প্রবক্তা হইলেন, সেনাপতি-মণ্ডলের ক্ষমতাকে অব্যাহত করিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন (*The Total War*—Ludendorff)। তিনি বলিলেন—Politics must wait on war। বড় জোর ক্লাউসেভিৎসের মতকে তিনি এতটুকু মানিতে চাহিলেন—"War is a continuation of *foreign* politics by other means"; অর্থাৎ পররাষ্ট্র নীতি (War Policy, Grand Strategy-র ঐ অংশটুকু) রাজনীতিকদের হাতে থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরাষ্ট্রে যুদ্ধোপযোগী যে কোন নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনার অধিকার থাকিবে যোদ্ধাদেরই হাতে। আজিকার জার্মানিতে অবশ্য এই সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে। নাৎসি রাষ্ট্রে যুদ্ধই প্রধান কথা। সেই রাষ্ট্রে আজ রাষ্ট্রপতি ও সেনাপতি এক হইয়া গিয়াছে, হিটলার সব বিষয়েই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এ যেন ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের নূতন অভ্যুত্থান। বলা বাহুল্য জার্মানি বরাবরই এইরূপ রাজনীতি চায়—শুধু মিলিটারিজ্‌ম বা ক্ষাত্রবাদ চায় না, চায় রাষ্ট্রীয় সর্বগ্রাসিতা (Totalitarianism)। অন্যান্য দেশের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রেও ষ্টালিনই আজ সমর-সচিব। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই দিকে তর্ক বেশি উঠে না—রাষ্ট্র-ক্ষমতা সেখানে এত কেন্দ্রিত হয় নাই। সেনাপতিরা যুদ্ধেরই কর্তা, সন্ধি-বিগ্রহের কর্তা তো নন-ই, রণনীতিরও (War Policy) কর্তা নন।

মোটের উপর আজ যুদ্ধের দায়ে সব কর্তৃত্বই রাষ্ট্রের হাতে

কেন্দ্রিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি বিভিন্ন রাষ্ট্রের রূপ ও দৃষ্টি-ভঙ্গির ছাপ তাহাদের যুদ্ধ ও যুদ্ধ কর্তৃত্বের উপরে আসিয়া পড়ে।

রাষ্ট্রের ছাপ

কোন রাষ্ট্রের যুদ্ধ কি রূপ গ্রহণ করিবে, তাহা নির্ভর করে আবার সেই যুদ্ধ-পরিচালক রাষ্ট্রের উপর, তাহার নিজ রাষ্ট্র-রূপের উপর, নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থার উপর, নিজস্ব সামাজিক শক্তি-বিন্যাসের উপর। Total War বা সর্বগ্রাসী যুদ্ধ হয়তো লুডেনডর্ফের চিন্তায় আসিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধের এই সর্বগ্রাসী রূপ দান করিতে পারিল জার্মানির Totalitarian State বা তাহার 'সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র'। অমন 'সর্বগ্রাসী যুদ্ধের' জন্য অমনিতর 'সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র'ও প্রয়োজন। অবশ্য হিটলারের আবির্ভাবের পূর্বেই জার্মান সমরনীতিকেরা এইরূপ 'টোটেল যুদ্ধের' একটা পরীক্ষার ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন সোভিয়েট দেশে। ১৯১৭-এর বিপ্লবের পরে যেখানে সংঘরাষ্ট্র বা Collectivist State স্থাপন শুরু হয়। সংঘরাষ্ট্রের গঠনেও রাষ্ট্রই সাময়িকভাবে সর্বেসর্বা হয়। এই সংঘরাষ্ট্রের সঙ্গে অবশ্য সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের গোড়ায়ই তফাত আছে। কারণ সংঘরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত মুনাফা শেষ করিয়া মানুষকে এক সংঘে পরিণত করা; আর সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত মুনাফা বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রকে সর্বগ্রাসী করিয়া তোলা। কিন্তু তবু বাহিরে দুইরূপ রাষ্ট্রেরই

অধিকার সর্বব্যাপী হয়। সোভিয়েট সংঘরাষ্ট্রের এই প্রকারের সংগঠন থাকাতে জার্মান সমরনীতিকরা টোটেল যুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তাকে সে দেশে কাজে খাটাইবার মত তখন সুযোগ পান। সোভিয়েট দেশের সে সময়ে সমরসচিব (Commissar for Defence) ছিলেন সেনাপতি তুখাচেব্‌স্‌কি (Tukha-chevsky)। তিনি জার-আমলের লোক; জার্মান সমর-চিন্তায় তিনি বরাবর মানুষ। জার্মান সমর-শাস্ত্রীরা ছিলেন তাঁহার বন্ধু। তুখাচেব্‌স্‌কির আমন্ত্রণে তাঁহারা সোভিয়েট-দেশের লাল-ফৌজ (Red Army) ও তাহার যুদ্ধ-তত্ত্ব (doctrine) গঠনে সাহায্য করিতে যান—তাঁহারা নিজেদের টোটেল যুদ্ধের চিন্তাকে এই ভাবে কাজে ফুটাইবার ক্ষেত্র পান।[১]

অবশ্য শুধুমাত্র একনায়কত্বেও (dictatorship) এইরূপ 'টোটেল ওয়ার' বা সর্বগ্রাসী যুদ্ধের আয়োজনপত্র, সংগঠন-সংহতি

১ হিটলারের অভ্যুত্থানে ইঁহারা স্বদেশে ফিরেন—সেই সুযোগ জার্মানিতেই পুরোপুরি পান। অন্যদিকে সোভিয়েট-ভূমিতে তুখাচেব্‌স্‌কি ও তাঁহার মতাবলম্বী বহুশত সেনানায়কের ১৯৩৬-৩৭এ প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—বিদেশীয় শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্রের। বুঝা যাইতেছে, ইঁহারা নাৎসি টোটেল যুদ্ধের সংগঠন দেখিয়া হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভয় পাইয়াছিলেন; তাই ইঁহারা চাহিয়াছিলেন—উক্রেইন হিটলারকে ছাড়িয়া দিয়া সোভিয়েট-দেশের রাষ্ট্র-কাঠামো বদলাইয়া হিটলারকে পরিতুষ্ট করাই ভালো। কিন্তু ইহা রাষ্ট্রনীতিক প্রশ্ন, ইহার সহিত 'সামরিক' সম্পর্ক নাই; তাই ইঁহার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট, আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সম্ভব হয় না। তাহার প্রমাণ—মুসোলিনির প্রয়াস। টোটেল যুদ্ধের জন্য আরও অনেক কিছু চাই—সমরশক্তি গড়িবার মত উপাদান চাই, শিল্পোন্নতি চাই, সংগঠন-নৈপুণ্য চাই। না হইলে একনায়ক রাষ্ট্রের দশা হয় পিলসুদস্কির (Pilsudski) পোল্যাণ্ডের মত, মুসোলিনির যৌগিক রাষ্ট্রের (Corporate State) মত।

কথাটা মোটামুটি এই যে, প্রত্যেক দেশের যুদ্ধের রূপ সেদেশের রাষ্ট্রের রূপের মতই।

যুদ্ধের ছাপ

অন্য দিকের কথাও আছে। যে রাষ্ট্রের স্বরূপ যাহাই হউক যুদ্ধের তাড়ায় তাহার কাঠামোও যুদ্ধোপযোগী করিতে হয়, দরকারমত অদলবদল করিতে হয়। কারণ, যুদ্ধের দিনে যুদ্ধের দাবিই চরম (স্মরণীয় ফন্ লুডেনডর্ফের কথা)। সেই দাবি স্বীকার করিতে গিয়া সব রাষ্ট্রই কম-বেশি কেন্দ্রিত (centralised) হইয়া উঠে—এমন কি, ব্রিটিশ ডিমোক্র্যাসিও রাতারাতি ব্রিটেনের ধনজনের উপর রাষ্ট্রের সর্বাধিকার ঘোষণা করে, বার্নার্ড শ'র সরস ভাষায় বলা চলে—'বিশ মিনিটে ব্রিটেন করিয়া ফেলে তাহা, যাহা বিশ বছরেও সোভিয়েট-ভূমি করিয়া উঠিতে পারে নাই।' সর্বগ্রাসী যুদ্ধের দায়েই ইহা হইল। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের এই নবরূপায়ণ কিন্তু

তাহার রূপান্তর নয়। উহাকে 'War Socialism' (যুদ্ধকালীন সমাজতন্ত্র) বলা অপেক্ষা 'War Totalitarianism' (যুদ্ধকালীন সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদ) বলাই শ্রেয়ঃ। কারণ, উহাতে কার্যত শ্রমিকশক্তির (working class force) প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই, বরং বিটিশ ধনিকশক্তিরই (capitalist force) মুনাফা সুরক্ষিত হইয়াছে ('Everything has seen conscripted except wealth'); এবং ধনিক-গোষ্ঠির শাসকশ্রেণীর (ruling class) কর্তৃত্ব আরও ব্যাপক হইয়াছে। কিন্তু তাহাও জার্মানির মত একেবারে সর্বব্যাপী হয় নাই। তাই দেখা যায়, ব্রিটেনের সমর-প্রচেষ্টারও বারে বারে মুখ বুজিয়া আসে, নানা প্রয়াসে bottle-neck দেখা দেয়, তাহা সর্বগ্রাসী যুদ্ধের উপযুক্ত রূপ লাভ করে না। ইহার কারণ এই যে, ব্রিটেন না হইয়াছে পুরাপুরি টোটেলিটারিয়ান দেশ, না হইয়াছে সংঘবাদী (collectivist) দেশ। গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের পার্লেমেণ্টে, সংবাদপত্রে, সভা-সমিতিতে এখনো বেশ স্বাধীনতা আছে। সেই বায়ুমণ্ডলে জনমত কিছু না কিছু ছাড়া পায়, আত্মপ্রকাশ করে, শাসকদেরও এক-একবার করিয়া নাড়া দেয়—আর তাহাদের আসন এক-একবার টলিয়া উঠে। হয়তো শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া সেই জনমতই জয়ী হইবে—তাহা হইলে এই শাসক-দল বিদায় লইবেন, না হইলে একেবারে রূপান্তরিত হইবেন; আর তখন ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাও একেবারে 'যুদ্ধকালীন সমাজতন্ত্রে' সর্বব্যাপী হইয়া উঠিবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্রিটেন দোটানায় রহিয়াছে।

তাহার যুদ্ধপ্রয়াসও তাই তাহার দোমনা রাষ্ট্রনীতি ও দুমুখো রাষ্ট্ররূপের ছায়া বহন করে—আর তাই তেমন কাযকরী হয় না, তাহাও স্পষ্ট।

ইহারই উল্টা প্রমাণ—এক দিকে যেমন জার্মানি, অন্য দিকে তেমনি আবার সোভিয়েট দেশ। সোভিয়েটের যুদ্ধ সোভিয়েট রাষ্ট্রেরই ফল। সেই দেশে রাষ্ট্র সার্বজনীন (common); শ্রমিক ও কৃষকের তাহা দেশ, তাই যুদ্ধ অতি সহজেই সম্পূর্ণরূপে সার্বজনীন যুদ্ধ (People's War) হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে শুধুমাত্র টোটেল যুদ্ধও আর বলা চলে না; উহা টোটেল যুদ্ধেরও আর এক স্তর উপরে উঠিয়া গেল, হইল সার্বজনীন যুদ্ধ।

এই যুগের যুদ্ধ মাত্রই টোটেল যুদ্ধ হইতে বাধ্য; না হইলে তাহা শুধু পূর্বযুগের "ভূত" বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু সেই টোটেল যুদ্ধেরও এইরূপ দুইটি প্রকারভেদ দেখিতেছি। এক দিকে দেখিতেছি—মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিয়া চলিতেছে যন্ত্র-যুদ্ধ, ইহাই ফ্যাশিস্ত যুদ্ধচিন্তার স্বরূপ। আর দিকে দেখিতেছি—মানুষকে যন্ত্রে সজ্জিত করিয়া চলিতেছে জনযুদ্ধ, ইহাই সার্বজনীন যুদ্ধ-চিন্তার দান।

এই দুই যুদ্ধচিন্তা ও যুদ্ধরূপের মিল ও প্রভেদ বিশ্লেষণ করিবার মত। কিন্তু সেই প্রভেদের কারণ দুই রাষ্ট্রের রূপ,—এই প্রসঙ্গে শুধু মনে রাখিবার মত কথা ইহাই। মনে রাখিবার মত কথা এই যে—যুদ্ধনীতি ও রাষ্ট্রনীতি পরস্পর সম্পর্কিত; রাষ্ট্রের ছাপে যুদ্ধের রূপ স্থির হইয়া যায়, যুদ্ধের দায়েও আবার রাষ্ট্রের

রূপ অদলবদল হয়; আর তাই যুদ্ধক্ষেত্রের হিসাব বুঝিতে হইলে তাহার পিছনকার রাষ্ট্রক্ষেত্রের হিসাবও মনে রাখিতে হয়—উহাও যুদ্ধের একটা গোড়ার হিসাব।

দুই

যুদ্ধের লক্ষ্য

যুদ্ধের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অবশ্য রাজনৈতিক, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। "যুদ্ধের দ্বারা শত্রুকে আমার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য মানিয়া লইতে বাধ্য করিব, তাহাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করাইব"—এই সেই উদ্দেশ্য। ক্লাউসেভিৎস্ তাই যুদ্ধকে বলেন, "an act of force to compel an opponent to do our will"। এইখানেই যোদ্ধার মূল লক্ষ্য কি, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—শত্রুর সংকল্পচ্যুতি ঘটানো। কিন্তু শত্রুকে বাধ্য করা মানে তাহাকে জোরের দ্বারা বাধ্য করা, জোরের দ্বারা তাহার ইচ্ছাশক্তিকে পরাজিত করা, এবং তাহার প্রতিরোধ শক্তিকে নিঃশেষ করা। এই জোর জিনিসটা শুধুই সামরিক (military) নয়, অন্য জোরও থাকে। শত্রুরও শুধু সামরিক শক্তি নষ্ট করিলে হয় না; তাহারও অন্য জোর আছে—নৈতিক, অর্থনৈতিক, এমন কি আধ্যাত্মিক শক্তিও তাহার থাকে। তাই যুদ্ধের উপাদান বলা হয়—সামরিক, আধ্যাত্মিক (যেমন, প্রচার প্রভৃতি), এবং অর্থনৈতিক। সকল রকমের যুদ্ধ-উপাদান প্রয়োগ করিতে পারে—রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্রনেতা; তাই যুদ্ধের আসল নেতৃত্ব তাহার হাতে। সামরিক নেতৃত্ব থাকে সামরিক কর্তাদের

হাতে—তাহারা প্রয়োগ করে সামরিক উপকরণ। ইহাই যোদ্ধার নিজের কাজ—জলে, স্থলে, আকাশে যুদ্ধ চালানো—বলপ্রয়োগের দ্বারা শত্রুকে বশ করা। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য সব শক্তি-প্রয়োগ কি তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? ইহা লইয়া তর্ক চলে। বল-প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি হইবে, শত্রুকে বশ করিবার জন্য কোন্ সামরিক লক্ষ্য আয়ত্ত করিতে হইবে—গোড়াতেই তাহা আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন। জার্মান সমর-চিন্তার অধিনায়ক ক্লাউসেভিৎসই এই বিষয়ে এখনো প্রামাণ্য। তিনি তিনটি লক্ষ্য স্থির করেন—শত্রুর সামরিক শক্তি, শত্রুর দেশ, আর শত্রুর ইচ্ছাশক্তি। (*On War*, Bk. II, Ch. II) তিনটি মোটা কথায় যোদ্ধার সেই লক্ষ্য বিবৃত করা চলে। তাহা এইরূপ:

(১) শত্রুর সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করা এবং ধ্বংস করা।—ইহাই ক্লাউসেভিৎসের আসল কথা।

(২) শত্রুবাহিনীর আক্রমণোপযোগী উপাদান (material element of aggression) ও অস্তিত্বের উপযোগী অন্যান্য সম্পদ (other sources of existence) অধিকার করিয়া লওয়া।

(৩) জনমত (public opinion) লাভ করা।

এই প্রত্যেকটি কথা লইয়াই তর্ক চলে, তর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণও হয়। সাধারণভাবে যুদ্ধের লক্ষ্য বুঝিবার জন্য তাহা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেদিক হইতেও বুঝিয়া রাখা দরকার—এই

তিন কথার মূল মানে কি দাঁড়ায়! একটি একটি করিয়া তাহাই দেখা যাউক।

প্রথম কথা এই যে, যোদ্ধার প্রধান লক্ষ্য হইল শত্রু-সৈন্যকে শেষ করা। সশস্ত্র বাহিনী শেষ হইলে শত্রুর আর যুদ্ধশক্তি থাকে না, বাধ্য হইয়াই পরাজয় মানিয়া লইতে হয়। আমরা কিন্তু যুদ্ধকে সাধারণত দেখি যেন একটা দিগ্বিজয়ের মত। শত্রুর দেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া গেল, তাহার রাজ্য রাজধানী অধিকার করিলাম—শত্রুর পরাজয় হইয়া গেল। ইহাতে অনেক যুদ্ধ জয় হয় বটে, কিন্তু এরূপ অগ্রসর হইলে বিপদ যে কত ঘটে, তাহা নেপোলিয়নের রুশ-অভিযানেই দেখা যায়। রুশ দেশ প্রকাণ্ড দেশ, তাহা একেবারে অধিকার করা অসম্ভব ছিল। একটা যুদ্ধের পরে রুশবাহিনী অক্ষত ভাবে পিছনে হটিয়া গেল। সে দেশের শীতকালে যুদ্ধ করিবার মত উপকরণ সে যুগের সৈনিকদের ছিল এখনকার সৈনিকদের অপেক্ষাও কম। "সেনাপতি শীত" ও "সেনাপতি কাদা" ছিলেন তখন দুর্জয়—বিজ্ঞানের আঘাতে তাহারা তখনো মোটেই কাতর হন নাই। ইহার উপর নেপোলিয়নের মাথায় ভাঙিয়া পড়িল রুশদেশের জনগণের বৈরিতা। কাজেই শুধু দেশ জয় করিয়া চলিলেই রণজয় হইতেছে তাহা মনে করা চলে না। রুশদেশের অপেক্ষা ছোট দেশ সম্বন্ধেও একথা খাটিবে—সৈন্যবাহিনী বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে সেরূপ দেশও টিকিয়া থাকিতে পারে। আবার, এইজন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু শত্রুকে হটাইয়া দিলেই যুদ্ধ শেষ হয় না, তাহার

পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ছত্রভঙ্গ করিতে হয় ; কিংবা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাকে ধ্বংস করা বা তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কি-উপায়ে সশস্ত্র সৈন্যদের জয় বা ধ্বংস করিতে হইবে ? তাহার আলোচনা এখানে করার দরকার নাই, ইহা যুদ্ধ-বিদ্যা, সমর-সমাবেশ (strategy) ও রণকৌশলের (tactics) কথা। এখানে শুধু মনে রাখা দরকার—যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইবে কি ; যোদ্ধার মতে সে লক্ষ্য—শত্রু-সৈন্যকে পরাজিত করা ও ধ্বংস করা।

ক্লাউসেভিৎসের এই কথায় অমনি আপত্তি উঠিবে। এ যুগের ইংরেজ লেখক লিডেল হার্ট ইহার একটি ত্রুটী নির্দেশ করিয়াছেন (*Paris or Future of the War* এবং *The Current of War*, Aiming at Moral Objective)। তাঁহার মতে—যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইল শত্রুর সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তিকে বশ করা, তাহারই জন্য সামরিক, অর্থনৈতিক, এমন কি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ—ইহা আমরাও আলোচনা করিয়াছি। যোদ্ধারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন বলিয়া যে আর ঐ উপায়গুলি, যেমন, বাণিজ্যাবরোধ বা ব্লকেড, কূটনীতি, প্রচার প্রভৃতির সাহায্য লইবেন না এমন নয়। তাঁহারা বরং দেখিবেন—কত দ্রুত ও কত কম শক্তিক্ষয় করিয়া শত্রুর সংকল্পকে বশ করা যায়। ইহাই লিডেল হার্টের কথা। অতএব, তাঁহারা খুঁজিবেন শত্রুর দুর্বলতম ক্ষেত্রকে, যেখানে আঘাত করিলে শত্রু ভাঙিয়া পড়িবে। যেমন, মহাবীর অ্যাকিলিসের গোড়ালি ছিল একমাত্র তাঁহার

দেহের দুর্বল স্থান। প্রায়াম-পুত্র পারিস সেখানে আঘাত করিয়াই অ্যাকিলিস্‌কে নিহত করিলেন; না হইলে অ্যাকিলিস দুর্জেয় রহিতেন। তেমনি যোদ্ধার কাজ হইল শত্রুর সেই দুর্বল স্থলে (soft-spot) আঘাত করা। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সশস্ত্র বাহিনী মোটের উপর তাহার সুদৃঢ় কেন্দ্র। ক্লাউসেভিৎসের কথা মতো তাহাকে জয় ও ধ্বংস করিতে গেলে দেরি হইবার কথা, শক্তিক্ষয়ও অনিবার্য। অতএব এইরূপ প্রত্যক্ষ আঘাত না হানিয়া যোদ্ধা গৌণ প্রয়াসই (Indirect Approach) করিবেন। যেমন—শত্রুর পশ্চাতে (rear) আক্রমণ করিবেন, শত্রুর যাতায়াতের পথ নষ্ট করিবেন, প্রয়োজনীয় সরবরাহ (supplies) বন্ধ করিবেন, নৈতিক লক্ষ্য আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন, ইত্যাদি। এই দিককার প্রধান দৃষ্টান্ত—রোমের সেনাপতি সিপিও। তিনি কার্থেজের মহাবীর হ্যানিবলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এড়াইয়া হ্যানিবলের সরবরাহ-ক্ষেত্র ও নৈতিক-ক্ষেত্র (sources of supply and moral base) বিনাশ করিতে থাকেন; ইহাতেই শেষ পর্যন্ত হ্যানিবলের শক্তি ভাঙিয়া পড়িল। লিডেল হার্টের মতে ১৮১৪খৃঃ মিত্রশক্তি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এমনি চাল চালেন—একেবারে ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র পারিস অবরোধ করিয়া; নেপোলিয়নের পতনের উহা একটি বড় কারণ হয়।

এই যুক্তি অবশ্য খুবই সত্য। কিন্তু ইহার অনেকটা অংশই পরে আমরা বিচার করিব। শত্রু-সৈন্যের বিনাশের দ্বিতীয় কথায় কতকাংশে এই দিকটির কথাই বলা হইয়াছে।

ক্লাউসেভিৎস্ জোর দিয়াছেন—শত্রুবাহিনীর প্রত্যক্ষ জয়ের উপর। কারণ, যোদ্ধার বিচারে এইটিই দেখিতে হয় সর্বাগ্রে। কেন?—না হইলে বুঝিতে হইবে—যুদ্ধ হয়তো শেষ হয় নাই, শত্রু জমি হারাইয়াছে, গ্রাম-জনপদ হারাইয়াছে,—কিন্তু তাহার শাণিত অস্ত্র হারায় নাই, প্রধান শক্তি হারায় নাই, অতএব সে নৈতিক সাহসও হারায় নাই।

একটা কথা—'ধ্বংস' করা। ধ্বংস কথাটার মানে এই নয় যে, সৈনিকদের হত্যা করা। বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত সৈনিকের কাজ নয়। সশস্ত্র বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইলে বা অস্ত্রশস্ত্র খোয়াইলে বা আত্মসমর্পণ করিলেই বলা হয়, বাহিনী-হিসাবে তাহার অস্তিত্ব রহিল না, ধ্বংস হইয়া গেল। শত্রুর ইচ্ছাশক্তি নষ্ট করাই আসল কথা। ইংরেজী "annihilation" কথাটির অর্থ ইহাই—বিনষ্ট হইল।

শত্রুবাহিনী জয় করিতে না পারিলেও 'ধ্বংস' করা যায়, শত্রুকেও জয় করা যায় দ্বিতীয় পথে;—তাহার যুদ্ধের আক্রমণোপযোগী উপাদান ও অস্তিত্বের উপযোগী অন্যান্য সম্পদ আয়ত্ত করিতে পারিলে। কথাটা খুব ব্যাপক—ইহার মধ্যে তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্র পড়ে, এ যুগের অস্ত্র কারখানা পড়ে, আবার যুদ্ধ-শিল্পের অন্যান্য কল-কারখানাও পড়ে; তাহা ছাড়া পড়ে শত্রুর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস, ক্ষেত-খামার, খনি-নদী, যান-বাহন; তাহার দেশ-জনপদ, শহর-গ্রাম, রাজধানী। ইহার উপায় অনেক—আক্রমণের দ্বারা ঐ সব কেন্দ্র দখল করা, অবরোধ

করা, 'ব্লকেড' (blockade) বা ঘরবন্দী করা ইত্যাদি। ইহাও সেনাপতির কাজ, (strategy) ও রণকৌশলের (tactics) বিষয়—এখানে তাহা আলোচনা না করিলেও চলে। তবে শুধু মাত্র এই দ্বিতীয় উপায়ের ব্যাপক ও সুনিপুণ প্রয়োগেও শত্রু-জয় সম্ভব। কিন্তু উহার আংশিক প্রয়োগে জয়ে দেরি হয়। যেমন ব্লকেড। শত্রুও উহা সামলাইয়া লইবার সুযোগ পায়। আর উহার অনিয়মিত প্রয়োগে কোন কাজই হয় না। আবার একেবারেই এসব দিকে চেষ্টা না থাকিলে ভুল হইতে পারে; শত্রুবাহিনী একবার ধ্বংস হইলেও শত্রু নূতন বাহিনী গঠনে চেষ্টা করিতে পারে। তাহা হইলে শুধু প্রথম সূত্রের কথিত পথেও কিছু হয় না—শত্রুবাহিনীর সাময়িক ধ্বংসের দ্বারাও তাহাকে একেবারে পরাজিত করা না যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য, প্রথম ও দ্বিতীয় কথা পরস্পরের বিরোধী নয়—বরং দুইয়ের পরিপূরক বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত। আর তৃতীয় পথ তো নিশ্চয়ই তাহাই। শত্রুকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিতে পারিলেই যুদ্ধ শেষ হয়। তবে জনমত লাভ করার অর্থ [illegible] পক্ষে শত্রুপক্ষের জনগণের চিত্ত জয় করা। যখন তাহা সম্ভব হয় তখন যোদ্ধা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ইহার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করা চলে,—প্রচার, কূটনীতি (উদার ব্যবহার, ঘুষ বা পারিতোষিক), আর বলের বিভীষিকা তো আছেই। কিন্তু জনমত প্রতিকূল হইলে যে কি হয়—তাহার প্রমাণ শত শত আছে। আমাদের ইতিহাসেও তাহা রহিয়াছে। নেপোলিয়ানের

মস্কো-অভিযান ও স্পেনের যুদ্ধ এই জন্যই তাঁহার সর্বনাশের কারণ হয়। আর এই যুগেও চীনে, রুশিয়ায় এইরূপ জন-প্রতিরোধের দুর্ভোগ জাপানী ও জার্মান সেনাপতিদের বিপদে ফেলিয়াছে। তাই রেডিয়ো-যোগে তাঁহারা আক্রান্ত দেশ বা আক্রমণ-যোগ্য ঐরূপ দেশকে সর্বদাই নানা আশা দেন; সে দেশ অধিকৃত হইলে তাহাদের বলেন New Order-এর কথা; এবং ফ্রান্সের পেতাঁ্যার সহিত, চীন ওয়াংএর সহিত উদার ব্যবহার করেন; প্রত্যেক দেশে কুইসলিং সৃষ্টি করেন—আবার ভয়ও দেখান। মোটের উপর আক্রমণকারী বরাবর জনমত জয় করিতে চান; ইহাও যুদ্ধের লক্ষ্য।

ক্লাউসেভিংসের মতামত স্থল-বাহিনী ও স্থল-যোদ্ধার জন্যই প্রণীত হইয়াছিল,—জার্মানীর পক্ষে স্থলযুদ্ধের কথাই ভাবা প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু নৌ-বহর ও বিমান-বহরের পক্ষে যে ক্লাউসেভিংসের এসব কথা খাটে না, তাহা নয়। সব যোদ্ধারই লক্ষ্য এইরূপ—'শত্রুকে আমার ইচ্ছা মানিতে বাধ্য করিব।' কিন্তু সব বলের তো এক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই সব বিভিন্ন বলের নিজ নিজ কাজ কি—তাহা এই প্রসঙ্গেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা চলে।

স্থলবাহিনীর কাজ আমরা দেখি—মোটের উপর প্রয়োজন হইলে শত্রুর দেশ শেষ পর্যন্ত উহাই দখল করে। শুধু মাত্র অস্ত্র বলে তাহা সম্ভব কি না সন্দেহ। যুদ্ধ শুধু স্থলবাহিনীতেও চলে,

কিন্তু শুধু নৌ-বাহিনী বা বিমান-বাহিনী দিয়া যুদ্ধ চলে কি? অথচ ইতিহাসের নজির নাকি এই যে, সমুদ্র-শক্তির (Sea-power) সঙ্গে স্থল-শক্তি (Land-power) আটিয়া উঠিতে পারে না। ইংরেজদের ইহাই একটা বড় কথা, কিন্তু এই কথাটাও আংশিক সত্য। যদি তেমন বড় স্থল-শক্তি হয়, যে অনেককাল সমুদ্রে বাহির না হইলেও যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সমুদ্র-শক্তির নৌবহর তাহার করিবে কি? তখন সমুদ্র-শক্তিকেও নিজের স্থল-বাহিনী গড়িতে হইবে—ডাঙায় শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য; আর ততক্ষণে সেই স্থল-শত্রুও হয়তো পারিলে নৌবল গড়িবে সমুদ্র-শক্তির বাণিজ্যতরী ও নৌবহরকে ডুবাইবার ও ঠেকাইবার জন্য। অতএব, স্থলশক্তি ও জলশক্তির এই যে তুলনা সচরাচর চলে, তাহা আপেক্ষিক। এ্যাথেন্‌স্‌ ও ব্রিটেনের কথাই শেষ কথা নয়, নেপোলিয়নের নিষ্ফলতাও জলশক্তির অমোঘতার প্রমাণ নয়—এ যুগের যুদ্ধেই আমরা ইহার যেন প্রমাণ পাইতেছি।

নৌবহরের উদ্দেশ্য

তাহা হইলে নৌবহরের কাজ কি? নৌবহর অবশ্য স্থলবাহিনীর কার্যকারিতা অনেকগুণ বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু নৌবহরের উপযোগিতা বাড়ে প্রথমত বাণিজ্যের জন্য ও সমুদ্রপারে সেই বাণিজ্য-ক্ষেত্র থাকায়। আর তাই নৌবহরেরও দরকার হয়—

সমুদ্রের পারে-পারে নিজ নৌ-ঘাঁটি, দ্বিতীয়ত নিজের নৌবহর, ও তৃতীয়ত শিক্ষিত নৌ-বাহিনী। যুদ্ধে নৌবহরের কাজ কি? ইহার সংক্ষেপে উত্তর—প্রধানত, নিজের বাণিজ্যপথ পরিষ্কার রাখা, শত্রুর বাণিজ্যপথ রুদ্ধ করা; তারপরের কাজ—নিজের সামরিক যাতায়াত পথ, সৈন্য ও তাহাদের সমরোপকরণ পাঠাইবার পথ অব্যাহত রাখা এবং শত্রুর এরূপ সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণের পথ বন্ধ করা। ইহাই নৌবহরের মোট উদ্দেশ্য। ইহার জন্য তাহার লইতে হয় এই সব ব্যবস্থা—এক, শত্রুর নৌবহরের সঙ্গে (ঐসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) নৌযুদ্ধ; দুই, ব্লকেড্ বা শত্রুকে ঘরবন্দী করা; তিন, যে-সব মালে শত্রুর সহায়তা হইবে তাহার উপর নিষেধ বসাইয়া অন্যান্য জাতিদের শত্রুর সহিত সে সব মালের বাণিজ্য নিষেধ করা; আর চার, বাণিজ্যের জন্য শত্রু কোনো মাল সমুদ্র-পথে রপ্তানি করিলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা। অবশ্য, ইহা ছাড়া স্থল-সেনাকে ভিন্ন দেশে পৌঁছাইয়া দেওয়া, নামাইতে সাহায্য করা, আর শত্রু-সেনাকে আবার এসব কাজে বাধা দেওয়া তো আছেই।

মোটামুটি এই কথাগুলি মনে রাখিলেই ও ইহার যথোচিত গুরুত্ব বুঝিলে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ, মার্কিন, ইতালীয় ও জাপানী নৌবহরের সফলতা বা নিষ্ফলতা বিচার করা সহজ হয়।

বিমান-বহরের কাজ

বিমান নূতন আবিষ্কার। বিমান-বাহিনীর কাজ এই যুদ্ধের মধ্য দিয়াই স্থির হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের পূর্বে বিমানের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথাই হইয়াছে। কেহ বলিলেন, ইহাতে নৌবহরের কাজ শেষ হইয়াছে; কেহ বলিলেন, ইহাতেই স্থল-যুদ্ধেরও আর গুরুত্ব রহিল না—আসল যুদ্ধ এখন হইতে আকাশেই হইবে। ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল ডুহে (Douhet) এই শেষ মতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রবক্তা হন। নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী, কোন্‌টির গুরুত্ব তুলনায় বেশি তাহা আলোচনা করা নিষ্ফল। ডুহের মত এই যে, যুদ্ধে আকাশের আধিপত্য লাভ করাই প্রথম কাজ হইবে। একবার আকাশের আধিপত্য লাভ করিলে পর আর কথা নাই—শত্রুকে নিপাত করা যায়—তাহার মর্মমূলে আঘাত করিলেই হইল—তাহার ঘরবাড়ি কলকারখানা পথঘাট ভাঙিয়া যাইবে, ত্রাসে বিশৃঙ্খলায় তাহার সাহস একেবারে ধূলিসাৎ হইবে; কাজেই যুদ্ধও দেখিতে না দেখিতে হইবে শেষ। ডুহের এই কল্পনা হইতেই প্রমাণ তিনি বিমানবাহিনীকে কি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে স্থলবাহিনী ও জলবাহিনীর কাজ হইবে শুধু জলে ও স্থলে বিমান-যুদ্ধের ঘাঁটি আয়ত্ত করিয়া দেওয়া; আর বিমান-যুদ্ধেরও অস্ত্র হইবে শত্রুর মনে ত্রাস (terror) সঞ্চার করা। বলাবাহুল্য এই মত টিকে নাই। শুধু বিমানের দ্বারা ক্রীটের

মত ক্ষুদ্র অরক্ষিত দ্বীপ জয় করা যায়, কিন্তু ব্রিটেনের মত দ্বীপ জয় করা যায় না। আকাশ-পথ খুলিয়া যাওয়ার যুদ্ধের অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে,—যুদ্ধের গতি বাড়িয়াছে, ক্ষেত্র বাড়িয়াছে, জটিলতা বাড়িয়াছে,—এই হিসাবেই বিমান-বাহিনীরও অভাবনীয় সার্থকতার স্থযোগ হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বিমানই যুদ্ধের একমাত্র বল হইয়া উঠে নাই; চরম বল হইয়াছে কি না তাহাও এ যুদ্ধেই বুঝা যাইবে।

বিমান বহরের তাহা হইলে কাজ কি? বিমান আসলে প্রায় কামানের মত—উড়ন্ত আর্টিলারি বিশেষ, আরও বহুগুণ কার্যকরী, এই যা। উহার কাজ—(১) সন্ধান (Reconnaissance), জলে ও স্থলে—অবশ্য আকাশ হইতে উড়িয়া—শত্রুর গতিবিধি দেখা, ঘাঁটি দেখা, ইত্যাদি। (২) শত্রুর বিমানকে বাধা দেওয়া—অর্থাৎ বিমান-যুদ্ধ; (৩) শত্রুর পশ্চাদাক্রমণ (rear)। সেখানে একেবারে বহুদূরে বোমা ফেলিয়া মেসিন-গান চালাইয়া বা প্রচারপত্র ফেলিয়া সাধারণ লোককে ত্রস্ত করা (attack on mass), কল-কারখানায় বোমা ফেলিয়া বা মেসিন-গান চালাইয়া তাহা নাশ করা (attack on industries); শত্রুর শিবির (base), যাতায়াতের পথ প্রভৃতি এভাবে ভাঙিয়া দেওয়া (attack on communications); (৪) প্যারাশুট-বাহিনী নামাইয়া এই সব কাজ করা বা বিশেষ বিশেষ ঘাঁটি দখল করা; (৫) কিংবা আকাশ-যোগে বাহক বিমানে (carrier) শত্রুর রাজ্যে সৈন্য নামানো। কিন্তু বিমানের (৬) প্রধান কাজ

স্থলসৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করা, আর নৌবহরেরও আত্ম-রক্ষার ও আক্রমণের কাজে বিমান-বাহী জাহাজ (aircraft carrier) হইতে বা স্থলের বিমান-ঘাঁটির যোগে তেমনি সাহায্য করা।

আসলে যুদ্ধের মোট লক্ষ্য আয়ত্ত হয়—কোনো বলের একক প্রয়োগে নয়, বলের সংযোজনায় (coordination)। তাই কোনো একটি বলকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ জয় প্রায় অসম্ভব। আবার বিমানের সাহায্য ছাড়া এ যুগে স্থলযুদ্ধ বা জলযুদ্ধ কোনটাই আজ প্রায় চলে না। বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বলের সার্থকতা আছে—যুদ্ধের যাহা লক্ষ্য, তাহাও প্রত্যেক বলেরই লক্ষ্য।

তিন

যুদ্ধের মুল সূত্র

(Principles of War)

প্রত্যেক যুগেই নূতন নূতন যুদ্ধের উপকরণ যোদ্ধার হাতে আসিয়া জুটে, সেগুলি যুদ্ধেও প্রযুক্ত হয়। তাহার ফলে যুদ্ধ-বিদ্যায়ও নূতন মত প্রতিদিনই গৃহীত হয়। তাই সমর-বিজ্ঞানীরা সর্বদাই যুদ্ধের মূল সূত্রের খোঁজ করেন, সকল যুগের যুদ্ধের উহা মানদণ্ড—সকল যুগের যুদ্ধেই তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। অবশ্য সব বিষয়ে সামরিক গবেষকেরা সম্পূর্ণ হয়তো একমত হন না—কেহ কোনো নীতির উপর বেশি জোর দেন, কোনটির উপর জোর দেন কম। কিন্তু মোটামুটি তবু তাঁহারা কয়েকটি জিনিসকে মনে করেন যুদ্ধের গোড়ার নীতি, তাহার মূলসূত্র। অতীত যুগেও এই সব নীতি তখনকার যোদ্ধারা গ্রহণ করিয়াছেন, এ যুগেও এই সব নীতি তেমনি এ যুগের যোদ্ধাদের মানিতেই হইবে (fundamental principles of war, those which history shows us have been proved true and immutable experience of all past wars.—*The Current of War*—Liddell Hart, p. 18)

যুদ্ধের মূলসূত্র লইয়া সুগভীর অনুশীলন করেন গত যুদ্ধের মহাবলাধ্যক্ষ মার্শাল ফো (*Principles of War*—Foch 1903. Tr. Hilaire Belloc.) তিনি নেপোলিয়নের যুদ্ধ ও ১৮৭০-এর ফন্ মল্টকের যুদ্ধ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যুদ্ধের এই সব মূলসূত্র নির্দেশ করেন। তিনি দেখিলেন, নেপোলিয়নের যুদ্ধজয়ের আসল উপায় ছিল এই—মোট বল তাঁহার যাহাই থাক, যুদ্ধক্ষেত্রে চরম মুহূর্তে ও চরম স্থলে বলাধিক্য (superiority of force) তিনি সংগ্রহ করিতেন; উহা প্রয়োগ করিতেই শত্রু পরাজিত হইত। মোট বল কম হউক আর বেশি হউক, ঠিক সময় ঠিক জায়গায় এই বলাধিক্য চাই—ইহাই আসল কথা। এই জন্য দরকার হয় 'বলের সদ্ব্যয়' (Economy of Forces); সম্মুখে রাখা দরকার বাহিনীর এক অগ্রাংশ আর উহার পিছনে প্রধান বাহিনী। অগ্ররক্ষীরা শত্রুর সন্ধান (Reconnaissance) রাখিবে, গতিবিধি লক্ষ্য করিবে, প্রয়োজন মত তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে তৎস্থলে নিবদ্ধ (fix) রাখিবে। আবার এই অগ্ররক্ষীরাই প্রধান বাহিনীর আচ্ছাদনস্বরূপ (cover), শত্রুর আকস্মিক (surprise) আক্রমণ হইতে তাহাকে নির্বিঘ্ন (secure) রাখিবে। এইরূপে নির্বিঘ্ন হইয়া প্রধান বাহিনী যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রসর হইবে। ফো তাই বলেন, যুদ্ধের প্রধান সূত্র হইল—বলের সদ্ব্যয় (Economy of Force)। উহারই সঙ্গে অন্য একটি সূত্রও পাওয়া যায়—শৃঙ্খলা মানা ও তদনুযায়ী অবাধ প্রচেষ্টা

(Intellectual Discipline and Freedom of Action)। ইহার অর্থ প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য পালন, আর ইহাই আসলে সামরিক গুণ (Military Spirit)। তৃতীয় সূত্র হইল নির্বিঘ্নতার ব্যবস্থা (Service of Security)। এই নির্বিঘ্নতা নির্ভর করে অগ্ররক্ষী অংশের উপর, তাহাদের প্রতিরোধ-শক্তির উপর, আর বিশেষ স্থান ও বিশেষ মুহূর্তের উপর। এই সূত্রেরই সঙ্গে তাই পাওয়া যায় চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্র—নিজের ষ্ট্র্যাটিজিকাল বা সমাবেশিক নির্বিঘ্নতা—উহা না থাকিলেই শত্রুর আকস্মিক ষ্ট্র্যাটিজিকাল চালে বিপন্ন হইতে হয় (Stratigical Surprise and Stratigical Security); আর নিজেরও ষ্ট্র্যাটিজি বা সমর-সমাবেশ সুনির্বাহ করা যায় না। অবশ্য ফোর মতে যুদ্ধের প্রধান কথা হইল—সংগ্রাম বা ব্যাটল; সেই সংগ্রামক্ষেত্রেই চাই বলাধিক্য। আর সেই জন্য চাই সেখানে সেইরূপে প্রধান বাহিনীকে প্রস্তুত করা (Preparation), সংগ্রাম নির্বাহ করা (carry out) ও সংগ্রামের পরে শত্রুকে অনুসরণ করিয়া জয়ের সমস্ত ফল আয়ত্ত করা (Utilisation)।

মার্শাল ফোর সূত্র পূর্বযুগের যুদ্ধের উপর গঠিত। গত মহাযুদ্ধে জয়লাভের পরও কিন্তু মার্শাল ফো মোটামুটি এই সব সূত্রের সমর্থন করেন। তবে মনে রাখিবার মত কথা এই যে, যে মার্শালের মতে আক্রমণই হইল যুদ্ধের বড় কথা,—নিশ্চেষ্ট থাকিবার মত বড় অপরাধ আর কিছু নাই,—তিনি যে মহাযুদ্ধ জিতিলেন সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত পরিণত হইয়াছিল স্থাণু যুদ্ধে

(Battle of Position)। বিশ বছর পরে এ যুগের যুদ্ধে তাঁহারই দেশবাসী ম্যাজিনো লাইনের অভ্যন্তরে বসিয়া ছিলেন নিশ্চেষ্ট, আক্রমণের কথা ভাবেনও নাই।

গত যুদ্ধের পরে ইংরেজ সামরিক লেখক কাপ্তেন লিডেল হার্ট ও যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রবক্তা কর্ণেল ফুলার যুদ্ধের মূল সূত্র লইয়া গবেষণা করেন। ব্রিটেনের ফিল্ড সার্বিস রেগুলেশনে আটটি সূত্রে যুদ্ধের এই মূল নীতি নির্ধারণ করা হয়। সেই আট সূত্র হয়তো লিডেল হার্টেরই প্রণীত। তাহা এই: ১। লক্ষ্য (Principle of Objective): যুদ্ধ মাত্রেরই থাকা চাই লক্ষ্য—সে লক্ষ্য জায়গা জমিই হউক বা শত্রুর সৈন্যবাহিনীই হউক। কিন্তু লক্ষ্য ভুলিলে চলিবে না। অবশ্য এই লক্ষ্য প্রয়োজনমত পরিবর্তনও করিতে হয়—তাহা অনড় অচল একান্ত কিছু নয়। এই জন্য একাধিক লক্ষ্যের দিকে আগেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। তাহাতে শত্রুর পক্ষেও আমার লক্ষ্য ঠিক না পাইবার ও প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা বেশি। এই জন্য লিডেল হার্ট আটটি নীতির সঙ্গে আর একটি নূতন নীতি যোগ করিবার পক্ষপাতী—ইহাকে বলা চলে পরিবর্তন-সাধ্যতা (Principle of Flexibility).

২। আক্রমণ (Principle of Offensive): যুদ্ধের গোড়ার নীতিই হইল 'আঘাত' হানা (hitting)—শত্রুকে আঘাত হানিতেই হইবে, না হইলে যুদ্ধই হয় না।

৩। নির্বিঘ্নতা (Principle of Security) প্রত্যেক যুদ্ধেই

দেখিতে হয় যেন নিজে বিপন্ন হইয়া না পড়ি, নিজেকে রক্ষা করিতে, বাঁচাইতে (guarding) পারি।

৪। সচলতা (Principle of Mobility) না হইলে আঘাতও করা যায় না, নির্বিঘ্নতাও সম্ভব হয় না।

৫। আকস্মিকতা (Principle of Surprise): শত্রুকে কাবু করার সহজ উপায় আকস্মিকতা—আর সেই দিক হইতে আবার 'সচলতা' একটা বড় সহায়ক।

৬। একত্রীকরণ বা বল-সন্নিবেশ (Principle of Concentration): বল যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহা হইলে শত্রুকে আটিয়া উঠা অসম্ভব।

৭। বল-সদ্ব্যয় (Principle of Economy of Force): ঠিক সময়ে ও ঠিক জায়গায় যথেষ্ট বল প্রয়োগ করিতে হয়, আর তাহার জন্যই অন্য ক্ষেত্রে বা দীর্ঘ কাল ধরিয়া অন্য কোথাও নিজ সৈন্য আটকাইয়া রাখা ঠিক নয়। বোধ হয় এই যুদ্ধে ইহারই পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে এখন জার্মানি—দক্ষিণ-রুশিয়ার রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি চরম স্থলে চরম মুহূর্তে দেখা যায় তাহার বলাধিক্য (Superiority)। অবশ্য, তাহার কারণ আবার জার্মান বাহিনীর সচলতা, আর অনেকাংশে উহার কৃতিত্ব প্রাপ্য জার্মান রেল ও মোটরের ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরদের।

৮। সহযোগিতা (Principle of Co-operation) বিভিন্ন সৈনিক বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণ সংযোগের ও সহযোগের ফলেই

যুদ্ধ সম্ভব। ইহারও স্থল-যুদ্ধে সার্থক প্রমাণ এবার দেখাইয়াছে জার্মানরাই বেশি।

যুদ্ধের গোড়ার সূত্রগুলি আবার কর্ণেল ফুলার দুই ভাগে সাজাইয়াছেন। তাঁহার মতে চারিটি নীতি মৌলিক (Elementary Principle); কারণ তাহাদের পিছনে আছে যুদ্ধের চারটি মূলবস্তু (Elements); আর চারটি সূত্রকে তিনি বলেন পরিপোষক (Accentuating Principles)। তাঁহার বিশ্লেষণ এইরূপ (*The Current of War*—Liddell Hart p. 19.):

মুলবস্তু Elements	মন Mind	গতি Movement	অস্ত্র বা (ধ্বংস) Weapons	রক্ষা Protection
মৌলিক নীতি Elementary Principle	লক্ষ্য Objective	সচলতা Mobility	আঘাত Hitting	নির্বিঘ্নতা Security
পরিপোষক নীতি Accentuating Principle	চমক বা আকস্মিকতা Surpise	সহযোগিতা Cooperation	একত্রীকরণ Concentration	বল-সদ্ব্যয় Economy of Force

যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচনে ও সমর-সমাবেশে (strategy), যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্র-প্রয়োগে ও বল-চালনায় (tactics), সেনাপতিরা কর্তব্য স্থির করেন এই সব মানদণ্ডের দ্বারা। আবার কোন নূতন

অস্ত্র বা নূতন উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রহণ করিবার কালেও যোদ্ধারা এই সব নীতি প্রয়োগ করিয়াই তাহার দর কষিয়া দেখেন। দৃষ্টান্ত দেখিতে হইলে লিডেল হার্টের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুদ্ধোপযোগিতা বিষয়ক আলোচনাটি দেখিতে পারি (*The Current of War*, p. 19ff)। এ যুগের বিজ্ঞান জলে স্থলে আকাশে গতায়াতের পথ খুলিয়াছে। ইহার কোন্‌টির আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা কি? লিডেল হার্ট 'সচলতার' দিক হইতে প্রথম হিসাব করিয়া দেখিলেন—সর্বাগ্রে আসে আকাশপথ, তারপর আসে স্থলে রেল-পথ, তারপর সমুদ্রপথ আর সর্বশেষে আবার স্থলে হাঁটা-পথ। আকাশের যান-বাহনের হিসাব খতাইয়া দেখিলেন —বিমানের গতি (mobility) বেশি, 'আকস্মিকতা'ও (surprise) তাই কম নয়—মেঘ ও বায়ুমণ্ডলের জন্য আরও তাহা বাড়িতে পারে। বিমানের পথ নির্দিষ্ট নাই, কাজেই তাহার 'পথের নির্বিঘ্নতা' (security) আছে। কিন্তু পথে বাধাও আছে—তাহার নামিতে হয়; আর তেল ফুরাইলেই বিপদ। আবার, এখনো বিমানের দ্বারা বল-সন্নিবেশ (concentration) সুসম্ভব নয়। (ইহার বিরুদ্ধে স্মরণীয়—নরওয়ে ও ক্রীটের যুদ্ধের কথা) এমনি ভাবে যুদ্ধের দিক হইতে রেলপথেরও আবার বিচার করা চলে:—রেলের 'গতি' আছে, আকস্মিকতা নাই; "বল-সন্নিবেশের" দিক হইতে এখনো অগ্রগণ্য রেল-পথই; কিন্তু উহার নির্বিঘ্নতা আজ অনেক কমিয়াছে বোমারু বিমানের জন্য। এইরূপ হিসাব করিয়াই লিডেল হার্ট শ্রেষ্ঠ স্থান দেন—ট্যাংকের

মতো সর্বত্রগামী মোটরযানের।—অবশ্য ইংলণ্ডের মত দ্বীপের কথা একটু স্বতন্ত্র, সেখানে বরাবরই প্রাধান্য দিতে হইবে সমুদ্রযাত্রী জাহাজকে। বলা বাহুল্য, ফ্ল্যাণ্ডার্সের পরে যে ব্রিটেন টিকিয়া রহিল তাহার প্রধান কারণ তাহার নৌবল। এই ভাবেই আবার পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি বলের যাচাই চলে। লিডেল হার্ট আজ আর এই দুইটির উপযোগিতা বেশি দেখেন না—ইহাদের নির্বিঘ্নতা, আঘাত-শক্তি (hitting power), বল-সদ্ব্যয়, সচলতা, সহযোগিতা—সবই এই যুগের অস্ত্রশস্ত্রের ও গতি-তৎপরতার তুলনায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এখন আসিয়াছে ট্যাংকের ও বিমানের (aircraft) দিন—হয়তো বা গ্যাসের (gas) যুগ। ট্যাংক ও বিমানের যখন আবার শত্রু পক্ষের ট্যাংক ও বিমানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিবে তখন জয়ী হইবে তাহাদের ট্যাংক, তাহাদের বিমান, মোটামুটি যাহারা উৎকর্ষ সাধনা করিয়াছে এইসব দিকে।

লিডেল হার্টের এই সব সিদ্ধান্ত লইয়া তর্ক আছে, তাহার বিচারও চলে। কিন্তু আমাদের পক্ষে স্মরণীয় যুদ্ধের মূলসূত্র কি, কি ভাবে তাহার প্রয়োগ করা হয়, এবং কোন্ কোন্ নীতির সাহায্যে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রের, যান-বাহনের কিংবা সামরিক কোনো বিশেষ বিন্যাসের বা কৌশলের যাচাই করিতে হয়। আসল কথা এই, যুদ্ধের উপকরণ পরিবর্তিত হয়, রূপ বদলায়; কিন্তু এই সব গোড়ার নীতি থাকে অপরিবর্তিত।

চার

যুদ্ধবিদ্যা

সেনাপতিদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয় সংগ্রামে বা ব্যাট্‌লে—এই বিষয়ে যে বিশেষ বিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই বলা চলে যুদ্ধবিদ্যা (Art of War)। বলা বাহুল্য, যুগে যুগে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয়, যুদ্ধের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, উহার জটিলতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় বরাবরই তবু চাই—Strategy[১] বা সমর-সমাবেশ, Tactics বা রণকৌশল। তাহারও প্রয়োগ আবার নির্ভর করে বিশেষ স্থলের (Space) বিশেষ মুহূর্তের (Time) অবস্থার উপর। আর তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য সর্বদাই যুদ্ধোপযোগী মানসিক গুণগ্রামও চাই—তাহা বলাই বাহুল্য।

---

১ Strategy কথাটির মূল শব্দগত অর্থ সেনাপতির বিদ্যা। সেই অর্থে কেহ কেহ বাংলায় ইহাকে 'সেনাপত্য' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু 'সেনাপত্য' বলিতে তো Tacticsও বুঝায়, উহাও সেনাপতিরই দ্রষ্টব্য। এখানে 'সমর-সমাবেশ' বলিয়া 'Strategy'র অনুবাদ করা হইল। উহাও 'Strategy'র সব অর্থ প্রকাশ করে না, একটি দিকেই বেশি জোর দেয়। তবু কাজ চালাইবার জন্য Strategy অর্থে 'সমর-সমাবেশ' ও Tactics অর্থে 'রণকৌশল' প্রযুক্ত হইল। প্রয়োজন হইলে ষ্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিক্‌স্‌, অপারেশন্‌ প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইবে।

ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাক্‌টিক্‌স—সমর-সমাবেশ ও রণ-কৌশল—যুদ্ধের গোড়ার কথা, যুদ্ধবিদ্যারও প্রধান দুইটি কথা। কথা দুইটি লইয়া কিন্তু প্রায়ই গোল বাধে—তাই তাহাদের অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া জানা দরকার।

সমর-সমাবেশ ও রণকৌশল
(Strategy and Tactics)

প্রথমেই বুঝা দরকার, সমর-সমাবেশ মানে কি, আর রণ-কৌশল মানেই বা কি, দুইয়ে তফাত কোথায়।

এক একটা যুদ্ধে অনেক ঘটনা ঘটে—ছোট বড় অনেক যুদ্ধই থাকে। এই সমস্ত ঘটনা ও আয়োজন মিলাইয়াই War বা পূর্ণযুদ্ধ;—যেন এক মহানাটক। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই সামরিক কর্তৃপক্ষ এই পূর্ণযুদ্ধের আয়োজন করেন—তাহার প্ল্যান হয়তো পূর্বেই তৈয়ারি থাকে। তদনুযায়ী তখন অন্য সব ব্যবস্থা হয়—কোথায় কত সৈন্য যাইবে, কোথায় কিরূপ সন্নিবেশ হইবে, কি ভাবে তাহারা অগ্রসর হইবে বা অপেক্ষা করিবে, তাহাদের যুদ্ধ-সম্ভার সরবরাহ হইবে কিরূপে, ইত্যাদি। এইটাই সমর-সমাবেশের দিক—মহানাটকের সমগ্র প্রযোজনার দিক। কিন্তু যুদ্ধ মানে শুধু প্ল্যান নয়, সমাবেশও নয়,—লড়াই—দুই পক্ষের বলের সংঘর্ষ। এ নাটকের উহাই যেন এক একটি ছোট বা বড় দৃশ্য। প্রথম হইতেই তাহা ভাবিয়া লইয়া তাহার জন্য ব্যবস্থা

করিতে হয়—লড়াইতে না জিতিলে হয়তো পূর্বেকার প্ল্যান ও সমাবেশ আবশ্যকমত বদলাইতে হয়। এই সব খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ জিতিতে চাই—রণকৌশল—সেনাপতির গুণ, নানাভাবে আক্রমণ, প্রত্যাক্রমণ, আত্মরক্ষা, সৈন্যসজ্জা, চালনা প্রভৃতি। ইহার কাজ রণক্ষেত্রে যুদ্ধকালে। ষ্ট্র্যাটেজি পূর্ণযুদ্ধের ব্যবস্থা করে, অন্তত পক্ষে তাহার এক-একটি বড় অঙ্কের জন্য আয়োজন করে। কিন্তু ট্যাকটিক্‌সের কাজ আসল লড়াই, খণ্ডযুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্র।[১]

ক্লাউসেভিৎস ষ্ট্র্যাটেজি বা সমর-সমাবেশ বলিতে বুঝাইলেন, "পূর্ণযুদ্ধে (War) জয়ের জন্য খণ্ডযুদ্ধগুলির (battle) প্রয়োগ"। আর 'রণ-কৌশল' তাঁহার মতে—'খণ্ডযুদ্ধে' বা সংগ্রামে (battle) সশস্ত্র সৈনিকের প্রয়োগ।" 'Making use of battles in furtherance of the War'—ইহা Strategy; আর, "the use of the armed forces in battle" এই

১। যুদ্ধ বলিতে আমরা সাধারণত সব রকমের যুদ্ধই বুঝি—ছোট skirmish, যে-কোন combat, মূলবাহিনীর battle, এক-একটা বড় campaign, আবার operations ও war. ইংরেজিতে কথাগুলি পরিষ্কার। তবু গোল বাধিতেছে। ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ War বলিয়া পরিচিত; এবারকার ১৯৪০-এর ফ্রান্সের যুদ্ধ তবু Battle of France, আবার তাহার অংশ-বিশেষও battle. মোটের উপর আমরা কথাগুলির এখানে এরূপ ভাবে অনুবাদ করিয়া কাজ চালাইব।—war—পূর্ণযুদ্ধ; battle—খণ্ডযুদ্ধ ও সংগ্রাম; campaign—যুদ্ধপর্ব; operation—[illegible]ক্রিয়া, fighting লড়াই; skirmish—হাঙ্গামা, ইত্যাদি।

হইল tactics. সমর-সমাবেশের কাজ হইল—পূর্ণযুদ্ধের প্ল্যান তৈয়ারি করা, উহার ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধপর্বগুলির (campaigns), উদ্দিষ্ট পথ ছকিয়া দেওয়া, এবং সেই সব যুদ্ধের প্রত্যেকটি খণ্ড-যুদ্ধকে (battle) নির্দিষ্ট করা।[১] কিন্তু ক্লাউসেভিৎসের এই সূত্র সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে। কারণ, ইহাতে ষ্ট্র্যাটেজি বা সমর-সমাবেশ ও রণনীতি বা War Policy প্রায় এক হইয়া যায়। ইহার অপেক্ষা জার্মান সেনাপতি ফন্ মলট্‌কের কথা অনেকেই আরও ভালো মনে করেন। তাহার মর্ম এই:—"ষ্ট্র্যাটেজি দরকারের দাবি মিটায়। ইহা শুধু বিজ্ঞান নয়, বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। পরিবর্তমান অবস্থার মধ্যে যুদ্ধের প্রথম পরিকল্পনাকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্রমশ অগ্রসর করিয়া লওয়া—ইহাই ষ্ট্র্যাটেজি।" (Strategy is a system of make-shifts. It is more than a science; it is the application of science to practical affairs; it is carrying through an originally conceived plan under a constant shifting set of circumstance.) তাঁহার মতে সমর-সমাবেশই রণকৌশলের পক্ষে আঘাত হানার সুবিধা করিয়া দেয়, উহার সফল হইবার সম্ভাবনা করিয়া দেয়; সেই সফলতা আসে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের (conduct) ও সৈন্য

১ "Strategy forms the plan of the War, maps out the proposed course of different campaigns, which compose the War, and regulates the battle to be fought in each."—Clausewitz.

একত্রীকরণের (concentration) জন্য। অন্য দিকে সমর-সমাবেশও প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের ফলাফল মানিয়া লয়, তাহার উপরই আবার নূতন সমাবেশ স্থির করে। যখন রণকৌশলের ফলে খণ্ডযুদ্ধে জয় শুরু হয়, তখন সমর-সমাবেশ একটু অপেক্ষা করে—কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলে নূতন পরিস্থিতি উদ্ভূত হইলেই সমর-সমাবেশ আবার উহা কাজে লাগায়।[১]

সমর-সমাবেশ ও রণকৌশলের তফাত কোথায়, তাহা এই সব কথা হইতে অনেকটা বুঝা যায়; দুইয়ের বিভিন্ন এলেকা দেখিতে পারা যায়। রাজনীতিকরা যুদ্ধনীতির (War Policy) উদ্দেশ্য স্থির করেন, ষ্ট্র্যাটেজি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সামরিক উপায় নির্দেশ করে ও ক্ষেত্রানুযায়ী বল বণ্টন করে। সমাবেশের ফলে যখন সত্যই লড়াই (fighting) বাধে, তখন ওই সব প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য যে বল-বিন্যাস (disposition) ও তাহার নিয়ন্ত্রণ (control) দরকার হয়, তাহা ট্যাক্‌টিক্‌স বা রণকৌশলের এলেকায় পড়ে।

---

১ "Strategy furnishes Tactics with opportunity to strike and with the prospect of success, through its conduct of armies and of their concentration in the field of battle. On the other hand however, it accepts the results of every single engagement, and builds upon them. Strategy retires when a tactical victory is in making, in order later to exploit the newly created situation." Moltke.

কিন্তু তাই বলিয়া ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাক্‌টিক্‌সের এলেকা একেবারে স্বতন্ত্র নয়। অনেক ব্যাপার দুই এলেকাতেই পড়ে। দুইটিকে সেই সব ক্ষেত্রে চুল-চেরা তফাত করা যায় না। একজন জার্মান লেখক একটা মোটামুটি এলেকা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে (*The Art of Modern Warfare.*—Hermann Foertsch, p. 20)।

যুদ্ধের বিশেষ নাম	এলেকা	কাহারা নিযুক্ত হয়	কে আদেশ দেয়
একটি মাত্র বিগ্রহ engagement	ট্যাক্‌টিক্‌সের	সৈন্যবাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ বা ইউনিট হইতে ডিবিশন ও আর্মি-কোর্ পর্যন্ত	লাইন-নায়ক Line officer
খণ্ডযুদ্ধ battle		আর্মি-কোর বা আর্মি পর্যন্ত	
যুদ্ধপর্ব campaign	অপারেশন্	আর্মি, আর্মি-গ্রুপস, কিংবা নৌ, বিমান প্রভৃতি বলের অংশ পর্যন্ত	সাব্-কম্যাণ্ডার বা সেনাপতি
পূর্ণযুদ্ধ war	ষ্ট্র্যাটেজি	সমস্ত বল, নৌ, বিমান, স্থলসৈন্য ইত্যাদি	মহা-সেনাপতি-Comman der in-Chief

পূর্ণ সমাবেশ ও পূর্ণ কৌশল

ইংরেজীতে আরও দুইটি কথা আছে Grand Strategy, আমরা যাহার নাম দিতে পারি 'পূর্ণ সমাবেশ', এবং Grand Tactics যাহাকে আমরা বলিতে পারি 'পূর্ণ কৌশল।' এই দুইটি কথা ও ইহার সহিত সাধারণ ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাক্‌টিক্‌সের তফাত এই প্রসঙ্গে জানিয়া লইতে পারি।

গ্র্যাণ্ড ট্যাক্‌টিক্‌স—এই কথার দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দে বুঝানো হইত রণক্ষেত্রে ঠিক যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধের জন্য যে সৈন্য প্রভৃতি চালাচাল করা হইত উহাকে। এখন গ্র্যাণ্ড ট্যাক্‌টিক্‌স বলিতে বুঝায় সৈন্য, নৌ-বল, বিমান প্রভৃতি সমুদয় বল নিয়োগের মূল প্ল্যান। এই প্ল্যানে কিন্তু যুদ্ধের আর্থিক বা রাজনীতিক দিক থাকে না, উহা গ্র্যাণ্ড ট্যাকৃটিকসের অন্তর্গত নহে।

গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি বা পূর্ণ সমাবেশ বলিতে বুঝায় যুদ্ধের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য—সেই লক্ষ্য অবশ্য রাজনীতিকরা তাহাদের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী স্থির করেন—জাতির সর্ববিধ শক্তি সংহত করা ও সেই মত চালিত করা। তাই গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজিতে বা পূর্ণ সমাবেশে জাতির ধনবল, জনবল, নৈতিক বল প্রভৃতির হিসাব লইতে হয়, সব ঠিক মত উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতে শত্রুর উপর টাকাকড়ির চাপ দেওয়া হয়, কূটনৈতিক চাপ তো দেওয়াই হয়। এই সবই গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজির অন্তর্গত। ষ্ট্র্যাটেজির এলেকা যুদ্ধ পর্যন্ত, কিন্তু গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজির দৃষ্টি যায় শান্তি পর্যন্ত

(*Encyclopaedia Britannica* 14th. Edn. "Strategy" প্রবন্ধ)।

বলা বাহুল্য, War Policy বা যুদ্ধনীতি বলিতেও অনেকাংশে ইহাই বুঝায়। কোনও দেশের 'যুদ্ধের লক্ষ্য' ও 'শান্তির লক্ষ্য' (War Aim, Peace Aim) বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও পড়ে তাহার 'গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজির' মধ্যে। কিন্তু এইসব জিনিস সেনাপতিদের দ্রষ্টব্য নয়, তাই ইহা ঠিক যুদ্ধবিদ্যার অন্তর্গত নয়। তাই ক্লাউসেভিৎস্ ষ্ট্র্যাটেজির যে ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অনেকে গ্রহণ করিতে চায় না, উহা যুদ্ধ-নীতির সমতুল্য ব্যাপক হইয়া পড়ে।

(১) ষ্ট্র্যাটেজি—উহার উদ্দেশ্য

রাজনীতিকেরা যুদ্ধারম্ভ স্থির করেন, তাঁহাদের সামরিক লক্ষ্য কি সেনাপতিমণ্ডলকে জানান। সেই অনুসারে সেনাপতিরা তাঁহাদের মোট যুদ্ধ-প্ল্যান স্থির করেন, ষ্ট্র্যাটেজি বা সমর-সমাবেশ নির্ণীত হয়। তাঁহাদের এই জন্য দুইটি কাজ করিতে হয়—হিসাব করিতে হয় তাহার সম্বল কতটা আছে এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্য ও উপায়ের একটা সামঞ্জস্য করিতে হয়। উপায় না থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না, আর উদ্দেশ্য ঠিক না থাকিলে উপায়ের অপব্যয় হইবে। বলের সদ্ব্যয়ের (Economy of Forces) জন্য চাই এই সবের সুসঙ্গতি।

সমর-সমাবেশের উদ্দেশ্য বা ষ্ট্রাটেজিক উদ্দেশ্য কি—ইহা লইয়া একটু তর্ক আছে। জার্মান যোদ্ধারা সাধারণত ক্লাউসে-ভিৎসের কথিত যুদ্ধের লক্ষ্যকেই চরম কথা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, সমর-সমাবেশের উদ্দেশ্য হইল—শত্রুর বল ধ্বংস করা; এবং তাহারই জন্য শত্রুর দেশ ও তাহার যুদ্ধাবলম্বন (resources) হাত করা। বল-ধ্বংসের উপর তাঁহারা জোর দেন—এই জন্যেই এই পদ্ধতিকে বলা চলে ধ্বংসোদ্দেশ্যে সমর-সমাবেশ (Strategy of Annihilation)। কিন্তু অনেকে বল-ধ্বংসকে এত প্রাধান্য দেন না। মনে করেন, প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংসের অত চেষ্টা না করিয়া বলক্ষয়ের (Exhaustion বা Attrition) জন্য চেষ্টা করা আরও সুবুদ্ধির কাজ। ইহাতেও লড়াই দরকার হয়, সবই লাগে; তবে ইহাতে শেষ পর্যন্ত নিজের লাভ বেশি। জার্মান যুদ্ধ-ঐতিহাসিক দেলব্রুক (Delbrueck) ইহাকে বলেন 'শত্রুক্ষয়ের সমর-সমাবেশ' (Strategy of Exhaustion)। এ যুগের ইংরেজ লেখক লিডেল হার্ট প্রভৃতি কেহ কেহ যেরূপ সমর-সমাবেশের কথা বলেন—মনে হয় তাহা ইহারই একটা প্রকারভেদ। লিডেল হার্ট ইহার নাম দিয়াছেন—গৌণ প্রয়াস (Indirect Approach)। তাঁহার যুক্তি সংক্ষেপে আমরা পূর্বেও নির্দেশ করিয়াছি (দ্রষ্টব্য—'যুদ্ধের লক্ষ্য', পৃঃ ২০, *Encyl. Brit.* 14th Edn. "Strategy")। শত্রুকে এরূপ ভাবে নিরস্ত্র বা নির্জিত করিবার বহু দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন। ইহার অনেকগুলিই সমর-সমাবেশের চমৎকার

উদাহরণ। ১৮৭০-এ জার্মান সেনাপতি ফন্ মল্টকে এই ভাবে ফরাসীদের সমস্ত বাহিনী 'পরিবেষ্টিত' করেন। ১৯১৮-তে ইংরেজ সেনাপতি এলেন্‌বি প্যালেষ্টাইনেও এইরূপ আর একটি গৌণ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত দেখান—তুর্কীরা ধীরে ধীরে তাহাতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। ইতিহাসের পাতায় এরূপ অনেক যুদ্ধই আরও মিলে। পার্শীদের ৪৮১খ্রী. পূর্বাব্দে গ্রীকেরা হারায় সমুদ্রপথে তাহাদের পিছনে উপস্থিত হইয়া। হ্যনিবল আরেটিয়ুমের (Arretium) যুদ্ধে রোমানদের পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন; তথাপি আক্রমণ না করিয়া চলিলেন ট্রাসিমেন হ্রদের (Lake Trasimene) দিকে—রোমানরা সেই ফাঁদে পা দিল আর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আবার রোমের সেনাপতি সিপিও এই গৌণ প্রয়াসের চূড়ান্ত ফল দেখান হ্যনিবলের বিরুদ্ধে। মোটের উপর, এই পদ্ধতি মত সমর-সমাবেশের অর্থ শুধু লড়াইয়ের (fighting) আয়োজন নয়, বরং সুবিধামত স্থান (strategic position) হাত করিয়া লওয়া। এই পদ্ধতিতে একটা বড় চেষ্টা হয় শত্রুর ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা (dislocation) আনয়নের—তাহাতে হয় শত্রু-সৈন্য মিলাইয়া (dissolution) যাইবে, না হয় ছিন্নভিন্ন (disruption হইয়া পড়িবে। অবশ্য সেজন্য এক-আধটুকু লড়াইয়ের (fighting) দরকার হইতে পারে। এ যুগের যুদ্ধে যানবাহন প্রভৃতি এত সাজ-সরঞ্জাম লাগে যে, ওইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে আর সৈন্যদের যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। কাজেই এ যুগের সমর-সমাবেশেই

এইরূপ গৌণ প্রয়াসের পদ্ধতি পূর্ব্বাপেক্ষা খাটে বেশি—ইহাই লিডেল্ হার্টের বিশেষ প্রতিপাদ্য।

মোটের উপর ষ্ট্রাটেজি বা সমর-সমাবেশের একটা উদ্দেশ্য সবাই স্বীকার করে। তাহা এই—নিজের পক্ষে সর্বাধিক সুবিধামত অবস্থায় চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে আনিয়া ফেলা (Object of Strategy is to bring about the battle i. e. decisive battle, under the most advantageous circumstances". *Encyclopaedia Brit.* 14th Edn. "Strategy" প্রবন্ধ)। এই জন্য দুই প্রকারের সুবিধা দেখিতে হয়—স্থানের ও কালের, যেখানে সুযোগ বেশি আর যে সময় সুযোগ বেশি। কিন্তু শত্রুও এরূপ অবস্থায় না পড়িবার চেষ্টা করে। অতএব তাহাকে সেরূপ অবস্থায় আনিয়া ফেলিতে হয় ছলে, বলে, কৌশলে, ইহাতেই ষ্ট্রাটেজির সার্থকতা।

ষ্ট্র্যাটেজি ও পূর্বকল্পনা

যুদ্ধ ঘোষণা হইলেই তাই এরূপ সমাবেশের চেষ্টা করিতে হয়। পূর্ব হইতেই এই জন্য প্ল্যান করিতে হয় বটে, কিন্তু সেই প্ল্যান যে ঠিক ঠিক খাটিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? গত মহাযুদ্ধে জার্মানদের শ্লীফেন প্ল্যান বহুভাবে দোরস্ত করা ছিল, কিন্তু কার্য্যত তাহা সার্থক হইল না। তাই মল্‌টকের কথাই এ বিষয়ে খাটি—"যুদ্ধের ব্যাপারে যাহা সম্মুখে রাখিয়া কর্তব্য স্থির করিতে

হয়, তাহা এই যে—কি ঘটা সম্ভব। শত্রুর সঙ্গে প্রথম সংঘাতের কথাই ঠিকমত ভাবা চলে, তাহার বেশি দেখা কোন যুদ্ধ-পরিকল্পনায় সম্ভব হয় না। সাধারণ লোকেরা যুদ্ধ দেখিয়া মনে করে, বুঝি পূর্ব হইতেই উহার প্রত্যেকটি স্তর ভাবিয়া প্ল্যান করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই স্তরে স্তরে অনুসৃত হইয়াছে, একেবারে শেষ পর্যন্ত এই ভাবে গিয়া পৌছানো গিয়াছে। কিন্তু এই যে একটির পর একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করা, ইহা সেনাপতির পূর্ব হইতে চিন্তিত থাকে না, যুদ্ধ-মধ্যেই ক্রমে উদ্ভূত হয়। এই দিকে সামরিক মনীষাই সেনাপতির ভরসা। এই কারণেই নেপোলিয়ন বলিতেন—তাঁহার কোন যুদ্ধের প্ল্যানই তিনি করেন না। এই কারণেই ক্লাউসেভিৎস্ বলেন—"ষ্ট্র্যাটেজির বিষয় খুব সরল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা সাধন সহজ নয়।" ভুল না করিয়া, পিছপা না হইয়া, দ্বিধায় ইতস্তত না করিয়া নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাওয়া—ইহা সহজ নয়। সেনাপতিরা যত যুদ্ধে অতিরিক্ত সাহসের জন্য হারিয়াছেন, তাহার চেয়ে বেশি হারিয়াছেন অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য (*The Nature of Madern Warfare—Cyril Falls*, p. 41) ক্লাউসেভিৎসের মতে সেনাপতির এই জন্যই চাই "চরিত্র-শক্তি, আত্ম-প্রত্যয়, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি।"

ষ্ট্র্যাটেজির কার্যধারা

নিজের সুবিধামত স্থানে, সুবিধামত সময়ে—নিজের একান্ত সুবিধায়, শত্রুর অসুবিধায়—তাহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করাই হয় প্রথম হইতে সমর-সমাবেশের উদ্দেশ্য। যুদ্ধঘোষণার পূর্বেই প্রায় শুরু হয় রাষ্ট্রীয় ও সামরিক যুদ্ধসজ্জা (mobilisation)। সমর-সমাবেশের প্রথম পর্বে তাই দরকার একত্রীকরণ (concentration), সৈন্যদের যুদ্ধার্থে যানবাহনে প্রেরণ (transfer), জড়ো করা (assembly), প্রস্তুত করা (preparation)। কোথায় যুদ্ধ, কিরূপ তাহা, ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে তাহার ব্যবস্থা এই প্রথম পর্বে না করিলে পরে সমস্ত যুদ্ধেও আর এই ত্রুটি সংশোধন করা যায় না, ইহা মল্টকের কথা। অবশ্য এই প্ল্যান একেবারে ধরাবাঁধা না হওয়াই ভাল; দরকারমত ইহার পরিবর্তন করিতে পারা চাই। আর এই একত্রীকরণ যে তাড়াতাড়ি করিতে পারে, তাহারই সুবিধা হয় বেশি। ইহারই দ্বিতীয় পর্বে আসে যুদ্ধক্রিয়া (operations), সৈন্যচালনা (movement) ও একেবারে লড়াই (fighting)।

তৃতীয় একটা জিনিস বরাবর দেখিতে হয়—নিজের বাহিনীর নির্বিঘ্নতা (protection); তাহার জন্য চারদিকে শত্রুর সন্ধান (reconnaissance) করিতে হয়, জায়গারও সন্ধান রাখিতে হয়। যেখানে একত্রিত সৈন্যদের ঘাঁটি বা base থাকে তাহাকে বলা হয় যুদ্ধের মূল ঘাঁটি (operative base)। সেখান হইতে যে পথে যে

দিকে সৈন্যেরা প্রেরিত হয়, তাহাকে বলা হয় যুদ্ধের পথ (operative line)। এইরূপ দুইটি পথে সাধারণত সৈন্যরা মূলঘাঁটি হইতে চালিত হয়। যে সব পথ সরাসরি একেবারে ঘাঁটির মধ্যক্ষেত্র (inner line) হইতে বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহাকে বলে কেন্দ্রাতিগ (Eccentric) বা মধ্যক্ষেত্রের পথ; আর যে সব পথ ঘাঁটির কোন প্রান্ত হইতে (Outer line) বাহির হইয়া একমুখীন হয় তাহাকে বলে, কেন্দ্রমুখী (concentic) বা বহিঃপথ। যুদ্ধে প্রায়ই এই কথা দুইটি শোনা যায়।

এইসব সমাবেশমূলক চালনার উদ্দেশ্য যুদ্ধজয়। তাহার জন্য দরকার হয় খণ্ডযুদ্ধ বা battle। উহাতে যে কৌশল দরকার, তাহা রণকৌশলের বিষয়। অবশ্য তেমন ভাল সমাবেশ হইলে এই খণ্ডযুদ্ধ আর প্রয়োজনও হয় না; শত্রু বুঝে, সে বান্‌চাল হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ বড় একটা হয় না—লড়াই করিতেই হয়, সংগ্রাম বাধেই। কিন্তু সমর-সমাবেশ ঠিক রূপে হইলে সতর্ক রণকৌশলের দ্বারা চূড়ান্ত ফল লাভ করা যায়। দ্বিতীয় কথা—এই জন্য অন্তত সেই চূড়ান্ত ক্ষেত্রে থাকা চাই বিজেতার বলাধিক্য—সশস্ত্র বলের ও মনোবলের দুইয়েরই এইরূপ আধিক্য চাই—ইহার সামরিক নামই প্রধান প্রচেষ্টা (main effort)। বলাধিক্যের মানে এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক পিছনে বা নিকটে তৈরি থাকা চাই মজুত বল (reserves)।

স্থানের সুযোগ, কালের সুযোগ ও বলের আধিক্য থাকিলে সেনাপতি আক্রমণ (offensive ও attack) আরম্ভ করেন।

আক্রমণ তাই যুদ্ধবিদ্যার ও সমর-সমাবেশের একটা প্রধান উপায় হইয়া উঠে। এক পক্ষ আক্রমণ করিলেই অন্য পক্ষ আক্রমণ রোধ করে। এইখানেই আবার ষ্ট্র্যাটেজির এক তত্ত্ব লইয়া একটা তর্ক উঠে—আক্রমণই কি বড় কথা, না আত্মরক্ষা বড় কথা (Attack or Defence)?

আক্রমণ, না প্রতিরোধ?

সাধারণ ভাবে জার্মান যুদ্ধ-চিন্তায় আক্রমণেরই আদর দেখা যায় বেশি। কিন্তু ক্লাউসেভিৎস্ প্রতিরোধমূলক যুদ্ধকেই উৎকৃষ্ট যুদ্ধপদ্ধতি বলিয়া মনে করিতেন। "Defence is the stronger form war." ইহার কারণ এই যে, আক্রমণ যে করে সে বেশি শক্তি প্রয়োগ করে, তাহার শক্তি বেশি ক্ষয় হয়। তাই ক্রমে সে দুর্বল হইতে থাকে। আর প্রতিরোধ যে করে তাহার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহার তাই ক্ষতি কম হয়, সে ক্রমে শত্রুর তুলনায় সবল থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া আক্রমণ যে করে তাহারও নিজের নির্বিঘ্নতার অর্থাৎ শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়—দুই কথাই তা ার ভাবিতে হয়। কিন্তু প্রতিরোধ যে করে সে শুধু এক চেষ্টাই করে, নির্বিঘ্নতার। ইহাই না কি ক্লাউসেভিৎসের কথার মানে (*The Nature of Modern Warfare*, Cyril Falls, p. 84)। যে আক্রমণ করে সে যতই অগ্রসর হয়, প্রতিপদে

ততই তাহাকে নির্বিঘ্নতার নূতন ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহার নূতন সৈন্য ও সমর-সম্ভার চাই, নূতন স্থানের সঙ্গেও পরিচয় থাকা চাই। এই সব কোনো অসুবিধাই প্রতিরোধ-যুদ্ধের নাই—দুর্বল পক্ষ তাই প্রতিরোধ-পদ্ধতিই গ্রহণ করে। আর শক্তিশালী হইলে প্রতিরোধকারী নিজের ইচ্ছামত ক্ষেত্রে, নিজের সুবিধামত সময়ে, এমন কি নিজের অল্প বল লইয়াও আক্রমণের অপেক্ষা করে। অনেক বড় বড় সেনাপতিও প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধ দ্বারাই শত্রুকে পরাজিত করিয়াছেন। যেমন, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটন সময়ে সময়ে স্পেনে এইরূপ যুদ্ধ করেন; চেট্‌উড প্যালেষ্টাইনে ফল্‌কেন্‌হাইনের বিরুদ্ধে এইরূপ যুদ্ধ করেন।

কিন্তু আক্রমণেও সুবিধা আছে। প্রথমত উদ্যোগ (initiative) উহাতে নিজের হাতে থাকে, নিজের ইচ্ছানুরূপ শত্রুকে খেলানো যায়, শত্রুই আমার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া নিজের সৈন্যেরা উহাতে উৎসাহ পায়, শত্রুসৈন্যের উহাতে আশা-ভঙ্গ হয়। এই জন্য গ্নেসেনাউ ও মল্‌টকে হইতে প্রায় সকল জার্মান সেনাপতি আক্রমণমূলক যুদ্ধের পক্ষপাতী হন।

গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় আক্রমণমূলক যুদ্ধে, কিন্তু পরিণত হয় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে। গত যুদ্ধের পরে তাই প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধের খুব কদর বাড়িয়া যায়—বিশেষত ব্রিটেনে ও ফ্রান্‌সে। ব্রিটিশ লেখক লিডেল্ হার্টের প্রত্যেক লেখায় উহার স্বপক্ষে যুক্তি এখনো রহিয়াছে। আক্রমণকারীকে অস্ত্র ও জনবলে অন্তত

প্রতিপক্ষের অপেক্ষা তিন গুণ বেশি বলশালী হইতে হইবে—এখন ইহাই তাঁহাদের মত।

এই কথা স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি ঠিক। জলযুদ্ধে কিন্তু বিপরীত—দুর্বল পক্ষকেই আক্রমণ-মূলক যুদ্ধ করিতে হয়। কারণ প্রবল পক্ষের জাহাজ ও রণতরী সর্বত্র চলাচল করে। এই বিস্তীর্ণ চলাচলের পথে তাহাকে এখানে-ওখানে আক্রমণ করার সুযোগ বেশি। তাহাই করিতেও হয়। ইহাই এবারকার জার্মান নৌযুদ্ধের নীতি।

কিন্তু স্থলেও প্রতিরোধের কাজ যে শুধুই শত্রুকে রোধ করা, তাহা নয়। তেমন খাঁটি প্রতিরোধও বড় দেখা যায় না। একবার শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হইলে শত্রুই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়, সাময়িক ভাবে অন্তত সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তখন প্রতিরোধকারীর হয় প্রতি-আক্রমণের (counter attack) সুযোগ—তাহা প্রায়ই হয় পূর্ব-আক্রমণকারীর পক্ষে মারাত্মক। এইরূপেই প্রতিরোধ শেষে সার্থক সমাবেশ রূপে দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধ স্থাণু (static) নয়, উহাও গতিময় হইতে পারে—হইতে পারে প্রতিরোধ-প্রধান আক্রমণ Defensive Offensive। কিন্তু সেনাপতির পক্ষে সেই মুহূর্তটি ঠিক মত ধরা দরকার—যখন শত্রুর আর বলাধিক্য নাই। কারণ, অল্প বল লইয়াও অনেকে যুদ্ধ জিতেন বটে, কিন্তু অন্তত ঠিক চূড়ান্ত স্থানটিতে বেশি বল—সৈন্যবল ও অস্ত্রবল দুইই—না থাকিলে যুদ্ধে জয় অসম্ভব। যুদ্ধদেবতা 'বৃহত্তর বাহিনীর' পক্ষেই থাকেন—ইহা

মনে রাখা উচিত। তৃতীয় একটা যুদ্ধপদ্ধতিও আ[illegible] বিলম্বসাধন (Dilatory Strategy)। দুর্বল পক্ষের ইহা[illegible]ম্বন করিতে হয়। ইহা অনেকটা প্রতিরোধের অনুরূপ-উ[illegible]। শত্রুর ক্ষয় (extermination), শত্রুকে দেরি করানো আর তদবসরে নিজের বলবৃদ্ধি।

আক্রমণের বিবিধ পথ

আক্রমণ অর্থ লড়াই (fighting)। সে অর্থে উহা [illegible]শলের বস্তু, সমর-সমাবেশের নয়। কিন্তু সমর-সমাবেশ [illegible]মণ-মূলক যুদ্ধ স্থির করিলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করে—সেরূপ আক্র[illegible]ণকে ষ্ট্রাটেজিক বলা হয়। যেমন, শ্লীফেন প্ল্যানের পরিকল্পনা ছিল ফ্রান্স আক্রমণ। আক্রমণের প্রকারভেদ আছে। সম্মুখে (frontal) আক্রমণ চলে; আবার এক প্রান্তে বা দুই প্রান্তে (wing) আক্রমণ করা চলে; (১) সম্মুখের আক্রমণ (fron[illegible]al attack), ইহাতে শত্রুকে পিছনে হটাইয়া শেষ পর্যন্ত (fla[illegible] attack) শত্রুরাজ্যের সীমানায় কোণঠাসা করা [illegible]। (২) প্রান্তের আক্রমণ বা পার্শ্বাক্রমণ (flank att[illegible]): যদি বেশি অগ্রসর হয় তবে উহাতে পার্শ্ববেষ্টন বা "envelopment" সম্ভব হয়। ইহাও আবার দুই পার্শ্ব হইতেই হইতে পারে (Double Envelopment)। (৩) কিন্তু শত্রুকে একেবারে সম্মুখে আক্রমণ না করিয়া কিংবা সামান্য ভাবে

তাহাকে সম্মুখে ঠেকাইবার বা ঠকাইবার জন্য (contain) কিছু সৈন্য রাখিয়া, বেশির ভাগ সৈন্য লইয়া একেবারে তাহাকে ঘিরিয়া যখন পিছনে চলিয়া যাওয়া যায়, তখন সেই চালনাকে বলা হয়—পরিবেষ্টন (Encirclement)। ইহা যত বেশি পিছন দিয়া করা যায় ততই ভালো, শত্রুর যানবাহনের আর সুযোগ থাকে না। কিন্তু ইহাতে খুব বেশি সৈন্য লাগে; না হইলে পরিবেষ্টনকারীই উল্টা পরিবেষ্টিত হইবার সম্ভাবনা।

বলা বাহুল্য সম্মুখ সমরের অপেক্ষা পার্শ্বাক্রমণে শত্রু বিপন্ন হয় বেশি; তাহার অপেক্ষা বেশি বিপন্ন হয় পার্শ্ববেষ্টনে, আর পরিবেষ্টনে সে প্রায় ধ্বংস হয়। পরিবেষ্টন ছাড়া অন্যরূপ আক্রমণে প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে লড়িতে হয়; ঐ সব আক্রমণ তাই ট্যাক্‌টিকসের অন্তর্গত। খাঁটি পরিবেষ্টন এযুগে দুর্ঘট। অবশ্য পার্শ্ববেষ্টনেরও অভীষ্ট একরূপ পরিবেষ্টন। এই দুইটিই এ যুগের যুদ্ধে জার্মান সেনাপতিদের বরাবরকার লক্ষ্য।

কিন্তু এ যুগে যুদ্ধ চলে বহুশত মাইল দীর্ঘ ফ্রন্টে—ইহার পার্শ্ব কোথায় যে তাহা আক্রমণ করিবে, বা একেবারে পরিবেষ্টন করিবে? তাই পার্শ্বাক্রমণ সম্ভব না হওয়ায় আক্রমণের আর এক পথ লইতে হয়। সম্মুখেই আক্রমণ চলে। দুর্বল স্থান বাছিয়া সেখানে মুখ্য প্রচেষ্টা ('main effort') করিতে হয়—ব্যূহে প্রবেশ (penetration) করিতে হয়, ভেদ পুরাপুরি হইলেই ফ্রন্ট বিদীর্ণ হয়। ইহাই break-through বা ব্যূহভেদ। উহার মধ্য দিয়া সমস্ত বল ঢুকিয়া পড়িয়া সম্মুখে ডান বামে শত্রুর পিছনে নানা

দিকে স্রোতের জলের মত ছড়াইয়া পড়ে। [illegible] জন্য অবশ্য ছেদকারীদের থাকা চাই বহু মজুত সৈন্য (reserve)।

ষ্ট্র্যাটেজির অবলম্বন

মোটামুটি সকল প্রকারের সমাবেশের জন্যই কতকগুলি জিনিস দরকার। যেমন প্রথম সেনাপতির প্রয়োজন—(১) সাহস ও সংকল্প; (২) প্রারব্ধ প্রয়াসে দ্বিধাগ্রস্ত না হওয়া ("undeviationg thrust")। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য—স্বাভাবিক বাধা-বিপত্তি। যেমন, (৩) অনিশ্চয়তা, (৪) গরমি[illegible]ন্ধকালে (friction) মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ থাকে [illegible] কিংবা জিনিসপত্র এক জায়গার বদলে অন্য জায়গায় চলিয়া যায়, এ[illegible]প। (৫) 'যুদ্ধের কুয়াসা'—যুদ্ধের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ কিছুই দেখা যায় না। (৬) আক্রমণে ক্রমাগত শক্তিহ্রাস—প্রকৃতির নিয়মে সব প্রয়াসই এইরূপ হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, এই সবের প্রতিবিধানের জন্য সেনাপতির প্রয়োজন—(৭) সংবাদ সংগ্রহের জন্য লড়াই-সন্ধানী বিমান-যোগে, বন্দীদের নিকট হইতে, টহলদার বা স্ক[illegible] সৈন্য দিয়া। (৮) নির্বিঘ্নতা—নানা ভাবে ইহা বজায় রা[illegible]ত হয়। ইহার জন্য ছলনার জাল পাতিতে হয়, শ্রান্তি আসিতে দিতে নাই; (৯) বলের সদ্ব্যয়—সাধারণ দ্রষ্টব্য ছাড়াও দেখিতে হয় যেন বল বিক্ষিপ্ত না হয়, বৃথা শ্রান্ত না হয়, বৃথা বসিয়া না থাকে, ঠিক মত বিন্যস্ত (disposed) থাকে। (১০) আর শেষ কথা

—সেই আকস্মিকতা। অবশ্য সমর-সমাবেশে চমক লাগানো আজ শক্ত কথা :—নেপোলিয়নের আল্পস্-অতিক্রমণ তেমনি সমাবেশ, জার্মানি এ যুগে নরওয়েতে, ক্রীটে ও অন্যত্র তাহা দেখাইয়াছে। তবে অধিকাংশ 'চমকই' মূলত ট্যাক্টিকসের।

মোটের উপর সমাবেশের সার্থকতাতেই যুদ্ধ মানুষের চক্ষে অপূর্ব ও বিস্ময়কর হইয়া উঠে। নেপোলিয়ানের সমস্ত উলম অষ্টারিলট্‌স যুদ্ধের পরিকল্পনা, ওয়ারলুর্‌র বল-বিন্যাস, এলেনবির প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার যুদ্ধ—এই সবেই সেনাপত্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। তাই বলা হয়, ষ্ট্রাটেজি শিখিবার মত বিদ্যা নয়; সে প্রতিভা জন্মগত।

(২) ট্যাক্টিক্‌স বা রণকৌশল

লড়াই আরম্ভ হইলে ট্যাক্টিক্‌স বা রণকৌশলের পরিচয় লাভ করা যায়। আর লড়াই ছাড়া, অস্ত্রমুখে ছাড়া, যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা বড় হয় না। তাই ষ্ট্র্যাটেজি শেষ পর্যন্ত ট্যাক্টিক্‌সের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে; সশস্ত্র সৈন্যকে লড়াইতে চালনা করিতে হয়—উপস্থিত যুদ্ধের প্রয়োজনানুযায়ী। ইহার কাজ তাই সৈন্যদের মার্চ, বিশ্রাম, সন্ধান, নির্বিঘ্নতা, অস্ত্রপূরণ (replenishment), সৈন্যসজ্জা (formation) করা ইত্যাদি।

কোন্ ট্যাক্টিক্‌সের বা রণকৌশলের উদ্দিষ্ট কি, তাহা অবশ্য সমর-সমাবেশ বা ষ্ট্র্যাটেজি দ্বারা ঠিক হইয়া থাকে, যেমন ষ্ট্র্যাটেজির

উদ্দিষ্ট কি তাহা রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে তাহারও পূর্ব ঠিক হইয়া থাকে। রণকৌশলের উদ্দেশ্য মোটের উপর যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা। তাহা শত্রু-সৈন্য 'ধ্বংস' করিয়া হইতে পারে, তাহাকে 'ক্ষয়' করিয়া হইতে পারে। তাহাকে বিলম্ব (delaying action) করাইবার জন্য নিজে পশ্চাদপসরণ (retreat) করিয়াও হইতে পারে। অথবা নিজের সৈন্যেরা মার্চ করিয়া, পিছু হটিয়াও একটা নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে; তাহা দ্বারাও যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর। রণকৌশলের পথ তাই দুই-একটি নয়, অনেক। প্রায়ই 'যৎকালে তদ্‌বিবেচনা' করিয়া এক বা একাধিক উপায় রণকুশলী সেনাপতিকে গ্রহণ করিতে হয়। সমাবেশের মত উহাও নানা প্রকারের হইতে পারে—যেমন, শত্রুর-ব্যূহ প্রবেশ (penetration), ব্যূহভেদ (break through)। পার্শ্বাক্রমণ (flank attack), পার্শ্ববেষ্টন (envelopment)। খাঁটি পরিবেষ্টন (encirclement) কিন্তু সমাবেশ; উহার পথ রণক্ষেত্রের বাহির দিয়া, উহাকে রণকৌশল বলা যায় না। আবার, রণকৌশলও আক্রমণমূলক (offensive) বা প্রতিরোধমূলক (defensive) হইতে পারে, এবং উহাতেও দুইয়েরই সুবিধা-অসুবিধা আছে। উহার চালনা (movement) নানারূপ। যথা—অগ্রগতি (advance), পশ্চাদপসরণ (retreat) ও সমগতি (lateral) প্রভৃতি। উহার জন্যও নিজের নির্বিঘ্নতা দেখিতে হয়। তাহার জন্য আবার দরকার শত্রুর সম্বন্ধে ও যুদ্ধভূমির সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ এবং নিজের ব্যূহকে তদনুযায়ী সুরক্ষিত

করা। সৈন্য-রচনা আবার সুরক্ষিত (closed formation) বিভাগে বা সহজ বিভাগে (open formation) হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরক্ষিত বিভাগে চালিত হইলে সেই চালনাকে বলে 'বহু-বিভাগ' ('development'); আর সহজভাবে লড়াইয়ের জন্য বল বিস্তৃত করাকে বলে 'বিস্তার' (deployment)। ট্যাক্‌টিক্‌সের সফলতার জন্যও অবশ্য মজুত সৈন্য (reserves) প্রয়োজন।

এই কথা সত্য—সেনাপতিদের মধ্যে সমাবেশের প্রতিভা দুর্লভ, রণকুশল সেনাপতি বেশি পাওয়া যায়। একজনকে যুদ্ধবিদ্যায় মহাশিল্পী, আর একজন ওস্তাদ বা কারুশিল্পী বলিলেই চলে।

এই কারুশিল্পীরাই কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মেরুদণ্ড। ইহাদের হাতেই মাল-মসলা নূতন রূপ লাভ করে। সেই মাল-মসলা কি? একদিকে—সৈন্যবাহিনী, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের মানসিক শক্তি এমন কি, জাতির নৈতিক বল। অন্যদিকে—সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, উপকরণ, যন্ত্রপাতি, অর্থাৎ জাতির শিল্প-শক্তি। মানুষ ও যন্ত্র দুইই চেষ্টা করিলে খরধার হইতে পারে; তাহাতে আবার রণকৌশলে নূতন শক্তি-সঞ্চার হয়। অবশ্য জনবল যন্ত্রবল, নৈতিক বল, এই তিনটি ছাড়াও আরও একটি জিনিসের কথা সেনাপতির ভাবিতেই হয়। উহা পারিপার্শ্বিক, বা স্থান ও কাল; অর্থাৎ যুদ্ধের বিশেষ ক্ষেত্র আর যুদ্ধের বিশেষ মুহূর্ত।

(৩) স্থান ও কাল

স্থান ও কাল নড়চড় করা সহজ নয়। সমর-সমাবেশের বা ষ্ট্র্যাটেজির পক্ষে এদিকে একটু সুবিধা থাকে; কতকাংশে ইচ্ছামত ক্ষেত্র ও সময় বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু রণকৌশলের বা ট্যাক্‌টিক্‌সের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র ও যুদ্ধ-মুহূর্তকে মানিয়া লইতেই হয়। যুদ্ধভূমি (terrain) সংকীর্ণ না প্রশস্ত, উঁচু না নীচু না সমতল, দূরে না নিকটে, এইসব প্রশ্নের উপর সৈন্য চালনা, অস্ত্র নির্বাচন, এক কথায় যুদ্ধের রূপ নির্ভর করে—এমন কি, জয়-পরাজয়ও নির্ভর করে। "যুদ্ধভূমি যত রকমের যুদ্ধও তত রকমের",—ইহা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কথা। তাই সেনাপতির চাই ভূচিত্র (ম্যাপ); চাই ভূগোলের জ্ঞান। দেশের ভূগোল, তাহার লতাপাতা, তাহার নদনদী, তাহার কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদ হইতে ভূমির গুণাগুণ, কিছুই না জানিলে নয়। পার্বত্যভূমিতে, নদীমাতৃক দেশে ও জলা-জায়গায় সৈন্যদের যুদ্ধে অনেক বাধা, জনসেনাদের পক্ষে সেসব ক্ষেত্রে তাহা নাই। অরণ্যাচ্ছাদিত দেশেও তাহাদের সন্ধান রাখা কঠিন। শিল্পকেন্দ্র, রেলের কেন্দ্র, যাতায়াতের মোড়, বড় শহর—এইসবের সামরিক গুরুত্ব প্রচুর। মানুষও ভূমির বাধাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে—দুর্গ দ্বারা বা অন্যরূপ বাধা তুলিয়া উহা দুর্গম করিয়া।

কালের গণনাও এইরূপ। সুযোগ হিসাবে সময় অমূল্য জিনিস; গেলে আর আসে না। তাহা ছাড়াও বেশিক্ষণব্যাপী

যুদ্ধ ও স্বল্পক্ষণব্যাপী যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের তফাত ঘটে ; দেহ ও মনের উপর বেশিক্ষণব্যাপী যুদ্ধে শ্রান্তি আসে বেশি। আবার, সময় দিন বা রাত্রি হিসাবেও গণনীয় ; ঋতু হিসাবে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির জন্য উহা জয়-পরাজয়ের কারণ হইতে পারে। আবহাওয়া রিপোর্ট তাই একটা বড় সামরিক সংবাদ, বিশেষত বিমান-যুদ্ধের দিনে।

নৌবলেরও এইজন্য সামুদ্রিক বিজ্ঞানের (Nautical Science) বিশেষ জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, আর বৈমানিকের জন্য দরকার আকাশের জ্ঞান (Aeronautics)।

(৪) যন্ত্র বা হাতিয়ার

যুদ্ধে আদিকাল হইতেই প্রায় বাহুবল অপেক্ষা অস্ত্রবলের আদর বেশি হইয়াছে। অবশ্য অস্ত্রও বাহুবলকেই বেশি বাড়াইয়া তুলিত। আজ যন্ত্রবল ও যন্ত্রাস্ত্র-বলের দিন—শুধু বৃহৎবাহিনীর দিন নাই, সেনাপতির প্রতিভাও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া বিফল হয়।

নূতন যন্ত্রাস্ত্র গড়িবার জন্য তাই মানুষের তাড়া অপরিমিত। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি কোনো অস্ত্রই একেবারে নূতন হয় না, আর নূতনও তাহা বেশি দিন থাকিতে পায় না। সেনাপতির দরকার নূতন আবিষ্কৃত অস্ত্র শত্রুর আয়ত্ত হইবার পূর্বেই উহার যতটুকু কার্যকারিতা তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া লওয়া। নূতন অস্ত্র আবিষ্কারক এই সুযোগটিই লাভ করেন—উহাও দুর্লভ সুযোগ।

এ যুগের যুদ্ধে সৈনিক আসলে অতিমাত্রায় যান্ত্রিক (technician) বা যন্ত্রনিপুণ হইতে বাধ্য। এই জন্য ফুলার, লিডেল হার্ট, ফরাসী সেনাপতি ত্ গ্যল প্রভৃতি কেহ-কেহ বলেন, লক্ষ লক্ষ সেনার মহাবাহিনী গঠন একটা বাজে জিনিস, শুধু জাতির শ্রমশক্তির অপচয়। দরকার—যন্ত্র-শিক্ষিত, যন্ত্র-সজ্জিত যন্ত্রাস্ত্র চালকের বাহিনী; আর বেশির ভাগ লোকের কাজ সেই সব যন্ত্র কলে কারখানায় উৎপাদন (*The Foundations of the* Science *of War*, Fuller; এবং Liddell Hart ও De Gaulle-এর লেখা)। ক্ষুদ্র বাহিনী না বৃহৎ বাহিনী, এই তর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে যন্ত্রযুদ্ধের বিষয়ে এখন প্রায় সকলেই এক মত। কারণ যুগটাই যন্ত্রযুগ, আর যুদ্ধ তো যুগেরই অনুরূপ হইবে।

(৫) নৈতিক গুণ

কোনো যুগেই তবু সাহস ছাড়া চলে না, শৌর্যবীর্য ছাড়া চলে না। যুদ্ধের আদিতেও ইহাই ছিল যোদ্ধার গুণ, আর আজও শেষ পর্যন্ত এই সব গুণই যোদ্ধার অবলম্বন। এই সামরিক গুণ কি কি, কিসের উপর উহা নির্ভর করে, তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে। জার্মান সমরশাস্ত্রীরা বলিবেন, উহা রক্তগত। ভারতশাসক ইংরেজেরাও বলিবেন,—হাঁ, উহা সামরিক জাতিগত। কেহ কেহ বলেন—শহরের শ্রমিকদের অপেক্ষা গ্রামের কৃষক শ্রেণীর

সৈনিকগুণ বেশি আছে। কিন্তু যন্ত্রযুদ্ধের বেলাও কি তাহা সত্যই খাটিবে? মোটের উপর বোধ হয়—সামরিক গুণ অনেকাংশে বৃত্তিগত ও অভ্যাসগত; তাহা শিক্ষায় দীক্ষায় বাড়ে কমে। সাহস নিতান্ত অভ্যাসগত হইতে পারে, সচেতন মানসিক শক্তিও হইতে পারে।

এই সব বিচার করিয়াই বলা হয় যোদ্ধার চাই চরিত্র-বল—শুধু বুদ্ধিবল নয়। তাই বলা হয়—"আদর্শ সেনাপতি কল্পনার জিনিস"—"A perfect commander exists only in the imagination"। আত্মপ্রত্যয়শীল সেনাপতির সঙ্গে থাকে তাহার staff officers। ইঁহাদের সমবেত বুদ্ধি, চরিত্রবল, মনীষাই সেনাপতির সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের মূল। আর এই সমবেত ভাবে কাজ করিবার যোগ্যতাও উঁহাদের একটি প্রধান গুণ। যুদ্ধ সেনাপতি করে না—করে সেনাপতি-মণ্ডল।

পাঁচ

যুদ্ধের বিবর্তন

যুদ্ধবিদ্যার বিকাশ হইয়াছে যুদ্ধের মধ্য দিয়া—উহার সার্থকতাও আবার যুদ্ধেই। উহার পিছনে আছে সামরিক ইতিহাস, সম্মুখে—সমরক্ষেত্র। যুদ্ধের বিবর্তনেই ইহারও বিকাশ ঘটে, যুদ্ধের বিবর্তনেই প্রত্যেক যুগের যুদ্ধের ধারাও স্থির হয়—অবশ্য যুদ্ধেরও বিবর্তন হইয়াছে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

যুদ্ধ প্রকৃতিগত

আসলে মানুষের সভ্যতাই একটা যুদ্ধ—সে যুদ্ধ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির। সেই সংগ্রামেরই ফল সভ্যতা; এ যুদ্ধে মানুষ যতই জয়ী হইতেছে ততই তাহার সভ্যতার রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতেছে। আর তাই সভ্যতার গোড়ার কথাই হইল হাতিয়ার (tool)—ধনুর্বেদই হইল মানুষের আদিম বেদ। তাহা লাভ করিয়াই মানুষ অন্য প্রাণীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়, প্রকৃতির উপরও জয়লাভ করে; আপনার শক্তি আবার বাড়াইয়া লইতে পারে। তাই অস্ত্র যেমন আবিষ্কার হইয়াছে তেমনি যুদ্ধবিদ্যা অগ্রসর হইয়াছে; তেমনি সভ্যতা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

সভ্যতারও একটা মাপকাঠিই হইল তাই সংগ্রাম-শক্তি। অবশ্য এই সংগ্রাম-শক্তির আসল উদ্দেশ্য বাহ্যপ্রকৃতিকে মানব-প্রকৃতির বশ করা—মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব সভ্যতা নয়—অ-সভ্যতা।

কিন্তু মানুষ সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। সেই সমাজের সুবিধার জন্যই সমাজেও এক সময়ে দেখা দেয় শ্রেণী-ভেদ; আর তাহারই জন্য দরকার হইয়া পড়ে সমাজ-শাসন। রাষ্ট্র হইল সেই শাসন-যন্ত্র। আবার, এক-এক সমাজের মানুষের সঙ্গে অন্য-অন্য নিকটের সমাজের মানুষেরও দ্বন্দ্ব প্রায় প্রথম হইতেই লাগিয়া থাকিত। সেই দ্বন্দ্বেরও মূল কারণ জীবিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই সমাজের সেই দ্বন্দ্ব চালাইত তাহাদের শাসন-যন্ত্র; রাষ্ট্রেরই কাজ হইল যুদ্ধ। এইরূপে শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধেই মানুষ একান্ত সংগ্রামে নিযুক্ত রহে নাই, আত্ম-দ্বন্দ্বে আত্ম-কলহেও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। তাহার সেই আত্মঘাতের পরিচ্ছেদও বেশ পুরাতন; সমাজে শ্রেণীভেদ শেষ হইলেই যুদ্ধেরও শেষ হইবে। 'যুদ্ধ' বলিতে আমরা তবু রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে দ্বন্দ্বকেই বুঝি—একই সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংঘাত (Class War) বা একই রাষ্ট্রের ভিতরকার গৃহযুদ্ধকেও (Civil War) সচরাচর বুঝাই না। কিন্তু মানুষের সভ্যতারই গোড়ার কথা—মানব-প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির শাশ্বত সংগ্রাম। তাই বলিয়া আজিকার যুদ্ধের মধ্য দিয়াও মানুষের সেই বিশ্বজয়ের কাহিনীরই অধ্যায় যে রচিত হইতেছে না, তাহাও নয়। সেই মহা-পরিণতির ইঙ্গিতও পাঠ করা যায় ইহারই মধ্যে।

যুদ্ধ প্রথমে বাধিত সমাজে-সমাজে, আর তাহার পরে বাধে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, আজ যুদ্ধ বাধিতেছে এক রাষ্ট্র-চক্রের (Axis Powers) সঙ্গে অন্য রাষ্ট্র-সংহতির (United Powers)—পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন একান্ত থাকিবার সম্ভাবনা কাহারও নাই। যুগে যুগে যুদ্ধ এইভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে—অস্ত্রশস্ত্র রণসজ্জা, যুদ্ধের পদ্ধতি (technique),—আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ হইতে প্রতিরোধ ব্যূহ-রচনা, সৈন্য-রচনা (formation)—সব বারে বারে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে আবার সমর-সমাবেশ (Strategy) ও রণ-কৌশলের (Tactics) নূতন পরীক্ষা হইয়াছে। এইভাবে যুদ্ধের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে যুদ্ধবিদ্যা (Art of War), আর তাহা লইয়া গবেষণা হইয়াছে; তাহাতে আবার গড়িয়া উঠিয়াছে সমর-বিজ্ঞান (Science of War)। তাহারও আবার পরীক্ষা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আরও নূতন নূতন নিদর্শন তখন মিলে, নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান আসিয়া জুটে। এই সব কারণে যুদ্ধচিন্তা (Doctrine of War) বা যুদ্ধতত্ত্ব (Theory of War) লইয়া আবার গবেষণা চলে, উহার ঢালা-সাজা আরম্ভ হয়। পূর্বাপর যুদ্ধের এই বিবর্তন দেখিয়াই রচিত হইয়াছে সমর-বিজ্ঞান—স্থির করা হইয়াছে যুদ্ধের গোড়ার নীতি, (Principles of War), যোদ্ধার লক্ষ্য, তাহার সমর-সমাবেশ (Strategy) ও রণকৌশলের (Tactics) মূল তত্ত্ব (principles), ইত্যাদি। এইভাবে যুদ্ধশাস্ত্র (Military Sciences) গড়িয়া উঠিয়াছে—শস্ত্রের (tools, weapons) পিছনে আসিয়াছে শাস্ত্র (Science),

আবার শাস্ত্র জোগাইয়াছে নূতন শস্ত্র—শস্ত্র ও শাস্ত্র দুইই চলিয়াছে বাড়িয়া।

তত্ত্ব (Theory) জিনিসটি গড়িয়া উঠিয়াছে তথ্যের (Facts) উপর—যুদ্ধের সেই পুরাতন প্রমাণ-পঞ্জী, যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাসই সমর-শাস্ত্রীদের যুদ্ধচিন্তার প্রধান পুঁজি—না হইলে তাহাদের (theory) মূল্য নাই। তাই যুদ্ধের এই বিবর্তন লক্ষ্য করাও হইল যুদ্ধ বুঝিবার একটি পথ। যুদ্ধশাস্ত্রও মূলত যুদ্ধের এই ইতিহাসেরই আলোচনা—প্রত্যেকটি খণ্ডযুদ্ধের ও পূর্ণযুদ্ধের কথামাত্র।

(১) গোষ্ঠী যুদ্ধের স্তর

অতি আদি কালে যুদ্ধ বাধিত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে (Tribal War)। তখনকার দিনে সবাই ছিল যোদ্ধা—আর যুদ্ধে যে গোষ্ঠী হারিত, তাহারা হয় নিহত হইত, না হইলে হইত বিজয়ীদের দাস। এই যুগের টোটেল যুদ্ধেরও উহাই আদর্শ—তবে সেই আদর্শ গোষ্ঠী-সংগ্রামের দিনেই মানুষ আবিষ্কার করিয়াছিল। (*The Nature of Modern Warfare*—Cecil Falls, p. 5) অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগেও তাহাদের খ্রীষ্টান বংশধরেরা উহা না পালন করিয়াছে তাহা নয়—আমেরিকার, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতি এই টোটেল যুদ্ধের ফলে আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। গোষ্ঠী-যুদ্ধের সৈন্য ছিল সবাই, প্রধান

কথা ছিল শৌর্য ও আক্রমণ, আর তার আয়ুধ ছিল ছুরি, বর্শা, কুঠার হইতে পরে তীর, ধনুক, রথ, অশ্ব, গজ, পর্যন্ত।[১]

১। এমনি এক গোষ্ঠীযুদ্ধই হয়তো ছিল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ও যদুবংশের ধ্বংস-কথা। কিন্তু তাহার কাহিনী পরবর্তী কালে যখন গড়িয়া উঠিয়াছে তখন গোষ্ঠীর স্তর ছাড়াইয়া রাষ্ট্র দেখা দিয়াছে; অস্ত্রসজ্জা, রণসজ্জা তখন পদাতিক, অশ্বারোহী হইতে রথে-গজে বহু অগ্রসর; সৈন্য-রচনা, ব্যূহ-রচনা তখন একটা সুনিপুণ ও সুপরিচিত বিদ্যা—মহাকাব্যের মধ্যে সেই কুরু-পাণ্ডবের গোষ্ঠী-যুদ্ধের ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় হারাইয়া গিয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে পরবর্তী স্তরের যুদ্ধবিদ্যার রূপ ও কল্পনা। এই কথাই প্রায় সত্য হইবে অন্যান্য মহাকাব্যের যুদ্ধের সম্বন্ধেও—যেমন ইলিয়ডের ও রামায়ণের। সেখানে যুদ্ধ রাষ্ট্রের যুদ্ধই মনে হয়। গোষ্ঠীযুদ্ধের রূপ তবু পাওয়া যায় জার্মানদের (নিবেলুঙ্গলুইড) গীতে, স্কাণ্ডিনেভীয় জাতিদের গাথায়। অবশ্য পৃথিবীর অন্যত্র,—চীনে, মিশরে, ব্যাবিলনে, গ্রীসে, ভারতে, রোমে—ইহার পূর্বেই সভ্যতা ও যুদ্ধের অন্য অনেক রূপ দেখা দিয়াছে। এইসব জাতির প্রাচীন কাব্যকথা সবই প্রায় বীরত্ব-গাথা, সবই প্রায় যুদ্ধ-কথা। কিন্তু তাহাতে কল্পনার খাদ এত বেশি মিশিয়াছে যে, তাহা হইতে সত্যকারের যুদ্ধবিদ্যা ও সমর-বিজ্ঞানের তথ্য উদ্ধার করা গবেষকের কাজ। কল্পনাংশ বাদ দিয়া লইলে উহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি—সেদিনে অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ ছিল, যুদ্ধের পদ্ধতি ছিল কি, আর রণকৌশলের (tactics) ও সমর-সমাবেশের (strategy) কতটা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশের কাব্য-কাহিনী হইতে মনে হয়—কোনো ক্ষেত্রেই ছলনার আশ্রয় লওয়া সে যুগের যুদ্ধে চলিত না। সম্মুখসমরই ছিল নিয়ম। তাহাতেও আবার প্রায়ই হইত দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কখনো বা দ্বৈরথ, যেমন ভীষ্মে-অর্জুনে, কখনো বা অন্য অস্ত্র লইয়া, যেমন ভীমে-দুর্যোধনে, ইত্যাদি। তাই, আকস্মিক আক্রমণের অনেক সুযোগই তখন বৃথা যাইত। যুদ্ধে তখন তাই সমর-সমাবেশেরও সামান্য অবকাশ ছিল, রণকৌশলেরও সুযোগ

(২) যোদ্ধৃশ্রেণীর জন্ম

গোষ্ঠী-যুদ্ধেরই শেষ দিকে বোধ হয় সমাজে বৃত্তিবিভেদ (division of labour) দরকার হয়, আর দেখা দেয় ক্ষত্রিয়-শ্রেণী বা যোদ্ধশ্রেণী; ক্ষাত্রবিদ্যা হইল ধনুর্বেদ; আর ক্ষত্রিয়দেরই

ছিল সামান্য; যুদ্ধটা ছিল শৌর্যবীর্যের পরীক্ষা, বলের পরীক্ষা,—ছলের, বলের, কৌশলের নহে। ঐরূপ ক্ষাত্রধর্মই (code of chivalry) পরে মধ্যযুগে ইউরোপে ও এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু জাপানের বুশিদোতা ও ভারতবর্ষের ক্ষাত্রধর্মে যেরূপ একটা আদর্শবাদিতা প্রসারলাভ করে, হয়তো আর কোথাও যোদ্ধাদের মধ্যে তাহা সেরূপ প্রশ্রয় পায় নাই। বলা বাহুল্য, ক্ষাত্রধর্মের নিয়ম-কানুনে যুদ্ধবিদ্যার বিকাশ বেশি হইতে পারে না,—সম্মুখে শিখণ্ডী থাকিলে আর তীরক্ষেপ করা চলে না; গো-ব্রাহ্মণ থাকিলে তো সর্বনাশ, আর সপ্তরথী মিলিয়া একজনকে মারিলে তো কথাই নাই, রাত্রিযোগে দ্রৌপদীতনয়দের হত্যা করিলে পাপ হয়, 'ইতি গজ' যোগ করিয়াও শত্রু নিধন অন্যায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রণকৌশলের বিকাশ হইবে কি? কিন্তু তথাপি কেহ যদি মনে করেন, সে যুগের যুদ্ধে সবই ছিল অস্ত্রকৌশল আর শৌর্যবীর্য, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রের সমাবেশে আসিয়াছিল বড় জোর চক্রব্যূহের মত ব্যূহ-রচনা, তাহা হইলে তাহাকে শুধু মহাকাব্যের কথা ছাড়িয়া পড়িতে হইবে বেদ ও জাতকের গল্প (যেমন রাজা বিড়ূডবের শাক্য-গোষ্ঠীর সংহার কথা—মনে হয়, উহা গোষ্ঠী যুগের টোটেম যুদ্ধেরই এক দৃষ্টান্ত), আর সর্বাপেক্ষা বেশি একবার দেখিতে হইবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। সেখানে যুদ্ধের উপায়, ব্যূহ-রচনা, সৈন্যরচনা, প্রভৃতির যে তথ্য মিলে তাহা মোটেই ক্ষত্রধর্মানুমোদিত নয়; মনে রাখিতে হইবে—বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রদ্যোত প্রভৃতি সম্রাটদের কথা (তখন রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা), তাহাদের ছলনা, বিদ্বেষ

শীর্ষে স্থান পাইলেন রাজা। অন্তত আর্যভাষী জাতিগুলির অশ্ব ছিল (আরবদেরও অশ্ব ছিল, তুর্কমঙ্গোলদের তো কথাই নাই), রোমান ও ভারতীয়দের বিশেষ করিয়া রথ ছিল ; আর ভারতবর্ষে

যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি, ভারতীয় ক্ষাত্রধর্ম যাহাই বলুক—অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য ভয়ানক রকমের বাস্তব জিনিস—সেখানে যুদ্ধ সর্বকালের যুদ্ধের মতই ছল বল-কৌশলের ব্যাপার। আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ভারতীয় যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধ-শাস্ত্র নূতন পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া যায় ; গ্রীক্ সেনাদের হাতে গজারূঢ় ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের লাঞ্ছনা নিশ্চয়ই মৌর্য সম্রাটগণ বা যবন রাজগণ বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের কাহারও একটি যুদ্ধেরও বিবরণ আমরা পাই নাই, পাই তাঁহাদের দিগ্বিজয়ের বার্তা, তাঁহাদের প্রশস্তি। এই কারণেই শক, হূনদের হাতে ভারতীয়দের পরাজয়ের সামরিক কারণও লেখা নাই। হয়তো সে কারণ গথ্ ও মঙ্গোলের হাতে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের জাতিপুঞ্জের পরাজয়ের যে কারণ অনেকাংশেই তাহা—অর্থাৎ বর্বরের হাতে গৃহপালিত সভ্যতার শান্তিভোগ আর দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের হাতে ধীরগতি রথী ও গজারোহী বা পদাতিকদের পরাভব। পরে এই কারণেই হয়তো তুর্ক-তাজিকের হাতে পাঞ্জাবের ও উত্তর-ভারতের রাজরা নির্জিত হয়, উন্নততর যোদ্ধার পায়ে সমস্ত ভারতভূমি লুটাইয়া পড়ে। মুসলমান আমল হইতে বোধ হয় আমরা ভারতবর্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধের বিবরণ মাঝে মাঝে পাই, ফলে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি—কিরূপে সেনাসন্নিবেশ (concentration) হইত, ছাউনি পড়িত, দুর্গ-অবরোধ ও দখল হইত ; সৈন্য-সংগ্রহের পথ ছিল কি। এই যুগেই দেখি—পাইক লস্কর সেপাই সান্ত্রী লইয়া জায়গীরদারদের যুদ্ধযাত্রা, কুচকাওয়াজ ; দেখি—বেতনভোগী স্থায়ী সিপাই (Standing Army), হাবসী ক্রীতদাস। আর শেষে বন্দুক কামান পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে সবই দেখিতে পাই। এই যুগের ভারতীয় যুদ্ধ সমসাময়িক ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যার অপেক্ষা বিভিন্ন নয়। অবশ্য ইউরোপে

(এবং কার্থেজীয়দের) যুদ্ধে গজও ছিল এক মহাবল।[২] আর যোদ্ধশ্রেণীই যেমন ক্ষত্রিয় হইল, ইউরোপে তেমন গ্রীস-রোমের পতনের পরে মধ্যযুগের শেষে তাহারা হইয়া দাঁড়াইল—নাইট। কিন্তু সেই ফিউডাল যুগের যুদ্ধস্তরে পৌঁছিবার পূর্বে ইউরোপ যুদ্ধবিদ্যার এমন বিকাশ দেখিয়াছে, যাহা এখনো তাহারা বিস্মৃত হয় নাই, এখনো তাহাদের যুদ্ধশাস্ত্রের আলোচনার বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

(৩) পৌর-সভ্যতার যুদ্ধ—গ্রীস ও রোম

মোহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার পৌর-সভ্যতার যুদ্ধ বিবরণ জানিবার উপায় নাই, শাক্য ও লিচ্ছবিদের কথা প্রায় অজ্ঞাত, গ্রীস ও রোমের পৌর-সভ্যতা কিন্তু এদিকে একটা ক্রম-বিকাশের সুস্পষ্ট ধারা রাখিয়া গিয়াছে।

যেমন গোষ্ঠী-যুদ্ধের দিনে তেমনি একদিন পৌর-গোষ্ঠীর কালেও সবাই ছিল যোদ্ধা, তাহাই পৌর-বাহিনীর (Citizen Army) প্রাথমিক রূপ। তারপর গ্রীসে ও রোম সাম্রাজ্যে

মধ্যযুগ শেষ হয় তিন চার শত বৎসর পূর্বে—ভারতে তাহা এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই।

২। ভারতবর্ষের সেই রাজার খেলা 'শতরঞ্জ' (ফার্সি 'শৎরঞ্জ', ভারতীয় 'চতুরঙ্গ' কথাটির পরিণতি) ভারতবর্ষের প্রধান চারটি যুদ্ধ বলের এখনো সন্ধান দেয়—পদাতিক, অশ্ব, গজ, নৌকা, আর সর্বোপরি রাষ্ট্রশক্তি রাজা-মন্ত্রী।

দেখা দেখা দিল ক্রীতদাসদের দ্বারা যুদ্ধ। মধ্যযুগেও ইহাই টিকিয়াছিল; retainers বা তাঁবেদার লইয়া দাঁড়াইতেন তখন সামন্তগণ। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্যের শেষদিকে বেতন-করা সৈন্য-বাহিনী দেখা দিয়াছিল—ভারতবর্ষেও তাহা দেখা দেয় অন্তত মুসলমান আমলে। ইউরোপে পরে আবার মাহিনা-করা বৃত্তিভোগী স্থায়ী সৈন্য প্রথম দেখা দেয় ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। গ্রীসের কয়েকটি যুদ্ধ স্মরণীয়—জারেস্‌কেসের পার্শীদের পরাজয় ঘটানো হয় একটি কৌশলে—সমুদ্রপথে (৪৮১ খৃঃ পূঃ আব্দে) তাহাদের পশ্চাদা-ক্রমণ করিয়া (strategy of indirect approach ও attack in rear)। লিওনিদাস অল্প সৈন্য লইয়া থার্মপলিতে শত্রুকে বিলম্ব করাইবার জন্য বাধা দেন (delaying action); সে যুগের স্পার্টার মিলিটারিজ্‌ম্ ও এ্যাথিনীয় গণতন্ত্রের লড়াই যেন এ যুগের Hitlerism ও Democracy'র রাজনৈতিক লড়াইয়ের আদিম রূপ; এ্যাথান্সের সৌভাগ্যে তাহার নৌ-আধিপত্যের স্থান যেন প্রথম জানাইল সমুদ্রশক্তি বা seapower স্থলশক্তি বা landpower-এর তুলনায় প্রবলতর হইবার সম্ভাবনা। অন্য দিকে ম্যাকিডোনীয় পদ্ধতির ফ্যালাংসে বা সঘন সৈন্য-রচনায়, যাহার আক্রমণের ঝড়ে বিপক্ষ বিপর্যস্ত হয়, এক ধরণের সংঘর্ষ কৌশল (shock tactics) দেখা যায়; আলেকজেণ্ডারের সচতুর বর্শাধারীদের হাতে পুরুর গজারোহী সেনার পরাজয় বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের নিকটে দেহবলের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু দেখিতে পাই অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ উন্নতি গ্রীসে দেখা দেয় নাই।

যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধশাস্ত্রে রোমের যুদ্ধগুলির উল্লেখই বারে বারে পাই—বিশেষ করিয়া কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবেলের যুদ্ধ, তাহার সঙ্গে রোমের ফেবিয়াস ও সিপিওর যুদ্ধ, আর সিজারের যুদ্ধ, নিরোর মেটাউরুসের যুদ্ধ। ইহার মধ্যে কয়েকটি তথ্য দেখা যায়, পরবর্তী যুদ্ধবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব উহাকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে। ইহারই দুই একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) সৈন্য রচনার দিক হইতে গ্রীক্ ফ্যালাংসের বা ঘন রচিত বাহিনীর রোমের হালকা লঘুগামী পদাতিকের (maniple) হাতে পরাজয় তাহার একটি। (২) আবার অস্ত্রসজ্জার দিক হইতে রোমের তলোয়ারধারী পদাতিকের (legionaries) পার্থিয়ার অশ্বারোহী তীরন্দাজদের হাতে লাঞ্ছনাও তেমনি উল্লেখযোগ্য। (৩) সৈন্য সংগ্রহের দিক হইতে দেখি, পরবর্তী রোম-সাম্রাজ্যে পৌর সভ্যতার শেষ পাদে ক্রীতদাস সৈন্যদের ও বেতনভোগী "রক্ষী-দলের" প্রচলন হয়। (৪) কিন্তু রোমের নাম ইউরোপের যুদ্ধশাস্ত্রে বারে বারে উল্লেখিত হয় সমর-সমাবেশের (strategy) ও রণকৌশলের (tactics) দিক হইতে। তাহার মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য : (ক) হ্যানিবলের ক্যানির (Cannae) কৌশল—উহাতে দুই দিক হইতে রোমবাহিনীকে তিনি পরিবেষ্টন (envelopement) করিয়া ধরিলেন। (খ) অন্যান্য দৃষ্টান্ত রোমান সেনাপতি ফ্যাবিয়াসের যুদ্ধ এড়ানো (strategy of evasion)—বিশ বছরেও হ্যানিবল রোমের বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাই নিঃশেষ করিতে পারিলেন না। (গ) রোমের সেনাপতি সিপিওর

সমর-সমাবেশ-প্রথমত হ্যানিবলের বলকেন্দ্র (base) স্পেন হইতে তিনি হ্যানিবলকে বিচ্যুত করেন, পরে মূল কার্থেজে আঘাত করেন। কার্থেজের উন্নত জীবনযাত্রা, প্রয়োজনীয় সম্পদ-(resource)-কেন্দ্র হারাইবার ভয়ে তখন বিহ্বল হইয়া পড়িল, হ্যানিবলকে ইতালি হইতে ফিরাইয়া আনিল। সর্বশেষে সিপিও হ্যানিবলকেও সংগ্রামক্ষেত্রে পরাজিত করিলেন—নিজের মনোমত যুদ্ধক্ষেত্রে হ্যানিবলকে তিনি টানিয়া আনেন, হ্যানিবলের সমস্ত পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করেন, তারপর সংগ্রামে তাঁহাকে সমূলে ধ্বংস করেন—এই সবই চমৎকার সমর-সমাবেশের (strategy) এবং 'পরোক্ষ সমাবেশের'—(Strategy of Indirect Approach-এর) শ্রেষ্ঠ প্রমাণ (দ্রষ্টব্য—Liddell Hart রচিত Scipio)। বোধ হয় কার্থজের ধ্বংসও এ যুগের টোটেল ওয়ারেরই আদর্শানুরূপ মনঃপুত হইত। (ঘ) নিরোর মেটাউরুসের যুদ্ধ-কৌশল প্রসিদ্ধ অন্য কারণে। দুই শত্রুবাহিনীর মধ্যবর্তীক্ষেত্র হইতে (Interior Lines) নিরো প্রথমে একের উপর নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন, পরে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় বাহিনীকে আবার ঐরূপে শেষ করেন। পরবর্তী কালে মধ্যবর্তীক্ষেত্রের এই যুদ্ধ-কৌশল নেপোলিয়ন প্রভৃতি সেনাপতিরাও বহুভাবে প্রয়োগ করেন।

যুদ্ধবিদ্যার যে বিকাশ রোমে ঘটে রোম-ধ্বংসকারীদের হাতে তাহার কিছুই কাজে লাগে নাই। বরং ইস্তানবুলের রোম সাম্রাজ্য খানিকটা তাহা কাজে লাগাইয়াছে। পরে তুর্করা তাহার

উন্নতি করিয়াছে, কিন্তু ক্রম্‌ওয়েলের আবির্ভাবের পূর্বে ইউরোপে তাহার আর বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সামন্তযুগে যুদ্ধবিদ্যার বিকাশ হইয়াছে সামান্য।

(৪) সামন্ত যুগের যুদ্ধ

রোম-ধ্বংসের পরে যুদ্ধের ইতিহাসে পাই সামন্তের স্তর। মধ্য যুগের অন্ধকার হইতে মাথা তুলিয়া উঠেন যোদ্ধশ্রেণী। তাঁহারা সকলেই প্রায় ছিলেন অশ্বারোহী, তাঁহারাই পরে হন নাইট—পদাতিকেরা ছিল তাহাদের তাঁবেদার। ৭৩২ খৃঃ এই অশ্বারোহীরা শার্ল মার্তেলের নেতৃত্বে তুর-এর (Tours) যুদ্ধে আরবদের হারাইলেন, তাহাতে পদাতিকের মর্যাদা আরও লুপ্ত হয়। ধীরে ধীরে সামন্তযুগ চাপিয়া বসিল। ছোট বড় সামন্ত সকল চলেন অশ্বপৃষ্ঠে—তাঁহারই ভূমিজ অন্ত্যজেরা তাঁহার অনুচর, তাঁবেদার। ৯০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ পর্যন্ত ইহাঁদের এই সামন্ত যুদ্ধ-পদ্ধতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। তুর্ক ও মঙ্গোলের আক্রমণ ইহারা ঠেকান, ক্রুসেডে বারে বারে যান—আর বার বার তুর্ক-পদাতিকদের রণকৌশলের নিকট অশ্বারোহী নাইটরা হতমান হন। দীর্ঘ তরবারি আর বল্লম ছিল ইহাঁদের অস্ত্র, গায়ে থাকিত লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ। নিজেদের ছোট-বড় দুর্গে (castle) ছিল তাঁহাদের বাস; তীর-ধনু ছিল ইহাদের ছুঁড়িবার মত অস্ত্র (ক্রেসি'র যুদ্ধে বড় ধনুর তীরে ইংরেজেরা ছোট ধনুকধারী ফ্রান্সের যোদ্ধাদের

হারাইয়া ছোট ধনুকের দিন শেষ করে)। ইহাঁদের মধ্যে একটা ক্ষাত্রধর্মের বিকাশ হয়। যুদ্ধে ইহাঁরা শৌর্যের পরীক্ষা দিতেন—সার বাঁধিয়া ছুটিতেন, আর যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন।

বারুদ আবিষ্কার হয় চীনে। কিন্তু তাহারই প্রচলনে নাকি সামন্ত যুগের অবসান ঘটে, এই অশ্বারোহী নাইটদের বীরত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। আসলে তখন নূতন নূতন আবিষ্কার শুরু হইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িতেছে, বণিকশ্রেণীর আবির্ভাব হইতেছে; শহরে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতুল, কাজ-কারবার চলে টাকা-কড়িতে—ইহাঁরা ইচ্ছা করিলেই ভাড়াটে রক্ষী পান। যুগান্তরের সঙ্গে যুদ্ধের রূপান্তরও ক্রমে ঘটিয়া গেল। "The changing times—spiritually, economically, politically—were accompanied by changes in the art of war, which is already determined by the time" (*The Art of Modern Warfare*, p. 57, Hermann Foertsch)।

(৫) আধুনিক কাল—পদাতিকের দিন

সামন্ত যুগের শেষে আবার পদাতিকের (Landsknechte) দিন ফিরিয়া আসিল। (১) প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র হিসাবে তখনি বল-বিভাগ শুরু হইল। পদাতিকের অস্ত্র ছিল বর্শা, ছোট ধনু প্রভৃতি। পরের দিকে আগুনে-ধরানো বন্দুক হয় ইহাদের প্রধান

অস্ত্র, সরঞ্জামের গাড়ীর আড়ালে দাঁড়াইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত। অশ্বারোহীদেরও বর্শা, ছোট তরবারি, তীর ধনু প্রভৃতি ছিল অস্ত্র। এবার গোলন্দাজ দেখা দিল—যখন কামানের দিন আসিল। মোট-যোদ্ধা এক-এক যুদ্ধে হাজারে হাজারে পর্যন্ত তখন প্রযুক্ত হইত। (২) দুর্গাবরোধে সম্বল হইত তখন কামান ও অগ্নিক্ষেপক (flame thrower) (৩) যুদ্ধরচনা (battle formations) হইত অনেকটা চতুষ্কোণ—সম্মুখে থাকিত বর্শা প্রভৃতি দীর্ঘাস্ত্র-ধারীরা। (৪) আক্রমণ, প্রত্যাক্রমণ (counter-attack), পশ্চাদপসরণ (retreat), পরিবেষ্টন (envelopement) ও ধাপ্পা বা ছল (feints), গোলা চালানো (fire preparations) গোলা দ্বারা আত্মরক্ষা (protective power)—এই সবের সূচনা এই আধুনিক কালের এই প্রথম পাদেই হয়।

এদিকে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে শীঘ্রই যুদ্ধশাস্ত্রেরও আবির্ভাব হইল—যুদ্ধের তথ্য ও তত্ত্ব, দুইই আলোচ্য হইয়া উঠিল। আসলে আধুনিক কালের গোড়ায় আছে সভ্যতার নূতন যন্ত্রলাভ, যন্ত্রশক্তির নূতন বিকাশ। তাই যুদ্ধেও ক্রমশই নূতন নূতন যন্ত্র প্রয়োগ আরম্ভ হইল—ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধ-শাস্ত্রও ক্রমশই পদে পদে বিকাশ-লাভ করিয়া চলিল।

(৬) ভাড়াটে পদাতিকের যুদ্ধ

এই আধুনিক যুগ ইউরোপেই প্রথম দেখা দেয়। আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যার নানা স্তরগুলিও ইউরোপীয় যুদ্ধ ও যোদ্ধাদের বিবর্তনেই তাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। টাকা-কড়ির লেন-দেন শুরু হইতেই সেখানে ভাড়াটে সৈনিকের দিন আসিল। ইহারা ভাগ্যান্বষণে ফিরিত, দেশ বা ধর্মের জন্য লড়িত না, লড়িত বেতনদাতা প্রভুর জন্য। সমস্ত প্রাচ্যদেশেও—বিশেষ ভারতবর্ষে—এমনি হাব্‌সি, পাঠান, খোরাসানী, ইরাণী তুরাণীর ভিড় সেনাদলে তখন লাগিয়াই থাকিত। ভাড়াটে সৈনিকের কাজ ছিল, যে বেতন দিবে তাহার হইয়া লড়াই করা—আর নিজ স্বার্থ ছিল লুঠতরাজ। ইউরোপে ইহাদের মধ্যে একটা নূতন বোধ ও সংগঠন আনেন মরিস, প্রিন্স অব্ অরেঞ্জ। গ্রীস-রোমের জ্ঞান পুনরুদ্ধারের ইহাও নাকি একটা ফল। তখন এই ভাড়াটের দলেও নূতন বিভাগ ও শৃঙ্খলা দেখা দিল, পদাতিকরা কোম্পানিতে-কোম্পানিতে (Company) ভাগ হইল, অশ্বা-রোহীদের ভাগ হইল স্কোয়াড্রনে-স্কোয়াড্রনে (Squadron)। কম্যাণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইল, তাহার নীচে ড্রিল করাইবার জন্য রহিল সার্জেণ্ট। আর ড্রিলও দেখা দিল। এই সবের ফলে সৈন্যদের সচলতা (mobility) বাড়িল, সৈন্য-চালিবার (manœuvre) সুযোগ বাড়িল, সৈন্যদলের সার (line) দীর্ঘতর হইল। এইরূপ সার বাঁধিলে দুই পার্শ্বেই (flanks) আক্রমণাশঙ্কা বাড়ে। তাই ক্রমে

সারের পিছনে আবার সার-বাঁধা চলিল যাহাতে ইহারা পার্শ্বরক্ষায় (flanks) ও পশ্চাৎ রক্ষায় (rear) নিযুক্ত হইতে পারে। তাই বলা চলে, বর্তমানের মজুত সেনাদলের বা রিজার্ভদলের (reserve) প্রাথমিক সূচনা হইল এইভাবে। আর একটি বড় কথা—সেনাপতি আসিলেন সেনা-দলের অগ্রভাগ হইতে এখন পিছনের সারে। সৈন্য-চালনার পক্ষেও ইহাই প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুইডেনের দিগ্বিজয়ী বীর গুষ্টেবুস্ এডোলফুস্ (Gustvus Adolphus) এই সৈন্য-সংগঠন পদ্ধতিকে সার্থক করিয়া তোলেন। তিনি সৈনিক কর্তব্য জাতির প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিলেন। জাতীয় বাহিনীর (National Army) দিন তাহাতে দেখা দিল আর ভাড়াটে সৈনিকের দিন ফুরাইল। কামানের উপর তিনি জোর দিলেন বেশি। উহার আগুনের ধ্বংস-কাণ্ডে ও বিষম শব্দে শত্রুরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। তাই বর্ষণাস্ত্রের (fire weapon) দিন দেখা দিল। সৈনিকের বিশেষ পরিচ্ছদও তিনিই নির্দিষ্ট করেন। গুষ্টেবুস্ এডেল্‌ফুস তাঁহার বাহিনীতে নূতন স্থান দিলেন পথ-কাটার, পরিখা-খোড়ার, পুল-তৈরি করার কারিগর-মজুরদের। ইহাঁরাই এ যুগের এঞ্জিনিয়ার কোরের প্রথম বীজ। এইরূপে যুদ্ধ ক্রমশই বিবিধ অস্ত্রধারীর সমবেত ব্যাপার হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার কারণ এই যে, যে যন্ত্রশক্তি নূতন আসিয়াছিল তাহা সতেজে বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাই, ক্রমশই বন্দুক ছুঁড়িবার উপায় সহজ হইল, সওয়ারের পিস্তলের উন্নতি হইল, কার্টিজের মত জিনিস

আবিষ্কৃত হইল, গোলন্দাজদের 'সচলতা' বাড়িল, পদাতিকদেরও কামান জুটিল, সওয়ার 'ড্রাগুন' দেখা দিল। এইরূপে ১৫০০ খৃঃ-১৭০০ খৃঃ-এর মধ্যে ইউরোপে অস্ত্রে-শস্ত্রে ও বাহিনী বিভাগে যে এত উন্নতি সংঘটিত হইল তাহার আরেক কারণ যুদ্ধে যুদ্ধে ইউরোপের ইতিহাস এই সময়ে কণ্টকিত। ইহারই মধ্যে ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের যুগ ও তাহার চমৎকার সমর-সমাবেশ ও রণ-কৌশলের দৃষ্টান্ত মিলে। এই সময়ের শেষ দিকে যুদ্ধ বহু সৈন্যের বহু অস্ত্রের ব্যাপার হইয়া উঠে, ক্রমশই তাহাতে ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের দিক কমিয়া আসে, রাজনৈতিক স্বার্থের দিকই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিতে লাগিল!

মনে রাখিতে পারি,—১৭০০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে আওরেংজীব মারা যাইতেছেন। বীরত্বে, সামরিক সমাবেশে, রণকৌশলে, সৈন্যবাহিনীর বিপুলতায় তখনো ভারতীয় যোদ্ধারা বোধ হয় ইউরোপীয়দের সমকক্ষই হইতেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে ও রণসজ্জায়,—বিশেষ করিয়া কামান-বন্দুকের ব্যবহারে—ইউরোপের নবলব্ধ যন্ত্রাধিকার তখনি ইউরোপকে সমরশক্তিতে অগ্রবর্তী করিয়া দিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষেও তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। পরেকার এক শত বৎসরে ইউরোপীয় যন্ত্রযুগেরই এই জয়বার্তাই ইউরোপের বণিক ও সৈনিকের সাহায্যে ভারতবর্ষেরও এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সুচিহ্নিত হইয়া গেল।

(৭) রাজার যুদ্ধ

ইউরোপের 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে' সেখানকার লোকের চক্ষে সৈন্যেরা হইয়া উঠে বিভীষিকা—সৈন্য দেখিলেই তাহারাও তখন মনে করিত 'বর্গী এল দেশে।' এই অবস্থাটা কাটিল যখন সৈন্য আর বর্গী রহিল না—হইল রাজভৃত্য, বেতনভুক্ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই দিকে রাজাদেরই চোখ পড়িল, কারণ সুশিক্ষিত সৈন্য-বাহিনীর মত অস্ত্র আর নাই। রাজাই তখন রাষ্ট্র। L'etat? C'est moi;—ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইর এই কথা প্রায় সেই যুগের মর্মকথা। সেই যুগটা রাজাদের রাজ্য-পিপাসার যুগ। তাহার প্রধান প্রতিনিধি প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট। তাঁহারই রচিত প্রুশীয় বাহিনী হয় ইউরোপের আদর্শ। তাঁহার সৈন্য সংগৃহীত হইত সব দেশ হইতে। ফ্রেডারিকের 'পট্‌স্‌ডাম্ গার্ডদের' ড্রিল হইল দেখিবার মত। নূতন অস্ত্রশস্ত্র বেশি তখনো উদ্ভাবিত হয় নাই; তবে বন্দুকের ও কামানের গোলাগুলির জোর বাড়িল। যুদ্ধ-কলার দিক হইতে দেখি—গোলাবৃষ্টিতে তখন যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগ প্রথম পরিষ্কার করা হইত। ইহাতে সৈন্যদের আক্রমণের পথ সুগম হইল ও তাহাদের সচলতা বাড়িল। ইহারই ফলে পুরু (deep) সার ভাঙিয়া দিয়া দরকার হইল লম্বালম্বি সার বাধার কৌশল (line tactics)। গুলি না বেয়নেট, এই প্রশ্নে ফ্রেডারিক শেষ পর্যন্ত গুলির পক্ষপাতী হইলেন। কিন্তু আক্রমণ-পদ্ধতিতেই আরও নূতনত্ব দেখা

দিল গ্রীক ও রোমানদের পুরানো 'ইন্ এশেলন' (in echelon) আক্রমণ-নীতির পুনঃপ্রয়োগে। শত্রুবাহিনীর এক পার্শ্বকে চূর্ণ করাই হয় প্রধান চেষ্টা (main effort)। সার বাঁধিয়া (line tactics) দুই দল মুখামুখি দাঁড়াইত,—কিন্তু শত্রুর যেখানটা চূর্ণ করিতে হইবে সেখানে নিজের সৈন্য মজুত থাকিত বেশি—অবশ্য সারের পিছনে সারে। তাই তাহা শত্রুর চক্ষুর আড়ালে গোপন থাকিত, পরে আকস্মিক আক্রমণে শত্রুকে বিভ্রান্ত করিত। সারের অন্য অংশ যে তত ভারী নয় তাহাও শত্রু বুঝিতে পারিত না। আজ পর্যন্তও 'পার্শ্ব-আক্রমণে' ইহারই নানা রকমফের রীতি অনুসৃত হয়। ফ্রেডারিকের লক্ষ্য ছিল এই ভাবে শত্রুকে "ধ্বংস" করা, শত্রুর দেশে যুদ্ধ করা, আর দ্রুত আক্রমণে যুদ্ধ শেষ করা। জার্মান সমরশাস্ত্রীদের চক্ষে ফ্রেডারিকই দুনিয়ার রণনীতিবিশারদ। তাঁহার বাধা ছিল এই যে, প্রুশিয়া তখনো ছোট রাষ্ট্র, আর সেই যুগের সভ্যতা তখনো অনুন্নত (*The Art of Modern Warfare*—Foertsch,) p. 69)।

(৮) রাষ্ট্রের যুদ্ধ

পৃথিবীতে যোদ্ধাদের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়নের নামই সুপরিচিত ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের যুগের যুদ্ধকে আর শুধু-রাজার যুদ্ধ বলিবার উপায় নাই। ততদিনে ইউরোপের সব দেশেই মানুষের সমাজ "নেশান"-রূপে গড়িয়া উঠিতেছে—

রাষ্ট্রকে আশ্রয় করিয়া এক-একটা 'জাতি' সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক কালেই এই 'জাতীয়তার' জন্ম; আর ফরাসী-বিপ্লব ও নেপোলিয়ন স্বয়ং পুরানো সামন্ত সমাজের ও সামন্ত ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়া ইউরোপে এই 'জাতীয়তার' জন্মপথ আরও সুপ্রশস্ত করিয়া দেন। এই সময় হইতেই যুদ্ধও তাই হইয়া উঠে নেশানে-নেশানে যুদ্ধ। এই 'নেশানের' আশ্রয়-কেন্দ্র রাষ্ট্র। তাই এই যুগের যুদ্ধকে 'রাষ্ট্রে'র যুদ্ধই বলা চলে—জাতির যুদ্ধ বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত ইহাই ছিল যুদ্ধের রূপ। নেপোলিয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বা যুদ্ধ-পদ্ধতির খুব বড় পরিবর্তন ঘটে তাহা নয়। বড় পরিবর্তন ঘটিল সামাজিক চিন্তায় ও আদর্শে—ফরাসী বিপ্লবের তাহাই দান। তখন নূতন করিয়া পৌর-বাহিনী (citizen guards) দেখা দিল, আর যুদ্ধবিদ্যা হইল সর্বজনীন—সকলকেই সৈন্যদলে যোগ দিতে হইবে। এইটা জাতীয় যুদ্ধের বড় কথা। ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবী প্রয়োজনেই এই পথ গৃহীত হয়। কিন্তু ইহা সার্থক করিয়া তোলে নেপোলিয়নের শত্রু প্রুশিয়া—Prussian National Armyই প্রথম জাতীয় বাহিনী। আর তাহার পর ব্রিটেন ছাড়া উনবিংশ শতাব্দ হইতে অন্যান্য প্রায় সব দেশই এই বাধ্যতামূলক যুদ্ধ-শিক্ষা ও সৈনিকবৃত্তি নিজের স্বার্থে গ্রহণ করে।

যুদ্ধবিদ্যায় নেপোলিয়ন নূতন অধ্যায় যোজনা করেন—তাহা বলাই বাহুল্য। সৈন্য-বিন্যাসের দিক হইতে নেপোলিয়নের দান—

ডিভিশন (division) গঠন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতিপূর্বে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজেরা এক যোগেই যুদ্ধ করিত, নেপোলিয়নই তাহাদের এক-এক 'ডিভিশনে' সংযুক্ত করিয়া এই ভাবে ডিভিশন গঠন করেন। (সৈন্যদের ক্রমবিভাগ এইরূপ :—পদাতিক-পল্টন, কোম্পানি ব্যাটিলিয়ন ব্রিগেড; অশ্বারোহী-স্কোয়াড্রন, রেজিমেণ্ট, বিগ্রেড; গোলন্দাজ—৪ বা তদূর্ধ্ব কামানের ব্যাটারি—ও বিগ্রেড) নেপোলিয়নের সময় হইতে স্কাউট বা টহলদার ও স্কারমিসার বা হামেলদার সৈন্যদের রীতিমত প্রচলন হয়। সৈন্য চালনায় সার বাঁধা (line) নিয়মের পরিবর্তে নেপোলিয়ন আনেন পিছু পিছু দাঁড়াইয়া কলাম (column) বাঁধার নিয়ম। নেপোলিয়ন নিজে ছিলেন গোলন্দাজ—তাই কামানের উপর তাঁহার ভরসা ছিল যথেষ্ট। ভালমির যুদ্ধে (২০ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২) এই গোলাবৃষ্টি দেখিয়াই গ্যয়টে বলেন—ইতিহাসে মোড় ঘুরিতেছে। যুদ্ধবিদ্যায় নেপোলিয়নের প্রধান কৌশল ছিল—শত্রুর মূল-স্থলে (decisive spot) আঘাত করিবার জন্য বহুল বল (masses) সেখানে কেন্দ্রিত করা; গোলাবৃষ্টিতে সেখানে অসুবিধা উৎপাদন করিয়া তাঁহার সংঘর্ষ (shock infantry)-পদাতিকদের সেখানে চালনা করা। এই কৌশলে তাই প্রথম দরকার হইত শত্রুর দুর্বল স্থান খুঁজিয়া বাহির করা—টহলদার ও হামেলাদারদের (scouts and skirmishers) ইহাই ছিল কাজ; তারপর গোলাবৃষ্টি আর বহুল বলের (mess) প্রয়োগ। শত্রুবাহিনীকে তিনি তাই "ভেদ" করিয়াই (break-through) যুদ্ধ জিতিতেন।

আবার পার্শ্বে (flank) আক্রমণেও ছত্রভঙ্গ করিতেন। পার্শ্বে আক্রমণের একটি কৌশল ছিল এইরূপ :—নিজের একটি সৈন্যাংশ মজুত (reserve) রাখা; তারপর সামনে যুদ্ধ বাধানো। যখন সামনে যুদ্ধ চলিতেছে, তখন দূরস্থিত একটি ভাগকে শত্রুর পার্শ্বদেশে চালনা করা; বাধ্য হইয়াই শত্রু তখন তাহার মজুত সৈন্যদের সেই পার্শ্বরক্ষায় পাঠাইবে। তখন আবার নেপোলিয়ন নিজের মজুত সৈন্যদের দ্বারা সবলে আক্রমণ চালাইয়া শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করিতেন। শত্রুবাহিনীকে নেপোলিয়ন পরিবেষ্টনের (envelopment) চেষ্টাও করিতেন—কিন্তু এক দিক হইতে, দুই দিক হইতে নহে (pincers নহে)। কারণ তাহাতে সৈন্যদের দুই ভাগে ভাগ করিতে হয়। নেপোলিয়ন তাহাতে রাজী হইতেন না। বলাধিক্য ও সচলতা যাহাতে অক্ষয় থাকে তাহার জন্য নেপোলিয়নের চেষ্টা ছিল সর্বদাই। তিনি সৈন্যদলকে যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই একত্র রাখিতেন, দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেন না। আর সৈন্যদের গতি এত দ্রুত করিয়া তোলেন যে, শত্রুরা তাহা ভাবিতেই পারিত না, অতর্কিত (surprise) আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। এই জন্যই নেপোলিয়নের কথায় বলা হয় যুদ্ধের অর্থ "mass multiplied by movement" অর্থাৎ বলাধিক্যের সঙ্গে সচলতার যোগ সাধন। ইহাই নাকি নেপোলিয়নের বড় মন্ত্র, সমর-সমাবেশের বা সেনাপত্যের (strategy) মূল।

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান ও পতনে যুদ্ধবিদ্যা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রমওয়েল, মারলবরোর ঐতিহ্য লইয়া ওয়েলিংটন

ইংরেজ রণকৌশলের চূড়ান্ত দেখান। নেলসন সমুদ্রে ইংরেজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। আর স্থলশক্তি (landpower) ও সমুদ্রশক্তির (seapower) দ্বন্দ্বে নূতন করিয়া প্রমাণিত হয়—সমুদ্রশক্তিই দুর্জয়। এদিকে জার্মানির প্রুশিয়ায় আবির্ভূত হয় শার্নহোর্ষ্ট-এর (Scharnhorst) মত সেনা-সংগঠক, গ্নেইসেনউ'র (Gneisenau) মত সেনাপতি, ক্লাউসেভিৎস-এর মত যুদ্ধের গবেষক। প্রুশীয় যুদ্ধচিন্তার এই সময়েই মূল স্থাপিত হয়—প্রুশিয়ার যুদ্ধবিদ্যার যেমন মূল স্থাপন করেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট।

ইঁহাদের উত্তরাধিকার লইয়া ফন্ মল্‌টকে প্রুশিয়াকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৬৬-এ ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৮৭০-এ জয়ী করেন—নূতন জার্মান শক্তির তাহাতে প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু ততদিনে সভ্য জগতে জীবন-যাত্রার পদ্ধতি উন্নত হইয়াছে, প্রুশিয়া বিসমার্কের হাতে সুসংহত শক্তি হইয়া উঠিয়াছে, আর রুনে ও বিসমার্কের জন্য প্রুশিয়ার প্রধান অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে তাহার সৈন্যবাহিনী। মল্‌টকের সৈন্যবাহিনী সংখ্যায়, শিক্ষায়, যন্ত্রপাতির সজ্জায় (material) সব রকমেই ছিল অগ্রগণ্য। সেনাপতের সকল আয়োজনই এই ভাবে প্রায় হইয়াছিল সুসম্পূর্ণ। অস্ত্র-শস্ত্রের দিক হইতে ও যন্ত্রপাতির দিক হইতে যে উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিতেছিল তাহা চমকপ্রদ—বন্দুকের উন্নতি হইতে হইতে শেষে আসিল রাইফেল। গাদানো কামান হইতে দেখা দিল তখন রাইফেলে কামান—এই অস্ত্রেই অষ্ট্রিয়ার ১৮৬৬-তে

ও ফ্রান্সের ১৮৭০-এ পরাজয় ঘটে। রেলওয়ে, দূরদর্শন যন্ত্র, বাইসাইকেল, টেলিগ্রাফ—আর পরে টেলিফোন—আসাতে জীবন-যুদ্ধেও বিপ্লব ঘটিল, যুদ্ধ-জীবনেও বিপ্লব ঘটিল। সৈন্য-সংখ্যাও বিপুল হইতে লাগিল। রণসজ্জায় ও সৈন্যসজ্জায় দোসারী সৈন্য ১৮৭০-এ রহিল বটে, কিন্তু ব্যাটিলিয়ন লইয়া কলম না গড়িয়া গড়া হইল কোম্পানি লইয়া কলম—ইহাতে প্রয়োগ-সৌকর্য বাড়িল। যুদ্ধ-ফ্রন্ট ক্রমশ প্রশস্ততর হইল, গুলি-গোলার কদর বাড়িতে লাগিল, পাল্লা বাড়িতে লাগিল, নায়কদের তৎপরতা বাড়িতে লাগিল। অশ্বারোহী দল তখনো আক্রমণে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু গুলিগোলার সামনে ক্রমশই তাহাদের সার্থকতা কমিয়া গেল—অশ্বারোহীরদের রহিল সন্ধানের (reconnaissance) কাজে উপযোগিতা। রণকৌশলে দেখি—নেপোলিয়ন নিজের সৈন্যদের একত্রিত করিতেন যুদ্ধের পূর্বে; মল্‌টকে আনিয়া একত্র করিতেন যুদ্ধের মধ্যভাগে। ইহা আরও কার্যকর হইল। সমর-সমাবেশে (strategy) মল্‌টকে ছিলেন ধরাবাঁধা নিয়মের বিপক্ষে—তিনি ছিলেন দরকারের দাবি ("system of makeshifts") মিটাইবার পক্ষে।[1]

কোয়েনিগগ্রায়েএস্‌ (অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে) সেদাঁয় (ফ্রান্সের

1. "In War, it is a matter of doing in any guren sit of concret circumstances what seems to be proper without tying yourself down to a rigid set of rules."

বিরুদ্ধে) মল্টকে যে পরিবেষ্টন (envelopment) পদ্ধতির পরিচয় দেন, তাহার তুলনা কম।

যোদ্ধার যুদ্ধ বোধ হয় এই উনবিংশ শতাব্দেই শেষ হয়—[১] তখন পর্যন্তও যুদ্ধ জাতির যুদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু ছিল রাষ্ট্রের যুদ্ধ—দেশের সমস্ত লোকের জীবন-যাত্রা উহাতে প্রভাবান্বিত হইত না[২]

(৯) মহাযুদ্ধের যুগ

বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ জনগণের সকলের জীবনকে ক্রমেই স্পর্শ ও মথিত করিতে লাগিল—সর্বব্যাপী হইয়া উঠিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার যুদ্ধ—বুয়র যুদ্ধ ও রুশ-জাপানের যুদ্ধ। একটিতে ইংরেজী ধরা-বাঁধা যুদ্ধপদ্ধতির দুর্বলতা ধরা পড়িল, আরটিতে বুঝা গেল জাপানের মেশিন-গানের জোর, আর মোটামুটি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের (defence) সুবিধা। তারপরে বলকান যুদ্ধ। উহা পয়লা নম্বর জাতিদের যুদ্ধ নয়, তাহাতে যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গেল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ সত্য সত্য আরম্ভ হইল ১৯১৪-এর মহাযুদ্ধে। পূর্বেকার

---

1. "To day the wars of Moltke's time appear to us as purest type of strategic achievement."

2. 'They were state wars which did not strike through to the entire population in all its affairs.'

সমস্ত যুদ্ধ অপেক্ষা ইহা নূতন ধরণের। ইহার আরম্ভও চমকপ্রদ ; আর চার বৎসরে ক্রমান্বয়ে এই যুদ্ধের এত পরিবর্তন হইল যে, তাহা আরও চমকপ্রদ।

প্রারম্ভে ছিল কি—তাহা একবার মনে রাখা দরকার। যন্ত্রের ও বিজ্ঞানের রাজত্ব তখন শুরু হইয়া গিয়াছে—রেল, টেলিফোন, রেডিও, টেলিগ্রাফ পূর্বেই আসিয়াছে। মোটরকার, উড়োজাহাজ, এরোপ্লেন নূতন আসিতেছে। ইহাতে সৈন্যদের সংখ্যা-বৃদ্ধি, শিক্ষা, চালনা, রসদ-সংগ্রহ, এসব কাজ সহজ হইয়া গেল। নেপোলিয়নের বাহিনী ছিল ৬ লক্ষ আন্দাজ, মল্টকের ছিল ১০ লক্ষের মত—গত মহাযুদ্ধের বাহিনী লক্ষে লক্ষে গণিতে হইল।

এই বিপুল বাহিনীর জন্য আবার তেমনি অস্ত্রশস্ত্র বিপুল ভাবে যোগাইল কল-কারখানা। আর নূতন অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতে লাগিল বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র-আবিষ্কারক গবেষকরা। গোলাগুলির যে শক্তি দেখা দিয়াছিল তাহাই সর্বনাশী। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল মেশিন-গান ও উন্নত কামান, নির্ধূম বারুদ, নূতন বিস্ফোরক। কামান যেমন দ্রুত দাগানো সম্ভব হইল তেমনি দ্রুত চালানো সহজ হইল। আর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের সুযোজনে (coordination) যুদ্ধকৌশলে (tactics) অভিনবত্ব আসিল। পূর্বে কৌশল ছিল বহু সৈন্যের সংঘর্ষ (mass shock tactics) ; তাহার স্থানে এখন আসিল অশেষ গোলাবৃষ্টির কৌশল (mass fire tactics)। এক-একটি যুদ্ধেরও আরম্ভ-মধ্য-শেষ সব দীর্ঘ

কালব্যাপী ; আর যুদ্ধও চলিত দীর্ঘ স্থানব্যাপী। সৈন্যসজ্জা ও রণসজ্জার নিয়ম ছিল ঘনসারে (dense) পদাতিক সাজানো ; গোলায় তাহাদের সম্মুখ পরিষ্কার করা,—৬০০ থেকে ৮০০ মিটার দূরে থাকিত শত্রু। গোলাবৃষ্টির পরে পদাতিক চলিত শত্রুর স্থান দখল করিতে, গোলন্দাজেরা যাহা আয়ত্ত করিত, পদাতিকেরা করিত তাহা দখল (The artillery captures, infantry occupies)। এইরূপ যুদ্ধে আকস্মিকতা নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবে দুই পক্ষের কামানের লড়াইতে। এক পক্ষ নিস্তব্ধ হইবে। তখন অন্য পক্ষের কামানের প্রতাপে সেই পক্ষের পদাতিক অগ্রসর হইয়া চলিবে সম্মুখে। কার্যত দেখা গেল—কাহার কামান কোথায়, বুঝা যায় না। সবই গুপ্ত, কাজেই তাহা নিস্তব্ধও হয় না। ক্রমশ দেখা গেল—প্রতিরোধের (defence) সুযোগ বাড়িতেছে। কাজেই কামানের কাজ হওয়া উচিত নিজ পদাতিক রক্ষার জন্য গোলাবর্ষণ, (protective fire) পদাতিকের আক্রমণে সাহায্য করিবার জন্য গোলাবর্ষণ (supporting fire) নয়। অথচ যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইল তখন প্রত্যেকেই তবু আক্রমণমূলক (offensive) যুদ্ধে নামিয়া পড়িল।

চার বৎসরের মহাযুদ্ধে সে যুদ্ধের যে গতি পরিবর্তন ঘটে তাহার সহিত যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের কৌশল প্রভৃতি জড়িত। অন্তত গুটি পাঁচ-সাত অঙ্কে এই মহাযুদ্ধ জার্মানরা ভাগ করেন। মহাযুদ্ধে হারিয়া তাঁহারাই এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন

বেশি। তাঁহাদের মতে—প্রথম ঝাপ্টা শেষ হইল ১৯১৪-এর হেমন্তে—যুদ্ধক্ষেত্র সুস্থির (stabiliztion of fronts) হয়, আর আরম্ভ হইল স্থাণুযুদ্ধ (war of position)। ইহার পরিচয় দেখি টেঞ্চযুদ্ধে, কাঁটা তারের বেড়ায়, অগ্র ঘাঁটিতে (advanced posts)। ইহার অস্ত্র ট্রেঞ্চ মর্টার, পুরানো হাত-বোমা; কামান আর গোলাগুলির বেড়া (fire barrage); পরে গ্যাস, মর্টারে-পোরা গ্যাস; আবার গ্যাস-মুখোশ। এদিকে সন্ধানী বা দর্শক (reconnaissance) এরোপ্লেন, ওদিকে কামুফ্লাশ। আবার ট্রেঞ্চের পিছনে পিছনে সৈন্য, মজুত সৈন্য, মালপত্র, ইত্যাদি। তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হইল—আবার আক্রমণমূলক যুদ্ধে সোমের (Somme) উপরে। এই প্রথম বিমান লইয়া স্থল-সৈনিককে আক্রমণ করা হয়। আকস্মিকতার দিকে ইহাতেও তবু দৃষ্টি ছিল না। সাড়ে চার মাস চলিল গোলা-গুলিবৃষ্টি—মালের যুদ্ধ ("war of matèrial")। তারপর চতুর্থ পর্ব—সর্বত্র অপেক্ষাকৃত শুদ্ধতা, ক্ষুদ্রতর লক্ষ্য (limited objectives) লইয়া যুদ্ধ। জার্মানরাও প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধে তখন রত হইল—জায়গা জয় অপেক্ষা নিজের কম ক্ষতিতে শত্রুর বেশি ক্ষতি করিতে চাহিল। পঞ্চম পর্ব আরম্ভ হয় ১৯১৭-এর বসন্তকালে। ট্যাংক আসিল—সচলতা ও গোলাবৃষ্টি একসঙ্গে যুক্ত হইল, তাহার রক্ষা-বর্মও (protection) চমৎকার। অনেক ট্যাংক এক সঙ্গে প্রযুক্ত না হওয়াতে ট্যাংকের উপযোগিতা বুঝা যায় নাই। মিত্রশক্তি এক সঙ্গে অনেক ট্যাংক প্রয়োগ করিল কাব্রেঁ (Cambrai)

যুদ্ধে ১৯১৭-এর নবেম্বর মাসে। কিন্তু এক সঙ্গে পদাতিক, গোলন্দাজ ও ট্যাংক সংযোজিত না হওয়াতে ইংরেজেরা সেই যুদ্ধেও শত্রুব্যূহ ভেদ (break through) করিতে পারে নাই। যুদ্ধে ট্যাংকের জন্য 'আকস্মিকতা' দেখা দিল। জার্মানরা ইহার জবাব দিল নূতন কৌশলে—ট্যাংক তাহাদের তখনো ছিল না—পদাতিকের সঙ্গে গোলন্দাজদের সামনে জুড়িয়া। ১৯১৭-তে এই ভাবে যুদ্ধ খানিকটা সচল হইল। জার্মানরা আবার আক্রমণ-মূলক যুদ্ধের জন্য নূতন ভাবে তৈয়ারি হইল। ইহাই ষষ্ঠ পর্ব—কামান দাগিয়া প্রারম্ভে পদাতিক আক্রমণের জন্য পথ করা, পরে সঘন সারে পদাতিকের আক্রমণ, কামানের পাল্লা সঙ্গে সঙ্গে আরও আগাইয়া দেওয়া, তারপর শত্রুর দুর্বল স্থান (soft spot) খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে সংঘাত-সৈনিকদের (shock troop) ঢুকাইয়া দেওয়া—ইহাই সংক্ষেপে এই আক্রমণ-পদ্ধতি। ১৯১৮-এর জুলাইতে ভিয়ের-কোংরেত-এ (Villiers-Cortrets) মিত্রশক্তিও এইরূপেই প্রতি-আক্রমণ করিল। জার্মান সৈন্যদের পরাজয় পালা শুরু হইল—এই সপ্তম পর্বে।

যুদ্ধের এই পর্বগুলির মধ্যে যে বিপুল ও অশেষ ঘটনাবলী রহিয়া গেল তাহা উল্লেখ করা অসম্ভব। একটি কথা কিন্তু স্মরণ করা দরকার,—এই সপ্ত পর্বের মধ্যে তাহার উল্লেখ হয় নাই—উহা ব্রিটিশ ও জার্মান নৌ-বলের কথা। ফন্ টিরপিৎজ প্রমুখ নৌবলাধ্যক্ষরা জার্মান নৌবলকে গড়িয়াছিলেন ব্রিটিশ নৌবলের সঙ্গে লড়িবার উপযোগী করিয়া। তাঁহারা দেখিলেন—নৌ-সংখ্যায়

ব্রিটেনের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। তাই নৌ-সেনাদের শিক্ষা-গুণে তাঁহারা বেশি কার্যক্ষম করিলেন যেন ব্রিটিশ গ্র্যাণ্ড ফ্লিট হেলিগোল্যাণ্ড বাইটের দিকে জার্মান হাই সী ফ্লিটকে আক্রমণ করিলে জার্মান নৌসেনা সংখ্যাধিক ব্রিটিশ নৌবলকে পরাস্ত করিতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ নৌবল সেইভাবে আক্রমণই করিল না, তাহারা দূরে সমুদ্রে জার্মানদের অবরোধ করিয়া রহিল। আর তাহাতেই শেষ পর্যন্ত জার্মানি ভাঙিয়া পড়িল। যুদ্ধের শেষে যে পরিবর্তন দেখা গেল তাহা বিস্ময়কর। যুদ্ধারম্ভে এক সারে যুদ্ধ হইত, যুদ্ধশেষে দেখা গেল—সারের পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত সুগভীর সৈন্যও আয়োজন (depth)। যুদ্ধে আগে গোলন্দাজ, পদাতিক, প্রভৃতি এক-একটি অস্ত্র ছিল স্বতন্ত্র, যুদ্ধশেষে দেখা গেল সকলের সুযোজন হইয়া উঠিয়াছে নিয়ম।

যন্ত্রজগতেও বিপ্লব ঘটিয়া গেল। নূতন অস্ত্রগুলির নাম করাই যথেষ্ট—ট্যাংক, গ্যাস, বিমান,—সন্ধানী বিমান, পরস্পরের আক্রমণের বিমান, আর বোমারু বিমান, সবই সে যুগের নবজাত শিশু। যুদ্ধের সরঞ্জাম যেমন বিপুল হইল তেমনি হইল বিচিত্র। পদাতিকের হাতে আগে ছিল শুধু রাইফেল ও কিছু কিছু মেশিন-গান। এখন তাহাদের হাতে আরও অস্ত্র উঠিল—হাতবোমা, রাইফেল, ছোঁড়া বোমা, মর্টার, হাল্কা ও ভারী নানা রকমের মেশিন-গান, ইত্যাদি। অশ্বারোহীদেরও হাতে এইরূপ অস্ত্র দিতে হইল। গোলন্দাজদের কার্যকারিতা সব চেয়ে বেশি দেখা গেল—কামান যে কত উন্নত হইল তাহা

বুঝানো শক্ত। তাহা ছাড়া কামান মোটরে ও রেলে বিষম সচল হইয়া উঠিল। বিমান-মারা কামানও আসিল। যুগটাই এঞ্জিনিয়ারদের। যুদ্ধ তাহারাই এখন নানা ভাবে চালাইতে লাগিল। মাটি খুঁড়িয়া পাতাল তাহারা গড়িল—এদিকে রাস্তা তৈরি করা, রেল লাইন পাতা, নূতন ভাবে আশ্রয়কেন্দ্রকে সুরক্ষিত করা, বেড়া দেওয়া, পুল তৈরি করা, গোলাবারুদের গুপ্তাগার রাখা, এসব তো আছেই। তাহা ছাড়া বিমানের কামানের কারিগরীও আছে। খবরাখবর সংগ্রহের জন্য টেলিফোন, রেডিও হইতে, পুরানো সূর্যলেখা (heliographs) কুকুর ও পায়রা দ্বারা পত্র প্রেরণ কিছুই বাদ গেল না।

এই যন্ত্রবিপ্লবে যুদ্ধ-কৌশল (tactics) পরিবর্তিত হইল। জার্মান সমর-গবেষকের মতে—যন্ত্র গত যুদ্ধের পূর্বে ছিল মানুষের ব্যবহার্য জিনিস, এবার মানুষই হইল যন্ত্রের ব্যবহার্য জিনিস। যন্ত্রের রাজত্বই যুদ্ধের উপরে স্থাপিত হইল—এতদিন যুদ্ধে ছিল মনের দক্ষতা, এখন দেখা দিল বস্তুর দক্ষতা। ইহাতে সমর-সমাবেশ (strategy) ও রণকৌশল দুয়েরই বিপ্লব সাধিত হইল।[১]

---

1 Tactics were revolutionised by technology which from being servant seemed to have become the master. Matter not mind, dominated both the battlefield and the laboratory, matter in its abundance or in its dearth. The Machine, invented and served by men, was threatening to destroy him. The Art of War, always an affair of mind first and then of matter, appeared enchained and the domain of strategy was not unaffected by these developments. (*The Art of Modern Warfare*, Hemann Foertsh, p. 79)

সমর-সমাবেশের (strategy) ও রণকৌশলের (tactics) এই যুগান্তরের একটা দিগ্‌দর্শনী এবার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সমর-সমাবেশের কথা বলিতে গেলেই একবার সর্বাগ্রে পূর্ণ-সমাবেশের (Grand Strategy) দৃশ্যটি মনে রাখিতে হয়। উদ্দেশ্য বা অভীষ্টের দিক হইতে মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট—অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস করা; জার্মান সামরিক শক্তি ধ্বংস করা, সেই রাষ্ট্রশক্তি খর্ব করা। কিন্তু কেন্দ্রবর্তী শক্তির (Central Power) বা জার্মানি-অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অনিশ্চিত—শুধুই নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। যুদ্ধ-সমাবেশের কালে কিন্তু জার্মানির শুধু প্রতিরোধের চেষ্টা দেখিবার উপায় ছিল না—তাহাকে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে। কারণ দুপক্ষের সকল রকম শক্তির তুলনায় জার্মানির আর্থিক যোগ্যতা কম। তাই সময় ছিল জার্মানির এক প্রধান শত্রু। কাজেই সমর-সমাবেশে আক্রমণ-নীতিই তাহাদের গ্রহণ করিতে হইল। এই হইল জার্মান সমর-সমাবেশের মূল অবস্থা। কিন্তু একই সময়ে সর্বত্র সেই আক্রমণ চালানো চলে না—পূর্বে-পশ্চিমে দুই প্রান্তে যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তাহার সমাবেশ হইল মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে (Inner Line)—সেই মধ্যস্থল হইতে প্রথমে এক প্রান্তের শত্রুকে শেষ করা, পরে অন্য প্রান্তে শত্রুকে ধরা। ইহাই শ্লীফেন প্ল্যানের (Schlieffen Plan) মূল কথা। এই প্ল্যান তৈরি হয় শতাব্দীর গোড়ায়, তাহার উপর অনেক

গবেষণা হয়। শেষে ঠিক হয়, প্রথমে জার্মান বাহিনী পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্সে অগ্রসর হইবে—সেখানে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ হইলে আসিবে পূর্ব প্রান্তে রুশিয়ায়। অবশ্য এ প্ল্যানের কৌশল ছিল পরিবেষ্টনের কৌশল—উত্তরে বেলজিয়মের পথে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে ঘিরিয়া ধরিবে, ততক্ষণে দক্ষিণের জার্মান বাহিনী শুধু ফরাসী বাহিনীকে আটকাইয়া রাখিবে (contain); আর পূর্ব প্রান্তেও জার্মান বাহিনী রুশদের ঠেকা দিয়া পূর্ব প্রুশিয়া রক্ষা করিবে। এই তুলনায় ইংরেজ-ফরাসীর সমাবেশ ছিল সহজ। তাহারা বহিঃক্ষেত্র (Outer Line) হইতে যুদ্ধ করিবে, শত্রুকে পরিবেষ্টন করিবে। কিন্তু আক্রমণ-মূলক যুদ্ধ ক্রমশ প্রতিরোধপ্রধান যুদ্ধে পরিণত হইল। মিত্রশক্তিরও সকল আক্রমণ ব্যর্থ হইল। জার্মানির মূল চেষ্টা টিকিল না; মিত্রশক্তিরও মূল চেষ্টা টিকিল না। কিন্তু মিত্রশক্তির আর্থিক বনিয়াদ ভাল বলিয়া তাহারা কালক্ষয় করিতে পারে—জার্মানি তাহা পারে না। এই হইল মিত্রশক্তিদের প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ-পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা। জার্মানির চরম চেষ্টায় মিত্রশক্তির ব্যূহভেদ হইল—কিন্তু দেখা গেল সারের পিছনে সার, মিত্রশক্তির মজুত সৈন্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। জার্মান রণকৌশলের (tactics) কৃতিত্ব দেখা গেল অনেক, কিন্তু যুদ্ধের সমাবেশ (strategy) চূড়ান্ত ফল (decision) দান করিতে পারিল না। ততক্ষণে যুদ্ধ শেষ পাদে আসিয়াছে—তুর্কী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি গুঁড়াইয়া যাইতে লাগিল,

পশ্চিমে জার্মান বাহিনী ক্রমাগত ধাক্কায় পিছাইয়া পড়িতে লাগিল—আর্থিক বিপ্লবে জার্মানির দম ফুরাইয়া গেল।

সমর-সমাবেশের দিক হইতে মহাযুদ্ধের প্রধান শিক্ষা তাই এই :—(১) সমর-সমাবেশ রাষ্ট্রনীতির, স্বরাষ্ট্রনীতির ও পররাষ্ট্র-নীতির অবস্থার উপর নির্ভর করে। (২) আর্থিক ও মানসিক অবস্থার দ্বারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইতে পারে। (৩) আক্রমণের অপেক্ষাও প্রতিরোধ-প্রধান আক্রমণেই (defensive-offensive) স্থান-কালের সুযোগ থাকিলে সার্থকতা দেখা যায়। (৪) আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ, এই ক্রমাগত ঘটনার ধারা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—যে পক্ষ উদ্যোগী, সমাবেশের চাল (initiative) যে হাতে রাখিতে পারে, সে-ই একটির পর আরটি সমাবেশের চাল গ্রহণ করিতে থাকে ; প্রতিপক্ষের প্ল্যান আর কাজে খাটাইবার সুযোগই আসে না। এই যে প্রয়োজনের দাবীতে চালের প্রয়োগ—ইহাকেই মল্‌ট্‌কে বলিয়াছেন সমাবেশ (Strategy as a system of makeshift)। (৫) এই যুগের সমর-সমাবেশে তিনটি জিনিস চাই—বহুবল (masses of man),—লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া যুদ্ধ চলে ; যন্ত্রোদ্যোগ (technology),—রেল, মোটর, টেলিফোন, রেডিওর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; সুপরিসর যুদ্ধক্ষেত্র (great spaces),—পার্শ্ব বলিয়া কোনো জিনিস সুদীর্ঘ যুদ্ধক্ষেত্র আর বড় রহিল না—পার্শ্বাক্রমণ, পরিবেষ্টন, এই সব কৌশল তাই যুদ্ধারম্ভে ছাড়া স্থাণুযুদ্ধে আর সম্ভব হইল না, ব্যূহভেদের পর পার্শ্ববেষ্টন সম্ভব

হইতে পারিত। কিন্তু সেদিকেও যানবাহনে দ্রুত মজুত সৈন্য আনা যায়। আর ক্ষেত্র-সজ্জা ক্রমশই গভীর হইল—Line strategy become depth strategy. সেনাপত্যের (Generalship) সমস্যা হইল এই তিনটির সুপ্রয়োগ। এই দিকে যুদ্ধ গতিশীল করিবার জন্য দরকার হয় বহুবল ও বহুমাল—(mass and material)। উহাদেরই রাজত্ব যুদ্ধের উপর স্থাপিত হইল—বুদ্ধির সুযোগ কমিয়া গেল। এদিকে নৌযুদ্ধের দিক হইতে বুঝা গেল—শুধু দুই নৌবলের দ্বন্দ্ব নয়, নৌবলের প্রধান উপযোগিতা প্রতিপক্ষের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করা, আর নিজের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা।

সব চেয়ে প্রত্যক্ষ যাহা তাহা এই যে—যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াইয়া যুদ্ধ আজ শ্রমক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্র গিয়া পৌছিয়াছে, সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধ সবাই আজ যোদ্ধা, সবাই যুদ্ধের কবলে—War is total, it is once more destruction as in the oldest times, only by other means and with other aims।

গত যুদ্ধের ধ্বংসের উপরে গড়িয়া উঠে এ যুগ আর এ যুগের যুদ্ধ।

এ যুগের যুদ্ধ প্রথম দেখা দেয় জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে। সামরিক দৃষ্টিতে উহার গুরুত্ব বিশেষ নাই—চীনের আয়োজন-পত্র 'এ যুগের' নয়—সেকেলে। কাজেই সে যুদ্ধের গুরুত্ব রাজনৈতিক।

মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণও প্রায় এই পর্যায়ের অন্তর্গত। দুইটি কথা তবু উল্লেখযোগ্য, ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধের একটা প্রহসন হয়—কার্যত তখন অর্থনৈতিক যুদ্ধের পরীক্ষা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ইতালি গ্যাস অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া সফলকাম হয়। কিন্তু গ্যাসের পাল্টা ব্যবহারের কিংবা গ্যাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কোনো স্থবিধা আবিসিনিয়ার ছিল না বলিয়াই ইতালির ভাগ্যে স্থযোগ এত সহজলভ্য হয়। আসলে এ যুগের যুদ্ধের প্রথম একটা মহড়া হয় স্পেনে। সে যুদ্ধ যদিও প্রথমত ছিল গৃহযুদ্ধ, তবু সেখানেই ইউরোপের নূতন সামরিক মতবাদ আপনার শক্তির পরীক্ষা করে—জার্মান ও ইতালি বিমান ও ট্যাংক এখানে প্রেরণ করে, তাহাদের সৈনিকেরা এখানে উহা লইয়া পরীক্ষা চালায়। অপর পক্ষেও ছিল তেমনি কিছু কিছু সোভিয়েট বিমান ও ট্যাংক ও সৈনিক, আর বিশেষ করিয়া স্পেনের জন-সেনা। স্পেনের সংগ্রাম তাই বিশেষ আলোচনার যোগ্য। তাহার প্রধান কয়টি দিক এখানে শুধু উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, ইহা স্পেনের সামরিক নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে স্পেনের জনগণের যুদ্ধ। অর্থাৎ এক দিকে ছিল সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা, শৃঙ্খলা, আর দিকে ছিল সংখ্যা, উৎসাহ ও নেতৃত্বহীনতা। দ্বিতীয়ত, এ যুদ্ধে জার্মানি ও ইতালি নির্মমভাবে বিমানের আক্রমণে এক একটা শহর (বিলবাও, গুয়েদেলারা প্রভৃতি) চূর্ণ করিয়া বল হিসাবে বিমানের পরীক্ষা করে। তৃতীয়ত, এ যুদ্ধেই তাহারা ট্যাংক ও বিমানের সংযুক্ত আক্রমণের ফলও শেষ দিকে

পরীক্ষা করিয়া দেখে। প্রথম দিকে ট্যাংকের একত্রিত আক্রমণ হয় নাই। তাই এ যুদ্ধের এই দিক ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা তখনো লক্ষ্য করিতে চাহেন নাই। কিন্তু জার্মানি এই ভুল করে নাই। চতুর্থত, এই যুদ্ধে জন-সেনাদের পরাজয় ঘটিলেও প্রকৃতপক্ষে জন-প্রতিরোধের নানা উপায়ের পরীক্ষা হয়। উহাই Hugh Slater ও Tom Wintringham প্রভৃতির নূতন গবেষণার বস্তু। চীন-জাপানে ১৯৩৭ হইতে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতেও ক্রমশ এইরূপ একটা প্রণালী অনুসৃত হইতে থাকে—সে যুদ্ধেরও সামরিক গুরুত্ব প্রধানত উহাই।

ছয়

এ যুগের আয়োজন

যুদ্ধের বিবর্তনে এ যুগের যুদ্ধের রূপ ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল। যুদ্ধ ঠিক আরম্ভ না হইতে তাহার স্বরূপ কাহারও পক্ষে সম্পূর্ণ বুঝা সম্ভব ছিল না। তথাপি যে-সব সামরিক আয়োজন চলিতেছিল ও সামরিক চিন্তায় যে-সব প্রশ্ন দেখা দিতেছিল, তাহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। যুদ্ধের সেই সামরিক আয়োজন—অস্ত্রশস্ত্রের নূতন রূপ, রণকৌশলের বা ট্যাক্‌টিক্‌সের নূতন সম্ভাবনীয়তা, সমর-সমাবেশের বা ষ্ট্র্যাটেজির প্রশ্ন, সামরিক চিন্তার নানা ধারা, সামরিকগণের গবেষণা, অনুশীলন—এ যুগের যুদ্ধের গোড়ার কথা।

যুদ্ধের বল

যুদ্ধের গোড়ায় অস্ত্রশস্ত্র, অর্থাৎ সশস্ত্র বল—পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ প্রভৃতি সেনাবল; ক্যাপিটেল শিপ, ক্রুজার, ডুবো জাহাজ, প্রভৃতি নৌবল, আর জঙ্গী বিমান, বোমারু বিমান প্রভৃতি বিমানবল।

সাধারণভাবে এই অস্ত্রশস্ত্রের দুইটি দিক আছে। এক জাতীয় অস্ত্রের কাজ—গোলাবৃষ্টি (fire) শত্রুকে দূরে রাখা, আগু বাড়িতে বা পিছু হটিতে না দেওয়া, শেষ করা। ইহাদের বল বর্ষণাস্ত্র (fire weapon)। আর জাতীয় অস্ত্রের কাজ শত্রুর উপরে

ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহায্য করা—ইহাকে বলা চলে সংঘর্ষাস্ত্র (shock weapon)। দুই রকম অস্ত্রেরই চাই শত্রুর নাগাল পাওয়া, অর্থাৎ চাই সচলতা, চাই প্রয়োজনমত পরিবর্তন-সাধ্যতা (flexibility)। এই জন্যই আবার এই সশস্ত্র সৈনিকদের দরকার ঠিক মত সংগঠন ও বিন্যাস—যেন সচলতা থাকে, যেন প্রয়োজন মত কাজ দিতে পারে,—যেন আক্রমণের বেলা কাজ দেয় আবার আত্মরক্ষার বেলাও কাজ দেয়, বিশেষ করিয়া আবার কাজ দেয় অন্যান্য অস্ত্রধারী সৈনিকদের সঙ্গে একযোগে (cooperation) প্রয়োগে। তাই এ যুগের পদাতিক গোলন্দাজ ট্যাংক-সৈন্য, বিমান-সৈন্য প্রভৃতি প্রায় সকল রকমের বল মিশাইয়া গঠিত হয় এক-এক ডিবিশন সৈন্য।

(১) **পদাতিক**: যুদ্ধের প্রথম বল পদাতিক (Infantry)—লিডেল হার্ট প্রমুখেরা যাহাই বলুন, এখনো সম্ভবত তাহাদের দিন যায় নাই। তবে অধিকাংশ স্থলে পদাতিক আজ মোটর-বাহিত। দূরের পথে রেল তো আছেই। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহারা যায় লরীতে ট্র্যাকে। কিন্তু পদাতিক হিসাবেও তাহাদের উপযোগিতা কমে নাই—মোটর সর্বত্র চলে না, মোটর ট্র্যাকের উপর শত্রুর কামান বা বিমানের আক্রমণ সহজ। তাহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে তো সৈন্যদের নামিতেই হয়।

পদাতিকের হাতে দুই রকমের অস্ত্রই থাকে—বর্ষণাস্ত্র ও সংঘর্ষাস্ত্র, রক্ষাস্ত্র ও আক্রমণাস্ত্র। রাইফেল বেয়নেট হইয়াছে সেকেলে—এদিনে টমিগান, মেসিনগান, মর্টার তাহার প্রধান

অস্ত্র। মেসিনগানও দুই রকমের, হাল্‌কা আর ভারী। মর্টারও কাজ বুঝিয়া নানা রকমের হয়—ট্রেঞ্চ ভাঙিবার মর্টার, হাতে ছুঁড়িবার মর্টার, রাইফেলে ছুঁড়িবার মর্টার, ইত্যাদি। মেসিন গানের গুলি সিধা চলে, আর মর্টার কামানের গুলি গিয়া উপর হইতে পড়ে। পদাতিকের আর এক অস্ত্র—ট্যাংক-মারা কামান বন্দুক। আর তাহার শেষ এক উপকরণ—ট্রেঞ্চ খুঁড়িবার কোদালি। ১০।১২ কোম্পানি পদাতিক, ৩।৪ কোম্পানি ভারী মেসিনগানধারী বা মর্টার ছোঁড়া পদাতিক, ২।১ দল (detachment) ট্যাংক-মারা সৈনিক, ২।১ কোম্পানি কামান-ওয়ালা গোলন্দাজ (artillary) আর তাহার সহিত সংবাদ-সংগ্রহের (information) ও সন্ধানের (reconnaissance) ২।১ দল—মোটামুটি এ যুগের পদাতিক রেজিমেণ্ট গঠন অনেকটা এইরূপ। পদাতিকে গোলন্দাজে মিশিয়া আজ বাহিনী রচনা চলে আর এই সব গঠনে যোদ্ধা (combatants) ছাড়াও সঙ্গে সঙ্গে অনেক অযোদ্ধা (non-combatants) চলে—তাহারা ধোপা-নাপিত, খানসামা প্রভৃতি আর্মি সার্ভিস্ কোর, ডাক্তার বা মেডিকেল কোর, বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়র, এ যুগের যুদ্ধের মোটরের কারিগর, টেলিফোন্ টেলিগ্রাফ বেতারের মিস্ত্রী কারিগর ইত্যাদি।

পদাতিকের এই অস্ত্রের বোঝা সাজ-সরঞ্জাম, একটা বিপদ। তাহার উপর যদি রসদের লটবহরের অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে হাল্‌কা অস্ত্রের শত্রু-সৈনিকের হাতে লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে।

এমনি লাঞ্ছনাই এক যুগে মুঘল বাহিনীর ঘটিয়াছে শিবাজীর সেনাদের হাতে; এই যুগেও মালয়তে-বর্মায় ঘটিয়াছে বুট-পট্টি-ডিনার-ব্রেকফাষ্ট অভ্যস্ত ব্রিটিশ সেনাদের জাপানী বর্গীদের টমি-গান বা লাইট মেসিনগানের সম্মুখে। অবশ্য জাপানীদের রণকৌশল—শত্রু-অঞ্চলের মধ্য দিয়া অনুপ্রবেশ বা ইন্‌ফেল্‌ট্রেশন—তাহাদের কৃতিত্বের একটা বড় কারণ।

সমস্যাটা এই—পদাতিকই এখনো স্থলবাহিনীর মেরুদণ্ড। কিন্তু যুদ্ধের প্রধান কথা তাহাকে যথেষ্ট গোলাবর্ষণের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া, অথচ তাহাকে সচলও রাখা।

(২) *গোলন্দাজ*: গোলন্দাজেরা—বর্ষণাস্ত্রের (fire weapon) প্রধান অধিকারী—তাহারা সংঘর্ষণাস্ত্রের (shock weapon) অধিকারী নয়। স্থাণুযুদ্ধে (war of position) কামান হইয়া উঠিয়াছিল প্রধান অস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ দরকার হয়, তাই গোলন্দাজ মোটের উপর যুদ্ধের সহায়ক।

কামানের বড় কথা সচলতা—তাই কামান মোটরে চড়িতেছে। খুব বড় কামান রেলে চড়ে, উহা লাইন ছাড়িতে পারে না। বলা বাহুল্য—কামান যত ভারী হইবে ততই তাহার সচলতাও কমিবে। এইখানেও তাই ক্যালিবার (calibre)-এর সঙ্গে সচলতার একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়া থাকে।

গোলন্দাজ বাহিনী যে সেকেলে হয় নাই, এবারকার সোভিয়েট যুদ্ধে লালফৌজ তাহা বেশ প্রমাণিত করিতেছে।

(৩) ট্যাংক ও ট্যাংক-নাশী অস্ত্র : বলাধিক্য ও আকস্মিকতা (superiority and surprise), রক্ষাবর্ম ও সচলতা (armour and movement) বর্ষণ-শক্তি ও সংঘর্ষ-শক্তি (fire effect and shock effect)—ট্যাংকের প্রসাদে এই সব বিরোধী ধর্মের যোগ ঘটিল। স্থান ও কালের (time effect) সংকোচনে, মানুষ ও অস্ত্রের সংযোগে, গোলার সঙ্গে গতির যোগে—সত্য সত্যই বলের সদ্ব্যয় ব্যবস্থা (economy of force) করিয়াছে ট্যাংক।

ট্যাংক ও বিমান বোধ হয় যুগের অস্ত্র। এ যুগের যুদ্ধের রূপ দান করিয়াছে প্রধানত এই দুই অস্ত্র। ১৯১৮-এর ৮ই আগষ্টের এমিয়েঁর সংগ্রামক্ষেত্রে ৪১৫টি ট্যাংকের আঘাতে জার্মান লাইন ভাঙিয়া পড়ে। এখন এক-একটি পান্‌ৎসার (জার্মান ট্যাংক) ডিবিসনেই ৫০০-এর মত ট্যাংক থাকে। ৩ হাজার ট্যাংকের সংঘর্ষে এবার সেদাঁর ফরাসী লাইন জার্মানরা ভেদ করে।

হাল্‌কা মাঝারি আর ভারী, ট্যাংক আজ এই তিন প্রকারের। হাল্‌কা ট্যাংক ৫।৬ টন হইতে ১০।১২ টন ওজনের (১ টন প্রায় ২৭ মন), মাঝারি ট্যাংক ১২।১৪ টন হইতে ২৫।৩০ টন ওজনের, আর ভারী ট্যাংক ৪০।৫০ হইতে ১০০ টন পর্যন্ত মহাকায় দৈত্য। কিন্তু মহাকায়দের গতি ধীর, ৭।৮ মাইলের মত। তাই কাজ তাহাদের প্রধানত অগ্রে অগ্রসর হইয়া গোলার সংঘাতে শত্রুর সুরক্ষিত স্থান চূর্ণ করা। মেসিনগানে কামানে উহারা সুসজ্জিত, পুরু পাতে সুরক্ষিত। উহার ভিতরে বসিয়া থাকে চালক ছাড়াও

আট দশ জন সৈন্য। রেডিও হইতে মেশিনগান চালক সকলেই ওস্তাদ যন্ত্রশিল্পী। কিন্তু নিতান্ত লাইন চূর্ণ করার কাজে ছাড়া ইহার প্রয়োগ বেশি নাই। হালকা ট্যাংকে দুই-তিনজন মাত্র থাকে। অনেক সময় বেতার বন্দোবস্ত থাকে না, মেসিনগান ও কামান ১টি করিয়া থাকে। উহা ক্ষিপ্রগতি সৈনিকের মতই। তবে উহা ঘায়েল হয় সহজে। এজন্য মাঝারি ট্যাংকের প্রচলনই বেশি—চলেও তাহা প্রায় ঘণ্টায় মাইল ৩০ পর্যন্ত।

কিন্তু বড় কথা এই যে, ১০০ মাইল আন্দাজ চলিয়াই এক-একবার সব ট্যাংকের তেল লইতে হয়, তাহার আগা-গোড়া খবরদারি করিতে হয়। এই জন্যই ট্যাংক বাহিনীর পিছনে-পিছনে মোটরে চলে তেলের লরী, আর কারিগরদের কারখানার লরি। এক-একজন ওস্তাদ কারিগর এক-একখানা ট্যাংক ঘণ্টা চার-পাঁচে দেখিয়া শেষ করিতে পারে। ট্যাংক-যুদ্ধের বড় কথা তাই জিনিসের দিক হইতে তেল, আর মানুষের দিক হইতে এই কারিগর দল (maintenance staff)। বোধ হয়, এই কারিগরদের কৃতিত্বের জন্যই জার্মান পান্‌ৎসার বাহিনী এ যুগের যুদ্ধে এমন দুর্ধর্ষ হইয়াছে।

ট্যাংকের প্রধান প্রতিষেধক অস্ত্র ট্যাংক-মারা কামান আর রাইফেল। কিন্তু ট্যাংক প্রতিরোধ করিবার জন্য মাইন্, লোহার ও কংক্রিটের খুঁটি, পরিখা, খাল-বিল, জলে-ভরা জায়গা, নানা ট্যাংক-ধরা ফাঁদ হইতে পেট্রোলের বোতল পর্যন্ত অনেক কিছুই আছে। আর ট্যাংকের শত্রু ট্যাংকও কম নয়। উহাতে দুই

পক্ষীয় ট্যাংকের গোলাগুলির ও চালাচালির (manœuvre) পরীক্ষাও হয়। তাহা ছাড়া ট্যাংক-বাহিনী যদি বা পথ করিয়া চলিল—তাহার পিছনে পদাতিকদের পথ যদি শত্রু আবার আগলাইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্বগামী ট্যাংক-বাহিনীই শত্রুদের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইবে। রুশ-যুদ্ধে জার্মান পান্‌ৎসারদের বারে বারে এই দশা ঘটিয়াছে। ডনের যুদ্ধে এবার তাহারা তাই বাহিনী রচনায় আর সেই রীতি অনুসরণ করে না—পদাতিকদের চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইয়া চলে।

(৪) **অশ্বারোহী ও সন্ধানী দল**: অশ্বারোহীদের দিন গিয়াছে পূর্বেই। এ যুগের যুদ্ধে অশ্বারোহীদের কি দুর্দশা ঘটে, পোল্যাণ্ডের বিপুল অশ্বারোহী বাহিনীর দুর্দশা হইতেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তবু দুই-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ও কালে উহাদের উপযোগিতা আছে। ১৯৪১-৪২-এর শীতে রুশিয়ার বরফে যখন যন্ত্রযুদ্ধে ভাটা পড়ে, তখন লালফৌজের সওয়ার বাহিনী তাহাদের কার্যকারিতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োগ আজ খুবই সীমাবদ্ধ। একমাত্র সন্ধানী দল (reconnaissance) হিসাবেই ইহাদের সার্থকতা আছে। তাহাতেও অবশ্য আকাশ হইতে বিমান ও মাটিতে মোটর বেশি কাজ দেয়। কিন্তু তবু মোটর সর্বত্র যায় না; তাহা ছাড়া তাহার শব্দে শত্রু সতর্ক হইয়া উঠে। এই জন্য এখানে সন্ধানী দল হিসাবে অশ্বারোহীরা টিকিয়া আছে।

(৫) **ইঞ্জিনিয়ার দল**: এ যুগের যুদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারদেরই যুদ্ধ।

কাজের তাহাদের শেষ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সুরক্ষিত অঞ্চল হইতে শত্রুর প্রতিরোধের সব ব্যবস্থাই তাহাদের হাতে—শত্রুর তৈয়ারী বাধা ও ফাঁদ নষ্ট করা, নদীর উপর সেতু বাঁধা, আর রাস্তা-ঘাট তৈরী করা—সবই তাহাদের কাজ। মোটর-বাহিনীর দিন আসায় তাহাদেরই সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহাদেরও হাতে থাকে পদাতিকের মত হালকা অস্ত্র।

(৬) সংবাদ-সংগ্রাহক দল : বিমানের ও বেতারের প্রচলনে সংবাদ-সংগ্রহের সুযোগ বাড়িয়াছে—আবার শত্রুর সংবাদ-সংগ্রহও বন্ধ করিবার প্রয়োজন বাড়িয়াছে। মোটর সাইকেল ও সাইকেল, বার্তাবহ কুঁকুর, পারাবত সবই ব্যবহৃত হয়। টেলিগ্রাফ টেলিফোন তো আছেই।

(৭) সহায়ক ব্যবস্থা : যুদ্ধের এক বড় জিনিস—অযোদ্ধা নানা দল, ডাক্তার, ঠিকাদার প্রভৃতি—বিশেষ করিয়া সরবরাহ (supplies) সংগ্রাহক দল অসংখ্য চাই।

(৮) রাসায়নিক অস্ত্র : এই যুদ্ধে এখনো ইহার সামান্য প্রয়োগ হইয়াছে। এক ধূম্রাবরণ (smoke screen) জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। ফ্রান্সের পরাজয়ের সময়ে জার্মানি একরূপ কুয়াশারও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু গ্যাসের ও বীজাণুর প্রয়োগ এখনো হয় নাই। টোটেল যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইহার প্রয়োগ না হইলে বুঝিতে হইবে, দুই দলই উহাতে সমান, তাই সমান ভীত; কিংবা সত্যই উহা তেমন মারাত্মক নয়।

(৯) স্থল-বাহিনীর বিমান-বহর: বিমান-সেনাদল বহু কাজে আজ অপরিহার্য—যেমন, সন্ধান, সংবাদ-সংগ্রহ, বৈমানিক ফোটো লওয়া, যাতায়াত (transport), শত্রুর সুরক্ষিত কামান বন্দুক নষ্ট করা, শত্রুর পশ্চাদাক্রমণ করা, সেখানে প্যারাশুট নামাইয়া দেওয়া, সর্বোপরি আক্রমণ কালে ট্যাংকের সহযোগী রূপে শত্রুকে উপর হইতে ত্রস্ত করা, ঘিরিয়া ধরা, (vertical encirclement) আর নিজের বাহিনীকে ছত্রের (umbrella) মত ঢাকিয়া রাখা।

(১০) সংযোজন: Co-ordination-এর প্রধান কথা এই—নানা অস্ত্র, নানা বল, নানা শক্তির সংযোজন। হালকা ও ভারী পদাতিক দল, গোলন্দাজ দল, ট্যাংক সেনাদল, আর বিমান স্কোয়াড্রন—ইহাদের সংযুক্ত করিয়া গড়া হয় ডিবিশন। গোটা ৩ পদাতিক রেজিমেণ্ট, ১ বা ২ গোলন্দাজী রেজিমেণ্ট (অন্তত ৯টি ফিল্ড গান ও ৩টি ভারী কামান উহাতে থাকিবে) এক-এক ডিবিশনে থাকেই, সঙ্গে অবশ্য থাকে প্রত্যেক রেজিমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদবাহী দল, ট্যাংক-মারা কামান, আর প্রায়ই আরও দুই এক দল ট্যাংক-সৈনিক। ২।৩ ডিবিশনে মিলিয়া এক-এক আর্মি কোর; আর কোর মিলাইয়া আর্মি, তাহা মিলাইয়া আর্মি গ্রুপ। এই সংগঠন সর্বদাই দরকার মত ভাঙাগড়া হয়। ইহারও মূল সূত্র এই যে, চাই প্রয়োজন মত পরিবর্তন-সাধ্যতা (flexibility), আর যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া চাই ইহাদের সংযুক্ত প্রয়োগের ফল।

(১১) নেতৃত্ব: যেমন বলের গঠন তেমনি তাহার জন্য আছে উহার নেতৃত্বের সংযুক্ত (command) ব্যবস্থা। কোম্পানি স্কোয়াড্রন বা ব্যাটারি জন দুই নন্-কমিশান্ড অফিসারের নেতৃত্বে চলে। ব্যাটিলিয়ন নেতৃত্ব গঠিত হয় নায়ক ও তাঁহার এডজুটেণ্ট বা সহকারী, এবং আর দুই-একজন সংবাদ বিভাগের সহযোগী লইয়া। রেজিমেণ্টের নেতৃত্ব আবার ঐরূপ সব রেজিমেণ্টের জন্য নির্দিষ্ট প্রধানদের লইয়া গঠিত। ডিবিশনের জন্য কিন্তু প্রথম থাকে সেনাপতি মণ্ডলের বা জেনারেল ষ্টাফের একজন অফিসার, আর সংবাদ, সরবরাহ প্রভৃতি বিভাগের প্রধান সহযোগী একজন, সেনাপতি মণ্ডলের প্রধান বা চিফ অব্ দি জেনারেল ষ্টাফ, আর নানা সহযোগী। আর্মি কোরের সেনাপতির জন্য তাঁহার চিফই সহযোগীদের লইয়া বুঝিয়া আলোচনা করিয়া সব বিষয় তৈরী করে (review of the situation ও decision)। আবার সেনাপতির জন্যও আবার এইরূপ উচ্চতর ষ্টাফ বা সহ-সেনাপতি মণ্ডল থাকে।

নৌ-বল

কিন্তু পূর্ণ যুদ্ধের পূর্ণ সংযোজনের দিক হইতে স্থল-বাহিনীর একান্ত প্রয়োগই যথেষ্ট নয়—দরকার উহার সহিত নৌ-বল ও বিমান-বলেরও সংযুক্ত প্রয়োগ। নৌ-বলেরও অবশ্য এইরূপ ভাগ-বিভাগ আছে—উদ্দেশ্য ও কার্যধারা অনুযায়ী। যেমন,

(১) ব্যাট্‌লশিপ ও ব্যাট্‌ল ক্রুজার দুই অস্ত্রই ক্যাপিটেলশিপ, যেমন ছিল প্রিন্‌স্ অব ওয়েলস্ কিংবা জার্মান বিসমার্ক। কামানে বর্মে ইহারাই নৌ-সাম্রাজ্ঞী। (২) ক্রুজার ইহাদের অপেক্ষা ছোট, বর্ম হালকা, কামানও কম ভারী, ইহার সচলতা বেশি—তাই যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্র; আর বাণিজ্য রক্ষায় ইহাদের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন। তাই ব্রিটেনের ক্রুজার বেশি। এই দুইয়ের গুণ লইয়া জার্মানি গড়িয়াছিল তাহার ক্ষুদে (Pocket) ব্যাট্‌লশিপ। দেখা গেল তাহা সার্থক নয়। সংগ্রামে ক্যাপিটেলশিপ অবশ্য অস্ত্র হিসাবে মোক্ষম্—কিন্তু ক্রুজারই সর্বাধিক তৎপর। (৩) ডেষ্ট্রয়ার আরও তৎপর। উহা ছোট হালকা জিনিস, আক্রমণ করিতেও অগ্রসর হয়, প্রতিরোধ করিতেও অগ্রসর হয়। মাইন পাতিতে, মাইন তুলিতে, সাবমেরিন মারিতে, কনভয়ের কাজে—সব সময়েই চাই ডেষ্ট্রয়ার। মারও খায় তাই ডেষ্ট্রয়ার বেশি। (৪) ইহার পরেই আসে ডুবো জাহাজ। সংকীর্ণ সমুদ্রে ইহা শত্রুকে চোরা আঘাতে সহজেই শেষ করিতে পারে। এই জন্যই যাহাদের নৌবহর বড় নয় তাহারা এই ডুবো জাহাজ বাড়ায় বেশি—শত্রুর জাহাজ ডুবাইতে। যেমন ইতালি, জার্মানি। শত্রুকে মারিবার অস্ত্র টর্পেডো, মাইন, প্রভৃতি। (৫) আর নৌবলের প্রধান এক অংশ এখন নৌ-বিমান (seaplane) ও নৌবাহিত বিমান। ব্যাট্‌লশিপ প্রভৃতিতেও নৌ-বিমান কিছু থাকে। কিন্তু

নৌ-বাহিত বিমানের আসল বাসভূমি বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ। ভবিষ্যতে উহাই হয়তো আরও উন্নতি লাভ করিবে।

অবশ্য নৌ-ঘাঁটি ও মেরামতের ডক্ প্রভৃতির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিমান-বল

স্বতন্ত্রবল হিসাবেও বিমান আজ যুদ্ধের বড় জিনিস—এ যুগের প্রধান অস্ত্র। তাহার কাজ আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। তাহার প্রকারভেদও তদনুযায়ী। কিন্তু প্রতিদিন ইহার প্রত্যেক বিভাগে উন্নতির চেষ্টা চলিয়াছে—সর্বজাতীয় বিমানের পাল্লা বাড়িতেছে, গতি বাড়িতেছে, অস্ত্রসজ্জা বাড়িতেছে, বর্ম দুর্ভেদ্য হইতেছে, যাত্রা নির্বিঘ্ন হইতেছে।—কাজেই ইহার জাতি নির্দেশ করিলেও যথেষ্ট হয় না। প্রথম জাত বোমারু বিমান (Bomber)। ইহাদের কোনো জাত দূর পাল্লার, কখনো কখনো প্রায় দুই হাজার মাইল পর্যন্ত ; কোনো জাত নিকট পাল্লার, শত্রুর লাইন ও পিছনে বোমা ফেলে ; আবার কোনো জাত খাড়া নামিয়া (dive bombing) বোমা ছোঁড়ে—এই ছোঁ-মারা কাজে সমধিক নাম হইয়াছে জার্মান ষ্টুকা বিমানের। কিন্তু বোমারু বিমান বোমার ভার লইয়া চলে বলিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। সে কাজ করে দ্বিতীয় জাতের বিমান—জঙ্গী বিমান (Fighter)। ইহারা বোমাও দুই একটি ফেলে, কিন্তু ইহাদের প্রধান কাজ হইল নিজের বোমারু বিমান রক্ষা

—আর শত্রুকে আক্রমণ করা। তৃতীয় জাতের বিমান—সন্ধানী বিমান (reconnaissance)—জলে স্থলে আকাশে পাহারা দেয়। শত্রুর গতিবিধি জানাই ইহার দিবারাত্রি কাজ। চতুর্থ জাত, সৈন্য-বাহী বিমান (troop carrier)—সাধারণ সৈন্যদের বহিয়া আনিয়া নামাইয়া দেয়—যেমন দিয়াছে জার্মান বিমান নরওয়েতে, ক্রীট্‌সে। তেমনি পারাস্যুটবাহী বিমানের কথাও স্মরণে রাখা উচিত। আর স্মরণে রাখা উচিত—পাইলট, বেতারকর্মী, বোমা-বর্ষক, বায়ু-বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিমানের নাবিকদের, তাহাদের ভূমিচারী সহচরদের (ground stuff), এবং সর্বশেষে, বিমান-ঘাঁটির কথা।

বলের আয়োজন

এই যুগের যুদ্ধে এই সব বল যথেষ্ট পরিমাণে চাই, উহা যথেষ্ট উন্নত হওয়া চাই। কিন্তু এই বল গঠন কিরূপে হইতেছিল?

তিনটি জিনিসে এই বল গঠিত হয়—আর সেই তিন জিনিস দিয়াই রাষ্ট্রগুলির সমর-সামর্থ্যের বিচার হয়। সে তিন জিনিস —রাষ্ট্রের জনবল, ধনবল ও যুদ্ধোপযোগী আয়োজন (*The Military Strength of the Powers*, Max Warner); তিনটিই সমান গুরুতর; কোনোটিতে কাঁচা থাকা চলে না। অবশ্য প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার ভৌগলিক সংস্থান ও সম্ভাবিত শত্রুর কথা মনে রাখিয়াই নিজের বল-গঠন করে, সমর-সামর্থ্যও

সংগঠন করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেখিতে হয়—সময় তাহার হাতে কতটা থাকিবে—সামর্থ্য থাকিলেই হয় না, তাহা যুদ্ধোপযোগী করিবার মত সময় মিলিবে কিনা। এই হিসাবেই বলের আয়োজন, যুদ্ধের জন্য তৈয়ারী থাকাটা একটা বড় শক্তি ও সামর্থ্যের কথা। সময় পাইবার একটা উপায় অবশ্য সার্থক কূটনীতি।

এই যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের জাতিপুঞ্জের সমর-সামর্থ্যের একটা অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ হিসাব দিয়াছিলেন ম্যাক্স্ ভার্নার। কিন্তু তখনো জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করে নাই, স্কোডার কারখানা হস্তগত করে নাই। অতএব, যুদ্ধারম্ভের সময়ে ভার্নারের হিসাব আর খাটিত না। পূর্ববর্তী হিসাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অবস্থা ছিল এইরূপ :—প্রথম শ্রেণীর শক্তি পৃথিবীতে ছিল তখন (১) জার্মানি—তাহার জনবল যথেষ্ট, শিল্পবিন্যাসে সে সমৃদ্ধ, ও যুদ্ধ-প্রস্তুতিও সুসম্পূর্ণ। (২) রুশিয়া—জার্মানিরই মত তাহারও অবস্থা। (৩) ব্রিটেন—জনবল, ধনবল দুই প্রচুর, কিন্তু সমরের জন্য তাহা সংগঠিত নয়। (৪) ফ্রান্স—সব বিষয়েই ইহাদের খানিকটা পিছনে। ভার্নারের মতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত তখন ইতালি ও জাপান—উভয়েরই জনবল প্রচুর, আয়োজন সম্পূর্ণ, কিন্তু আর্থিক বনিয়াদ খুব দীর্ঘ যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। তৃতীয় পংক্তিতে পড়িত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি। আমেরিকা অবশ্য একাই যে-কোনো শক্তির তুলনায় জনবলে ও শিল্পবলে প্রধান হইবার কথা। কিন্তু তাহার দুইটি অন্তরায় ছিল—যুদ্ধের

জন্য সে প্রস্তুত নয়; দ্বিতীয়ত এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার রণক্ষেত্র হইতে সে দেশ বড় দূর। না হইলে যুদ্ধ সামর্থ্য তাহারই সর্বাধিক হইবার কথা।

জার্মান সমরায়োজন যুদ্ধের পূর্বে কূটনীতিতে ও বল-সংগঠনে পূর্ণতর হয়, অন্যেরা তাহা অবজ্ঞা করে। সোভিয়েট রাষ্ট্র অবশ্য তাহার সহিত তখনো পর্যন্ত তাল রাখিতেছিল। কিন্তু রুশিয়ার বিশাল ভূমিতে যানবাহনের সমস্যা গুরুতর, তাহার উপর শিল্প-সজ্জায় সে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। মিত্রশক্তি রুশিয়াকে মিত্র না করিয়া বৃথাই তখন নিজেদের সুযোগ নষ্ট করিতেছিল। ততক্ষণে জনবলে জার্মানির ৩০০ ডিবিশন সৈন্য হয় লক্ষ্য, ১২০-১৫০ ডিবিশন তৈরিই ছিল। ইহার পিছনে ছিল যুদ্ধদক্ষ বিপুল কারিগরদের রিজার্ভ (Wehrverbande)। এই বিপুল বাহিনীর অস্ত্র-সজ্জাও সম্পূর্ণ হইয়াছিল—ডোর্নার (Do), যুকার (Ju) প্রভৃতি বিমান, ভারী ও হাল্কা ট্যাংক, ট্যাংক-মারা, বিমান-মারা নানারূপ ভারী বন্দুক কামান অজস্র হইয়া উঠিয়াছে। আর সৈন্যদলের এই সব যন্ত্রের উপযুক্ত শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল ট্যাংক ও বিমানের সংঘর্ষার্থে (shock) প্রয়োগ, ছোঁ-মারিয়া বোমা (dive bombing) মারা, প্যারাশুটে নামা প্রভৃতি। ইতালি যুদ্ধায়োজনে চলিতেছিল জার্মানির পিছনে পিছনে। ব্রিটেন অবশ্য তখনো ২টি ডিবিশন যান্ত্রিক বাহিনী লইয়া নৌবলের ভরসায় বসিয়াছিল—ফুলার লিডেল হার্টের কথিত যন্ত্রসজ্জার কথা বৃথাই হইতেছিল (Britain

is in Danger, *The Current of War* ও *Dynamic Defence*)। শুধু বিমান ও বিমান-মারা কামান বাড়ানোর জন্য নূতন চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু ফ্রান্সের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। কূটনীতিক চালে হারিয়া তিনদিকে ফ্রান্স পরিবেষ্টিত। দ্যগল ও রেনোর কথা মত ট্যাংক-বাহিনী গঠিত হয় নাই, ট্যাংক তৈরিই হয় সামান্য। পিয়ের কোর (Pierre Cot) কথা মত বিমান গঠনের চেষ্টাও হয় নাই। ভিতরে ভিতরে ফরাসী শাসকেরা ফ্যাশিজ্মের সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সেই মুহূর্তে একা জার্মানী সৈন্যবলে ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের দ্বিগুণ শক্তিশালী, তাহার শিল্পবিন্যাস যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, আর অস্ত্রবলে সে ছিল বহুগুণ—সেই অস্ত্রও প্রায়ই আক্রমণাস্ত্র।

কৌশল

এইখানেই কৌশল ও সামরিক মতবাদের কথা আসে—অনেকের যুদ্ধায়োজন ইহার দ্বারা প্রভাবিতও হয়। গত যুদ্ধের পর এ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত একটা বড় প্রশ্ন দাঁড়ায় এই—এ যুগের যুদ্ধে কোন্ পদ্ধতি সুবিধার—আক্রমণের না প্রতিরোধের? প্রশ্নটা আর একরূপ উত্থাপিত হয় এই ভাবে—স্থাণুযুদ্ধ, war of position, না সচল যুদ্ধ, war of movements (এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ—'যুদ্ধের নূতন টেক্নিক',—সমসাময়িক, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৭)। যে রাষ্ট্র যে

মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে সে তদনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থাও করিয়াছে। এ যুগের প্রতিরোধরীতির একরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ফ্রান্সের মাজিনো লাইনে ও জার্মানির পশ্চিম প্রাচীরে বা সিগ্‌ফ্রিড লাইনে; অন্যরূপ পরিচয় চীন ও রুশিয়ার গেরিলা যুদ্ধে। আক্রমণ রীতিরও একরূপ আভাস পাওয়া যায় টোটেল যুদ্ধের মতবাদে, ব্লিৎস্‌ক্রীগের দৃষ্টান্তে; আর অন্য পরিচয় দেখা যায় জাপানী অনুপ্রবেশ-পদ্ধতির (infiltration) সার্থকতায়।

(১) প্রতিরোধ-রীতি

প্রতিরোধের প্রথমোক্ত রীতির অর্থ প্রশস্ত প্রতিরোধ-ক্ষেত্র তৈরি করা ('Defence in Depth')—যেমন, সিগ্‌ফ্রিড লাইন (*The Nature of Modern Warfare*—Cyril Falls, p.41ff.)। (১) এরূপ ক্ষেত্রের একেবারে সম্মুখে থাকে আধ মাইল খানেক চওড়া ফাঁড়ির এলেকা বা outpost zone; এখানে থাকে রাইফেল ও মেসিন গান চালক দল আর মাটিতে পোঁতা ট্যাংক-মারা মাইন। (২) এ এলেকার পিছনে ১ মাইল বা পৌনে ২ মাইল জুড়িয়া কংক্রিট আস্তানার এলেকা বা zone of concrete casemates। প্রত্যেক বর্গ মাইলে এরূপ ২৫।৩০টি কংক্রিট-আস্তানা আছে। (৩) ইহার পরে প্রধান ক্ষেত্র বা main line। অর্থাৎ প্রথম এক সার ট্যাংকের ফাঁদ ও বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা, যেমন এক-এক সার গড়খাই, কংক্রিটের খুটি, লোহার খুটি; তারপর

আবার দ্বিতীয় এক প্রস্ত একের পর এক এমনি ফাঁদ ও ব্যবস্থা। ইহারও পিছনে আবার তৃতীয় এক প্রস্ত এরূপ ব্যবস্থা থাকিবার সম্ভাবনা। (৪) এই প্রধান ক্ষেত্রের শেষে ভূগর্ভস্থ দুর্গমালা। (৫) তাহারও পশ্চাতে প্রত্যাক্রমণের জন্য কয়েক মাইল জুড়িয়া মোটরবাহিত ও যন্ত্রসজ্জিত মজুত বাহিনীর স্থান। সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষেত্র ২০ মাইলের উপর চওড়া। অবশ্য ইহারও পিছনে আরও এইরূপ চওড়া ক্ষেত্রের আয়োজন আছে—প্রয়োজন হইলে তাহাও সুগঠিত করা হইবে। ম্যাজিনো লাইন অবশ্য এতটা প্রশস্ত ছিল না; তাহাতে পরিবর্তন করাও চলিত না। আর তাহা ছাড়া উহা বেলজিয়াম-সীমান্তে বিস্তৃতও ছিল না—ইহা মনে রাখা দরকার।

(২) আক্রমণ-রীতি

এই প্রশস্ত প্রতিরোধ-ক্ষেত্রের কথা মনে করিয়া আর কেহ আক্রমণ-রীতিতে বেশি ভরসা রাখিতে চাহে নাই। ফ্রান্সে ও ব্রিটেনেই এই ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। অন্য দিকে জার্মানীতে ইহার উপযোগী আক্রমণ-রীতিও গড়িয়া উঠে। নাৎসি রাষ্ট্র আক্রমণমূলক সমাবেশের পক্ষপাতী; তাই এই রীতি উহা সানন্দে গ্রহণ করে। ইহাকে বলা চলে যন্ত্র-সজ্জিত আক্রমণ ব্যবস্থা (mechanised attack. দ্রষ্টব্য : *The Nature of Modern Warfare*, Cyril Falls, p. 21ff)। জার্মানরা ইহার মূল লক্ষণের

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই রণকৌশলের নাম দিয়াছেন—বিদ্যুদাক্রমণ বা ব্লিৎস্‌ক্রীগ। ইহার প্রধান কথা ট্যাংক ও বিমান আক্রমণে সহযোগিতা। (১) আকাশ হইতে নীচু-ওড়া বিমান (low-flying) ও ছোঁ-মারা বিমান প্রতিরোধ ক্ষেত্রের উপর বোমা ফেলিয়া, কামান ছুঁড়িয়া, মেসিন গান ছুঁড়িয়া সম্মুখের ফাঁড়ি, বাধা প্রভৃতি শেষ করিবে। (২) মাটি হইতে ভারী ট্যাংক ও যান্ত্রিক বাহিনী ও অন্য যাহা বাধা আছে তাহা চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবে। (৩) দুই-এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিবে বেতার-বার্তা আর ইহাদের কার্যক্ষম রাখিবে কারিগররা। (৪) এই প্রথম তরঙ্গের পশ্চাতে আসিবে মোটরবাহিত পদাতিকেরা, তাহাদের গোলন্দাজ ও ট্যাংকের দলগুলি লইয়া। ততক্ষণ অগ্রবর্তী ট্যাংক ও বিমানের দলের এক তরঙ্গ শত্রুর মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লাইন চূর্ণ করিবে, ভেদ করিবে (break through), আর পদাতিকের দলও এখানে-ওখানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ফাঁকে ফাঁকে গলিয়া একেবারে শত্রুর আস্তানার পিছনে গিয়া হাজির হইবে—তাহার প্রতিরোধক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট (infiltration) হইবে। একদিকে দানবীয় যন্ত্রাঘাত (mechanised attack), আর দিকে এই ছোট ছোট স্বয়ংক্রিয় দলের উদ্যোগ (initiative)—মোটামুটি ইহাই এই আক্রমণ-পদ্ধতি। তবে, ইহার জন্য চাই অতর্কিতে (sudden) আক্রমণ,—যেন শত্রু আর সামলাইবার সময় না পায়; চাই টাইম-টেব্‌ল বাঁধিয়া সমস্ত আক্রমণ নির্বাহ করা। আর সর্বোপরি চাই দুর্বার ও অভাবনীয়

গতিবেগ—যেন চোখের পলকে সমস্ত শেষ করা যায়। জেনারেল গুডেরিয়ান-এর কথিত এইরূপ আক্রমণের চিত্র এত উল্লেখিত হইয়াছে যে, তাহা আর না উল্লেখ করিলেও চলে।

(১) টোটেল যুদ্ধ—জার্মান মতবাদ

টোটেল যুদ্ধের এই যান্ত্রিক রূপ কিন্তু ফন্ লুডেন্‌ডর্ফ কল্পনা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি টোটেল যুদ্ধের দুইটি কথার উপরই বেশি জোর দেন; যেমন (১) ধ্বংসের ও ত্রাস-সঞ্চারের দিকে—ইহা শত্রুকে মূলে আঘাত করিবে। (২) সংগঠনের বা যুদ্ধসজ্জার (mobilization) দিকে—ইহাতে জাতির সমস্ত শক্তি যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই সজ্জিত ও প্রস্তুত হইবে। প্রথমটির অর্থ, শত্রুর দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে, সেখানে 'পঞ্চম বাহিনী' তৈয়ার করিবে, প্রচারের দ্বারা শত্রুর মানসিক অবনতি ঘটাইবে (হল্যাণ্ড, নরওয়েতে ও বল্‌কান রাজ্যগুলিতে জার্মানী ইহা সার্থক করিয়া তোলে); দ্বিতীয়ত, নিজের দেশে জাতির যোদ্ধা-অযোদ্ধা সকলে যুদ্ধের কার্যে নিযুক্ত হইবে, এবং তদনুযায়ী জাতির প্ল্যানিং ও সংগঠন হইবে—যুদ্ধ হইবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। কিন্তু টোটেল যুদ্ধের সমাবেশ ইহাতেও সম্পূর্ণ দেখা যায় না, ইহার রণকৌশলও ইহাতে স্থির হয় নাই। তাহা স্থির করিলেন জার্মান সমর-গবেষকরা। ইহারাই বুঝিলেন—যন্ত্রযুগে মোটর ট্যাংক ও বিমানের জন্য যান্ত্রিক যুদ্ধের অভূতপূর্ব সুযোগ হইয়াছে। তাই টোটেল যুদ্ধের

ষ্ট্র্যাটেজিতে আদরণীয় হইল গতিশীলতা (dynamism), ধ্বংস, প্রচার ও বিশ্বাসঘাতকতা; আর উহার পরিকল্পনা হইয়া উঠিল পৃথিবী-জোড়া। ট্যাক্‌টিক্‌স বা রণকৌশলে এই সব উপায় গৃহীত হইল—যেমন, প্রচার, গুজব, ধাপ্পা দিয়া শত্রুর সাধারণ লোককে ভীত করিয়া তোলা,—তাহারাই যেন শত্রুর সমর-সজ্জা বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে,—ফ্রান্‌সে ইহাই ঘটে। দ্বিতীয়ত, পঞ্চম বাহিনী দ্বারা শত্রুর সমর-সজ্জা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলা—হল্যাণ্ড, নরওয়েতে তাহাই হয়। আর তৃতীয়ত, প্যারাশুটে শত্রুর সৈন্যদের পিছনে নিজের দক্ষ সৈন্য নামাইয়া শত্রুর ঘাঁটি দখল করা, পথ-ঘাট নষ্ট করা ইত্যাদি।

(২) প্রতিরোধ-বাদী যুদ্ধ—ব্রিটিশ ও ফরাসী মতবাদ

এই জার্মান মতবাদে কয়েকটি প্রশ্নের আপন হইতেই উত্তর মিলিয়া যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে এই সব প্রশ্ন লইয়া ইউরোপের সামরিক চিন্তায় অনেক আন্দোলন চলিয়াছিল। আক্রমণ না প্রতিরোধ—এই প্রশ্ন তাহার মধ্যে প্রধান। মনে রাখিবার কথা এই যে, যাঁহারা প্রতিরোধের পক্ষপাতী তাঁহারাও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক-সজ্জার (Mechanisation) পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্‌স ও ব্রিটেন তবু যান্ত্রিকতাবাদীদের কথায় মনোযোগ দেয় নাই (ইংলণ্ডে এই যন্ত্রযুদ্ধবাদীদের বলিত 'futurists')। তাহা ছাড়া ফ্রান্‌স ম্যাজিনো লাইনও উত্তর দিকে সম্পূর্ণ করে নাই। আর

জাতীয় সংগঠনে এই সব দেশ একেবারে ঘুণে-ধরা হইয়া গিয়াছিল। কাজেই, প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ-পদ্ধতির পক্ষে এখনো তাহাদের সাফাই গাহিবার আছে। তবে আক্রমণমূলক যুদ্ধ-পদ্ধতি যে নিষ্ফল নয়—এ যুগের যুদ্ধে তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র, না বৃহৎ বাহিনী

টোটেল যুদ্ধে প্রতিরোধবাদীদের কয়েকটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন একেবারে উড়িয়া যায়—যেমন প্রথমত, 'বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ' বা আর্থিক আক্রমণ ও প্রচার দ্বারা যুদ্ধ-মীমাংসার প্রস্তাব। টোটেল যুদ্ধে আর্থিক আক্রমণ সর্বাংশেই চাই; সঙ্গে সঙ্গে চাই যান্ত্রিক যুদ্ধের আরও ভয়ঙ্কর প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ গবেষক ফুলার ও লিডেল হার্ট, ফ্রান্সের দ্যগল, জার্মানির নাৎসি-পূর্বযুগের সমর-গবেষক ফন্ সীকৃট (Von Seect) ইহারা সকলেই ছিলেন যন্ত্রাস্ত্র-সজ্জিত ক্ষুদ্রতর বাহিনীর পক্ষপাতী—বিপুল সংখ্যক জন-সমারোহের বিরোধী। ট্যাংক ও বিমানে সেই ক্ষুদ্রতর বাহিনী হইবে দক্ষ, আর সৈনিকবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অন্যান্য জনগণ তাহাদের জোগাইবে শ্রমিকরূপে সেই ট্যাংক, বিমান, আর্টিলারি প্রভৃতি। এক-একটা ট্যাংকই যখন এক-এক সশস্ত্র পল্টনের সমান তখন সৈনিকের কাজে অত লোক টানা মানে জাতীয় জনশক্তির অপচয়। টোটেল যুদ্ধ কিন্তু তাহা মোটেই মানিল

না। উহা যন্ত্রাস্ত্রও বাড়াইল, আর বিপুলতম জন-সমাজকে সৈন্যে পরিণত করিল। নেপোলিয়নের মন্ত্র—mass multiplied by movement—ইহারও মন্ত্র।

সমুদ্রশক্তির ভবিষ্যৎ

দুই-একটি সুবৃহৎ প্রশ্ন কিন্তু অর্ধ মীমাংসিত হইয়া আছে। বিমানের আবির্ভাবে অন্য সব বল নিষ্প্রয়োজন হইবে—দুয়েব এই মতবাদ অবশ্য মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। 'নৌবল কি বিমানের যুগে নিরর্থক হইবে?'—এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হইতেছে। নৌবল বিমানের শক্তি মানিয়া উহাকে আপনার করিয়া লইতেছে, সামুদ্রিক বিমানে, জঙ্গী বিমানে নিজেকে নূতন উপায়ে সজ্জিত করিতেছে (দ্রষ্টব্য—'বর্তমান যুদ্ধে নৌবল' প্রবন্ধ—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, সমসাময়িক, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৭)। প্রমাণিত হইয়াছে বরং এই কথা যে, কি জলে, কি স্থলে বলের সুযোজন (co-ordination) চাই (দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৯)। তবু যে প্রশ্ন রহিয়া গেল তাহা এই: সমুদ্র-শক্তি কি সমশ্রেণীর স্থল-শক্তির অপেক্ষা সত্যই প্রবল? কারণ, যুদ্ধ শুধু আর বাঘে-কুমীরের, বা হাতী ও তিমির লড়াই নাই—মহাকায় ঈগল যে আসিয়া জুটিয়াছে।

অন্য প্রশ্নটি এই যে—যন্ত্র কি সত্যই আজ বিধাতা? যুদ্ধে কি মানুষের মনুষ্যত্বের কোনো শক্তি নাই?

মনুষ্যত্বের স্থান—সোভিয়েট মতবাদ

এই প্রশ্নেরই উত্তর লেখা হইয়াছিল সোভিয়েটের সামরিক মতবাদে। টোটেল যুদ্ধের সর্বব্যাপী সংগঠন ও যন্ত্র-সজ্জা সর্বাগ্রে সেখানেই অনুসৃত হয়—যদিও তখনো সোভিয়েট দেশ যন্ত্রশিল্পে বেশি উন্নত হইতে পারে নাই। অতএব, সোভিয়েট মতবাদের বক্তব্য এই যে, (১) সর্বব্যাপী যন্ত্রসজ্জা ও জন-সংগঠন গ্রহণ করিতেই হইবে; ইহার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা চাই। বস্তুর উপরেই জীবনের বনিয়াদ। কিন্তু লক্ষ্যের দিক হইতে দেখিলে সোভিয়েট মতবাদ টোটেল যুদ্ধবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। (২) শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করা তাহার নীতি নয়, বরং শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করিতে পারিলে স্বপক্ষভুক্ত করাই তাহার যুদ্ধোপায়। কারণ সোভিয়েট-দৃষ্টিতে সাধারণ সৈনিক জন-সমাজের, অতএব মূলত জনগণের স্বপক্ষীয়। আর শত্রুর জন-সাধারণ তো নিশ্চয়ই শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের সগোত্র। অতএব 'ধ্বংস করা' অপেক্ষা সোভিয়েটের লক্ষ্য হইল শত্রুপক্ষকে বিভক্ত করা,—তাহার শাসক-শক্তি হইতে তাহার জন-শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা। শত্রুর দেশে ভেদ বপন করা অবশ্য প্রত্যেক যোদ্ধরাষ্ট্রেরই একটা উদ্দেশ্য। টোটেল যুদ্ধের জন্যও পূর্বাহ্নেই পঞ্চম বাহিনী ও কুইস্লিংদের দরকার হয়। প্রশ্ন হইবে—এই পদ্ধতির সহিত তাহা হইলে সোভিয়েট মতবাদের তফাত কোথায়? তফাত এই যে, টোটেল যুদ্ধ পঞ্চম বাহিনী ও কুইস্লিং খোঁজে শত্রুর শাসক-শ্রেণীর মধ্যে;—ইহাই ফ্যাশিস্ত

Grand Strategy-র একটি চেষ্টা। আর সোভিয়েট দেশ চাহে শত্রুর জন-সমাজকে স্বপক্ষে টানিতে ;—ইহাই সোভিয়েট Grand Strategy-র চেষ্টা। এই জন্যই (৩) সোভিয়েট মতবাদে যোদ্ধার লক্ষ্য হয় শত্রুর জনমত লাভ করা (to gain public opinion), টোটেল যুদ্ধের মত তাহাকে সমূলে ধ্বংস করা নয়। ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তাই সোভিয়েট নিজ ধ্বংসশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে নাই ; এবং মেনারহাইম লাইন চূর্ণ করিয়াও যুদ্ধশেষে তাই সে কঠিন শর্ত আদায় করে নাই। তাহার আশা ছিল ফিন্‌দের জনমত জয় করিবার। অবশ্য এই জনমত জয় করিবার পক্ষে সোভিয়েটের প্রধান অস্ত্র প্রচার, অশ্রান্ত প্রচার, পৃথিবী-ব্যাপী প্রচার। কারণ তাহার দৃষ্টিতে পৃথিবীর জনগণ সকলেই তাহার মিত্র, পরস্পরের আত্মীয়ও ; শত্রু শুধু উহাদের শাসক-শ্রেণী ; দেশে-দেশে যুদ্ধ বাধায় শাসকেরা। অতএব (৪) সোভিয়েটের সামরিক দৃষ্টিতে তাহার যুদ্ধের উদ্দেশ্য যুদ্ধ বন্ধ করা—'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। এইজন্য এক দিকে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে উপস্থিত মতো কঠিনতম অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, আর অন্য দিকে জনগণকে করিতে হয় এ বিষয়ে সচেতন। মানুষকে সচেতন করা—শত্রু পক্ষকেও সচেতন করা—আর নিজ সেনাকেও সচেতন করা—ইহাই সোভিয়েট যুদ্ধনীতি। (৫) এই জন্যই সোভিয়েট সেনা-বাহিনীর যেমন অস্ত্রসজ্জায় হয় উন্নত ধরণের,—তেমনি আবার তাহার সঙ্গে থাকে—রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা (Political Commissar)। তাহার সৈন্যদল Partisan

Army—অবশ্য হিট্‌লারের সৈন্যদলেও এই পন্থাই গৃহীত হইয়াছে, নাৎসি উপদেষ্টারা তাহাদেরও প্রচার-প্রবুদ্ধ করে। এই জন্যই তাহারা দুর্বার—তাহারাও পৃথিবীতে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্বুদ্ধ। তাহা হইলে এই দুই পদ্ধতিতে তফাত কোথায়? তফাত এই যে, সোভিয়েটের আদর্শ জন-কল্যাণ, আর নাৎসির আদর্শ শ্রেণী-সমৃদ্ধি; নাৎসি প্রচার মূলহীন, নর্ডিক রক্তের বড়াই-এর উপর গঠিত। যুদ্ধ বেশি দিন চলিলে উহা ভাঙিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু সোভিয়েটের জন-মৈত্রীর আদর্শের সে ভয় নাই। যুদ্ধের মধ্য দিয়া ক্রমশই জনগণের চেতনা ফুটিয়া উঠে। তাহা ছাড়া, নাৎসি-আদর্শ জার্মান জনগণকে না হয় ভার্সেইর নামে উদ্বুদ্ধ করে; উহাতে হ্যাঙ্গেরির, রুমানিয়ার, স্লোভাকিয়ার, কিংবা মিশর, তুর্ক, চীন, ভারতের জনগণ প্রেরণা পাইবে কিরূপে? অন্য দিকে সোভিয়েট আদর্শ যেমন রুশিয়ার জনগণের আপনার জিনিস, তেমনি পৃথিবীর সর্বদেশের জনগণেরও প্রাণের বস্তু; উহার বন্ধু-সমাজ তাই দিনে দিনে বাড়িতে পারে, কমিতে পারে না। বিকৃত আদর্শেও যে সৈন্যগণ কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহার প্রমাণ ফ্যাশিস্ত বাহিনী। আর পূর্ণ আদর্শের প্রেরণা যে যন্ত্রের নিকট পরাজিত হয় না, তাহার প্রমাণ রুশ-বাহিনী, চীনের গেরিলা-বাহিনী। আদর্শ বৃহৎ ও মহৎ হইলে সৈন্যবাহিনী চলে নূতন প্রেরণায়—যেমন চলিয়াছিল নেপোলিয়নের বিপ্লবী-বাহিনী; যেমন চলিয়াছে চীনের বাহিনী, রুশের বাহিনী। যে যুদ্ধে বিপ্লবীপ্রেরণা যত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে,

সে যুদ্ধে মানব-শক্তির অপরাজেয়তাও ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে।

এই যুগের যুদ্ধ মাত্রই টোটেল। উহাতে সর্বাঙ্গীণ রণসজ্জা চাই। কিন্তু সোভিয়েটের সামরিক মতবাদে যুদ্ধ হইয়াছে শুধু সর্বাঙ্গীণ নয়, সার্বজনীন—সর্বদেশের জনগণকে উহা স্বপক্ষে আনিতে চায়। এই হিসাবেই বলা চলে—নাৎসি টোটেল যুদ্ধ মানুষকেও যন্ত্রে পরিণত করিয়া চালায় যন্ত্রযুদ্ধ (Mechanised War), আর সোভিয়েট যুদ্ধনীতি মানুষকে যন্ত্রে সজ্জিত করিয়া চালায় জনযুদ্ধ। যন্ত্রসজ্জা উভয়েরই সমান কিনা, কতটা যন্ত্রসজ্জার অভাব কতটা নৈতিক প্রেরণায় কাটাইয়া উঠিতে পারে, বিকৃত আদর্শ ও বিকৃত প্রচার বৃহৎ আদর্শ ও মহৎ প্রেরণার সমতুল্য কিনা—এই সব প্রশ্নের পরীক্ষা হইতেছে এ যুগের যুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইতেছে—বৈপ্লবিক শক্তি সত্যই অবাধ প্রকাশের পথ পাইল কিনা।
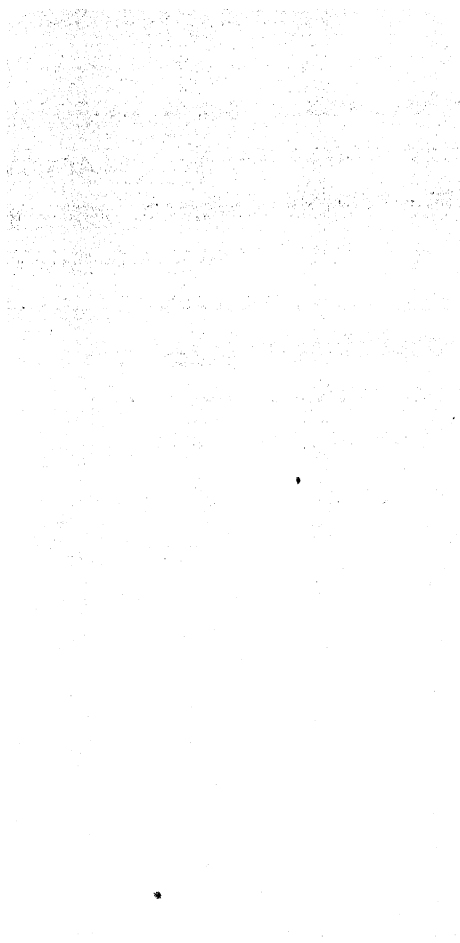
যুদ্ধের গতিধারা

এক

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

এ যুগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল পোল্যাণ্ডে—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। পুরানো সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মানির নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে তোষণ-নীতি পরিত্যাগ করিল। হের হিটলার হয়তো ভাবিয়াছিলেন—চেকোস্লোভাকিয়ার মতই পোল্যাণ্ড একবার দখল করিয়া বসিলে ব্রিটেন বা ফ্রান্স প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে, যুদ্ধের কথা আর ভাবিবে না। কিন্তু তাহা আর হইবার এখন সম্ভাবনা ছিল না। হিটলার সোভিয়েট দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি করায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স আর তাঁহার তোষণের জন্য ব্যস্ত হইল না—তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাই যুদ্ধ ক্রমশ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দুই পক্ষে শক্তিপুঞ্জ সংযুক্ত হইল, War of Coalitions শুরু হইল।

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের পূর্ণ সমাবেশের একটা আভাস আমরা এতদিনে পাইয়াছি। চক্রশক্তির এই সমাবেশ পরিষ্কার ও সুস্থির—প্রথমত ইউরোপ ভূখণ্ডে নাৎসি-ফ্যাশিস্ত আধিপত্য স্থাপন করা, পরে সমগ্র পৃথিবীতে ফ্যাশিস্ত-ব্যবস্থা ("New Order") প্রতিষ্ঠা করা। ইহার জন্য তাহাদের পদ্ধতি ছিল এইরূপ—এক-এক করিয়া এক-একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে অস্ত্রবলে বা অস্ত্রপ্রয়োগের

ভয়ে গ্রাস করা। তাই একই সময়ে একাধিক রণাঙ্গনে যুদ্ধ যাহাতে বিশেষ না করিতে হয় বরাবর চক্রশক্তি সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। আজও তাহাই তাহার একটা বড় ষ্ট্র্যাটেজি। এই দুই দিকেই 'সম্মিলিত শক্তিদের' ত্রুটী ছিল, এমন কি এখনো আছে। এই সম্মিলিত শক্তিরা রাষ্ট্রীয় সংগঠনে ও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে সমধর্মী নয়—তাই যুদ্ধে তাহাদের লক্ষ্যও সর্বাংশে একরূপ কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। বিশেষ করিয়া ব্রিটেন কতটা আপনার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায় আর কতটা চায় পৃথিবীতে গণতন্ত্রের জয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। আটলাণ্টিক ঘোষণায় সম্মিলিত শক্তিরা নিজেদের যুদ্ধোদ্দেশ্য একবার ব্যক্ত করেন; কিন্তু ব্রিটেন সর্বাংশে তাহাতে বিশ্বাস রাখে কি? ভারতবর্ষের ব্যাপারে তাহার মনোভাবে এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, ব্রিটেনের শাসকবর্গের মধ্যে হিটলার-মুসোলিনির পূর্বতন স্তাবকবর্গ এখনো কম প্রবল নয়। তাই ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্বন্ধেও সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। ইহার জন্যই আজ পর্যন্তও ব্রিটেনের ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার অনিচ্ছা বা অক্ষমতা নানা সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ দ্বিতীয় ফ্রণ্টের অভাবে প্রকৃত পক্ষে জার্মান ষ্ট্র্যাটেজিই জয়যুক্ত হইতেছে—হিটলারের লক্ষ্য এক-এক করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করা, তাহাই সাথক হইতে চলিয়াছে। সত্যসত্যই সম্মিলিত শক্তি আজ পর্যন্ত কোন 'সম্মিলিত ষ্ট্র্যাটেজি' (United Strategy) প্রণয়ন করিতে পারিয়াছেন কিনা, এখনো বুঝা যায় না।

পূর্ণসমাবেশের দিক হইতে চক্রশক্তিরও একটি ত্রুটী গোড়া হইতেই রহিয়াছে। হিটলার যুদ্ধ কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছেন না। পোল্যাণ্ডের পরে একবার তিনি শান্তির চেষ্টা করেন, তাহা ব্যর্থ হয়। ফ্রান্সের পতনের পরে আবার সেইরূপ আভাস দেওয়া হয়। ব্রিটেন তখন একা, বিপন্ন; তবু যুদ্ধ সে ত্যাগ করিল না। তাহার পর বিমান যুদ্ধেও ব্রিটেন পরাস্ত হইল না। তখন আর এক চমকপ্রদ কৌশলে ব্রিটেনের এবং আমেরিকার শাসক-শ্রেণীকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা হইল। হের হেস ব্রিটেনে নামিলেন আর অন্যদিকে নাৎসি-বাহিনী সমস্ত চুক্তি ভাসাইয়া দিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিল সোভিয়েট দেশ। অর্থাৎ হিটলার যেন আবার ১৯৩৯-এর আগষ্টের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া গেলেন। যুদ্ধের যখন মোড় ঘুরিল, তখন হিটলারের সহিত ব্রিটেনের আবার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে বাধা কি? বাধা অনেক ছিল—এই দুই বৎসরের ইতিহাস। পরে আমেরিকাও যুদ্ধে নামিয়া পড়িল। এখন এই যুদ্ধের শেষ-সীমা হিটলারের দৃষ্টির অগোচর। এইখানেই তাঁহার পূর্ণসমাবেশের প্রধান নিষ্ফলতা। যুদ্ধ তিনি আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ করিবার শক্তি আর তাঁহার নাই।

(১) পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ

জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণ আকস্মিক নয়, কাজেই পোল্যাণ্ডেরও প্রস্তুত থাকিবার কথা। পোল্যাণ্ড সত্যই প্রস্তুত ছিল—তবে সেই প্রস্তুতি উল্টা রকমের। কূটনীতিক ক্ষেত্রে পোল্যাণ্ডের বেক্‌, রিড্‌জ-স্মিগ্‌লি প্রভৃতি শাসক-শ্রেণী ইতি-পূর্বেই পোল্যাণ্ডকে প্রায় বিসর্জন দিয়াছিলেন। সোভিয়েট-বন্ধুতা ও সাহায্য ইহারা বরাবর প্রত্যাখ্যান করিয়া চলেন—শেষদিকে ব্রিটিশ-ফরাসী সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই হয় ইহাদের ভরসা। কি ভাবে, কি পরিমাণে সেই সাহায্য আসিবে সেই সব কথা পোল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও ফ্রান্স কেহই স্থির করিল না।

তবু পোল্যাণ্ড ছিল প্রস্তুত। আর শুধু প্রস্তুত নয়, একেবারে আক্রমণ-মূলক যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত। পোল্যাণ্ড তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি, উহার প্রায় তিন দিকে জার্মানদের রাষ্ট্র। দেশে কলকারখানা প্রায় নাই। তাই ট্যাংক বিমান প্রভৃতিও পোল্যাণ্ডের প্রায় ছিল না। উহার মোট বল ছিল এইরূপ—বিমান ৬০০ খানেক, সামান্য যন্ত্র-সজ্জিত সেনা মোট ১ ব্রিগেডের মত; ১৫টি অশ্বারোহী ব্রিগেড ও মোট ৪০।৪৫টি পদাতিক ডিবিশান। এই সৈন্য লইয়া পোলরা একেবারে প্রায় জার্মান-সীমান্তে বসিয়া ছিল। উদ্দেশ্য—করিডোর দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্ব প্রুশিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে, পোসেন হইতে জার্মানির মধ্যস্থল আক্রমণ করিবে। তাহাদের ভরসা—সচল পোল অশ্বারোহী দল। বলা

যাইতে পারে এই ছিল পোল ষ্ট্র্যাটেজি বা সমর-সমাবেশ—সর্ব রকমে দুর্বল পক্ষ গ্রহণ করিতেছিল সর্ব রকমে সবল পক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ-মূলক যুদ্ধপদ্ধতি। এ যেন মরণবুদ্ধি।

এদিকে জার্মানির সমাবেশ ছিল দুর্ধর্ষ। তাহার কূটনীতিক জয় সম্পূর্ণ হয় সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুতায় ২৩শে আগষ্ট। পশ্চিমে সুরক্ষিত অঞ্চলে ফ্রান্সকে ঠেকাইবার মত কিছু সৈন্য রাখিয়া সে পোল্যাণ্ডকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রয়োগ করিল প্রায় ২,৩০০ বিমানের ফ্লিট, ৪৫ ডিবিশন পদাতিক, ৫ ডিবিশন পান্‌ৎসার বা ট্যাংক, ৪টি হাল্‌কা যান্ত্রিক ডিবিশন, ৬ ডিবিশন মোটরবাহিত পদাতিক। মাথা-গুণ্‌তিতে তো বেশিই, তাহা ছাড়া পোল্যাণ্ডের মধ্যযুগের অস্ত্র-সজ্জার তুলনায় জার্মানবাহিনীর বর্ষণাস্ত্র (fire-power) ও সচলতা (mobility) ছিল বহু বহু গুণ। অতএব আঠারো দিনে পোল্যাণ্ডের নাম মুছিয়া গেল।

জার্মানির সমাবেশ ছিল পরিচ্ছন্ন—যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই জার্মান বিমানবহর বা লুফ্‌ৎভাফে পোল্যাণ্ডের বিমান সমূহ মাটিতেই ধ্বংস করিবে। এদিকে পূর্ব-প্রুশিয়ায় ছিল তৃতীয় আর্মি। জেনারেল কুয়েখলার (Kuechler) ও ট্যাংক-বিশারদ গুডেরিয়ান (Guderian) সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন—একেবার ওয়ারসর পিছনে গিয়া পোল বাহিনীকে তাঁহারা পরিবেষ্টন (encirclement) করিবেন। ততক্ষণে চতুর্থ আর্মি উত্তর-জার্মানির পোমারিনা হইতে জেনারেল ফন্ ক্লুগের (Kluge) নেতৃত্বে করিডোর ভেদ করিয়া আসিয়া এই তৃতীয় আর্মির সহিত

মিলিবে। অষ্টম আর্মি জেনারেল ব্লাস্‌কোভিংসের (Blasko-witz) নেতৃত্বে ও দশম আর্মি জেনারেল রাইখেনাউর (Reiche-nau) চালনায় জার্মান-পোল সীমান্তের মধ্যভাগে ছিল; পোসেন হইতে রেডম (Radom) পর্যন্ত সমস্ত পোল-সন্নিবেশ ইহারা ছিন্নভিন্ন করিবে। সকলের দক্ষিণে ছিল জেনারেল লিষ্টের (List) নেতৃত্বে চতুর্দশ আর্মি। গালিসিয়ায়ে পোল বাহিনীকে ইহা পার্শ্ববেষ্টন করিবে, উহাদের ডাহিনে রাখিয়া ওয়ারসর পিছন দিকে গিয়া উঠিবে—সর্বোত্তর ও সর্ব-দক্ষিণের দুই জার্মান আর্মি পোলদের এইরূপে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টন করিবে। এই জার্মান-সমাবেশ ছিল ক্যান্নির যুদ্ধের অনুরূপ—ইহাই পূর্বযুদ্ধেও পোল্যাণ্ডে ছিল তাহাদের যুদ্ধ-প্ল্যান। এবার সীমান্তে সরু সারে পোল-বাহিনীকে পাইয়া এখন জার্মান সেনাপতিরা যেন বাঁচিয়া গেল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই পোল বিমান-ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হইল,—পোল-বিমান আকাশে উড়িল না। সৈন্যদের পিছনে ব্রেস্ট-গ্রোড্‌নো এই অঞ্চলের পথ-ঘাট বিনষ্ট হইল। জার্মান পান্‌ৎসার ও হালকা যান্ত্রিক বাহিনী (শেল সেনা বা সত্বর সেনা) সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে অগ্রসর হইল। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে এই সীমান্তের যুদ্ধ শেষ হইল ৪ দিনেই; তখনি পূর্ব-প্রুশিয়ায় জার্মান তৃতীয় ও চতুর্থ আর্মি মিলিত হইল। ৫ই হইতে ১০ইর মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়। জার্মান ট্যাংক, যান্ত্রিক বাহিনী, মোটর-বাহিত পদাতিক পোলদের ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চালের পর চালে

(manoeuvre) দুর্বার গতিতে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল,—তখনি তাহারা পোল্যাণ্ডের ভিতরে ১২৫—১৭৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। অষ্টম আর্মির 'সত্বর সেনারা' ৯ তারিখেই একবার গিয়া ওয়ারসর দুয়ারে হানা দিল; কিন্তু ওয়ারসর জনগণের
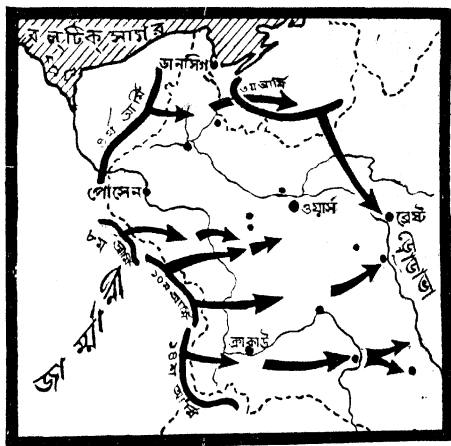
প্রতিরোধে তাহারা বাধা পাইয়া ফিরিয়া গেল। ১১ই—১৮ইয়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায় ও যুদ্ধ শেষ—তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম আর্মির হাতে তখন বুগ ও ভিশচুলার (Vistula) বাঁকে ৯ ডিবিশান পোল সৈন্য প্রাণপণে লড়িয়া বন্দী হইল। অন্যদিকে উত্তরের তৃতীয় আর্মির ট্যাংক-সৈন্যরা ব্রেষ্টে (Brest) নামিয়া আসিল,

দক্ষিণের দশম বাহিনীর পুরোভাগের সঙ্গে সম্মিলিত হইল; ফলে সমস্ত পোল-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইল। আঠারো দিনের পরে বাকী রহিল ওয়ারসর অদম্য পৌর-সেনাদের ধূলিসাৎ করা, ওয়ারস-ব্রেষ্ট-লুবলিন (Lublin) এই ত্রিকোণ ভূভাগের সেনাদের নিঃশেষ করা। ততক্ষণে পোল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী নিজেদের ধনদৌলত লইয়া পালাইতে শুরু করিয়াছেন। সমস্ত পোল্যাণ্ড যে হিটলারের খর্পরে গেল না তাহার কারণ—১৭ই তারিখে সোভিয়েট বাহিনী আসিয়া পোল্যাণ্ডের অধিকৃত শ্বেত-রুশিয়া ও উক্রেইনের অংশ দখল করিয়া বসিল।

এই পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ—এ যুগের প্রথম যুদ্ধ, প্রথম ব্লিৎস্‌ক্রিগ্‌। চোখ থাকিলে ইহাতে মিত্রশক্তিদের চোখ ফুটিবার কথা। দেখিতেন—(১) স্থাণুযুদ্ধের (War of Position) স্থলে আজ সচল যুদ্ধ (War of Movements) দেখা দিয়াছে; (২) বিদ্যুৎ আক্রমণের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে :—(ক) ইহার বিমান, বিমান ও ট্যাংকের সহযোগিতা, (খ) যান্ত্রিক বাহিনীর সকল বিভাগের সংযোজনা (co-orination), (গ) ব্যূহভেদ, পার্শ্বভেদ, পরিবেষ্টন। —এইরূপে চোখের উপর পোল বাহিনী ধ্বংস হইয়া গেল। (৩) ইহারই মধ্যে মনে রাখিবার কথা—৯ই ওয়ারসর নাগরিকদের হাতে রেনেহার্টের দুর্জেয় যান্ত্রিক বাহিনীর পরাজয়। ইহার নির্দেশই বা কাহার চোখে পড়িবে?

(২) শীতের যুদ্ধ ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ

পোল্যাণ্ডের পরেও ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিকদের চোখ খুলিল না। শীতের আট মাস তাঁহারা বসিয়া বসিয়া যুদ্ধের তোড়জোড় করিলেন। ম্যাজিনো লাইনে সৈন্য দল ঝিমাইতে লাগিল। যাঁহারা প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধের পাণ্ডা তাঁহাদের কথায় বরং এই বিশ্বাসটাই প্রশ্রয় পাইল যে, যুদ্ধ স্থাণুযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, জার্মানির তিন গুণ বল নাই, সে আক্রমণমূলক যুদ্ধে তাই নামিবে না। মিত্রশক্তির কূটনীতিজ্ঞরা ভাবিলেন—যুদ্ধটাকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে—মধ্যপ্রাচ্য হইতে বাকুর তেলের খনিতে বিমান আক্রমণ চালানো যায় না? এদিকে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধও বাধিয়া গেল। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ভাবিলেন—সুযোগ আসিয়াছে, ফিন্‌দের সাহায্যের নামে সোভিয়েটের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বাধানো যাইবে। সেই সুযোগ অবশ্য শেষ হইয়া গেল—কিন্তু এই আট মাসে জার্মানি কি করিয়াছে, তাহার আভাসও ইহারা পান নাই।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হয় ৩০শে নবেম্বর (১৯৩৯)—যুদ্ধ প্রায় শেষ হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪০), সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ১৩ই মার্চ (১৯৪০)। এই যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় দিকটাই পৃথিবীর চোখে বড় হইয়া উঠে। সেই সম্পর্কে আজ বোধ হয় ততটা আর ভুল নাই:—(১) মেনারহাইম্ ও ফিন্ শাসকশ্রেণী যে নাৎসিদের সহযোগী হইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাতেও আর

সন্দেহ নাই। (২) সোভিয়েট যে বাল্‌টিক অঞ্চলে নিরাপদ হইতে চাহিয়া দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিল তাহাও স্পষ্ট। (৩) সোভিয়েট যে দাবি করিয়াছিল অল্প, আর সন্ধিকালে ফিন্‌দেরও সহজেই নিষ্কৃতি দেয়, তাহা আরও পরিষ্কার। (৪) বরং ইহাই আজ দুঃখ যে, সে সময়ে পৃথিবীর ভ্রান্ত মতের দিকে না তাকাইয়া সোভিয়েটের উচিত ছিল মেনারহাইম্‌ প্রমুখ শাসকশ্রেণীকে বিতাড়িত করিয়া সত্যকার ফিন্‌ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা; তাহা হইলে আজ আবার ফিন্‌রাষ্ট্র নাৎসিদের সহযোগী হইতে পারিত না। অবশ্য এই দিকে বাধা ছিল—ফিন্‌ জনমত সোভিয়েটের স্বপক্ষে ছিল না—যদিও সোভিয়েটের খবর ছিল এই যে, জনগণ তাহাদেরই স্বপক্ষে, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। এই সংবাদের জন্যই রুশ সমরসজ্জাও প্রথম দিকে সামান্য হইয়াছিল।

ফিন্‌যুদ্ধের সামরিক গুরুত্ব কেহই লক্ষ্য করিতে চাহে নাই। মেরুমণ্ডলের শীতের যুদ্ধ হিসাবে ইহা নূতন। দেশ ও কাল ছিল ব্লিৎস্‌ক্রীগের অযোগ্য। ফিন্‌দের পিছনে ছিল যাতায়াতের সুযোগ। অন্য দিকে ফিন্‌ সীমান্ত ছিল সোভিয়েটের লেলিনগ্রাদ-মুরমান্‌স্ক রেলপথ হইতে ৫০।১৫০ মাইল দূর—লাল-ফৌজের পক্ষে সে সীমান্ত সুগম ছিল না। তাহার উপর লাডোগা হ্রদ হইতে ফিন্‌ উপসাগর পর্যন্ত ছিল সুদৃঢ় মেনারহাইম্‌ লাইন। ১১ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সোভিয়েট আক্রমণে উহা ছিন্ন হয়। এ যুগের যুদ্ধে লাইন-ভেদের পদ্ধতি এই প্রথম দেখা গেল—ফরাসী কর্তৃপক্ষের বুঝা উচিত ছিল ম্যাজিনো লাইনও দুর্ভেদ্য
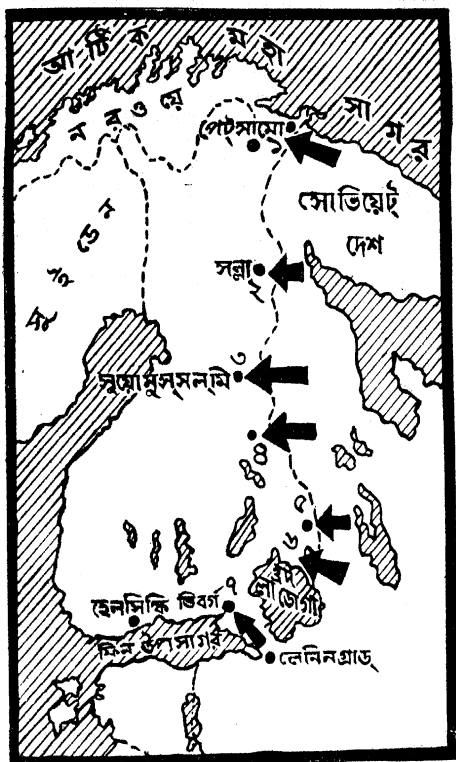
ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ—রুশ আক্রমণের প্রথম দিক

রহিবে না। মোটের উপর ফিন্‌যুদ্ধের দুই অধ্যায়—প্রথম অধ্যায়ে রুশিয়া পাঁচ-সাত অঞ্চল হইতে আক্রমণ চালায়—প্রত্যেক অঞ্চলে বোধ হয় দুই-এক ডিবিশান মাত্র সৈন্য ছিল,—উত্তরে পেট্‌সামো (Petsamo), তাহার পর সল্লা (Salla), সুয়োমুস্‌সাল্‌মি (Suomussalmi), আর শেষে মেনারহাইম্ লাইনের দুই প্রান্তে। মনে হইল, সল্লা বা সুয়োমুস্‌সাল্‌মি দিয়া অগ্রসর হইয়া রুশিয়া ফিন্‌দেশ মধ্যভাগে দ্বিখণ্ড করিব। মেনারহাইমের সুশিক্ষিত সেনা তাই সেদিকে ছুটিয়া যায়, দুই ডিবিশান সোভিয়েট বাহিনীকে তাহারা পর্যুদস্ত করে। ইহার মূল্য সামান্য। কিন্তু ইহাতে লাল-ফৌজের যুদ্ধশক্তি সম্বন্ধে জার্মানি ও ব্রিটিশ উভয় পক্ষই সন্দিহান হইয়া উঠে। ততক্ষণে লালফৌজের সমাবেশ ক্রমশ পরিস্ফুট হয়—১লা ফেব্রুয়ারী মেনারহাইম্ লাইনের উপর যন্ত্রসজ্জিত লালফৌজের আক্রমণ আরম্ভ হয়—অথচ সল্লার ফিন্‌বাহিনী তখন সল্লাতেই আটকা পড়িয়া রহিল। এদিকে বিমানের ও দূরপাল্লার কামানের গোলায় লাইন চষিয়া ফেলা চলিল, ট্যাংকে পদাতিকে সমান তালে আক্রমণ শুরু হইল। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়। পাঁচ দিনে (১১ই-১৬ই) সুম্মায় (Summa) সে লাইন বিচ্ছিন্ন হইল। অন্য দিকে হগ্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ (Hogland) হইতে বরফ-ঢাকা ফিন্ উপসাগরের উপর দিয়া লাল পদাতিক-বাহিনী কোৎকার (Kotka) পূর্বে আসিয়া নামিল; ভিবোর্গ (Viborg) পরিবেষ্টিত হইতে চলিল। মেনারহাইম্ লাইন-ভেদের পরে সমস্ত ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্মুখে উন্মুক্ত, যুদ্ধের আর কিছু নাই।

রাষ্ট্রীয় উত্তেজনায় যাহা চোখ এড়াইয়া গেল তাহা এই—সোভিয়েটের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, তাহার সমর-সমাবেশ, দুর্ভেদ্য লাইন ভাঙিবার পদ্ধতি, সচল যুদ্ধের আবির্ভাব।

(৩) নরওয়ের যুদ্ধ

জার্মানি নরওয়ে আক্রমণ করিল ৯ই এপ্রিল—সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জার্মান সামরিক মতবাদের যেমন চরম প্রয়োগ ও পরম সার্থকতা দেখা যায় তাহাতে ফ্রান্সের চোখ খুলিবার কথা—যদিও তখন চোখ খুলিলেও আর লাভ হইত না।

নরওয়ের যুদ্ধ দীর্ঘ পরিকল্পনার ও আয়োজনের ফল। নরওয়ে পার্বত্য দেশ, অধিবাসী কম, বেশি লোকই বাস করে দক্ষিণে ওস্‌লো অঞ্চলে। যুদ্ধের জন্য নরওয়ে প্রস্তুতও নয়। ডেনমার্কও তাহাই। প্রতিবেশী সুইডেনও কোন বড় শক্তির সহিত বিবাদে রাজী নয়; বিশেষতঃ জার্মান শক্তির দুর্বারতা সে বেশ জানে। নরওয়ে আর ডেনমার্কের মধ্যে সংকীর্ণ সমুদ্রপথ—স্কাগিরাক্ (Skagerrak) আর কাট্টিগাট (Kattegat)। সুইডেনের লোহা জার্মানিতে পাইতে হইলে এই দুই পথ জার্মানির নিজের হাতে রাখা দরকার। কিন্তু নরওয়ের উপর শত্রুর প্রভাব পড়িলে স্থলপথেই নার্ভিক (Narvik), ট্রোণ্ডহেইম্ (Trondheim) প্রভৃতি বন্দর হইতে অগ্রসর হইয়া শত্রুরা সুইডেনকেও বাধা

দিতে পারে। তাহা ছাড়া ব্রিটেনের ব্লকেড ব্যর্থ করা জার্মানির দরকার—না হইলে গতবারের মত তাহাকে মরিতে হইবে। আটলাণ্টিকের মুখ জুড়িয়া ব্রিটেন নিজে। যদি নরওয়ে জার্মানির আয়ত্ত হয় তাহা হইলে নরওয়ের পশ্চিম ও উত্তর উপকূল হইতে জার্মানির নৌবল ও বিমানবল—বিশেষত ডুবোজাহাজ—আটলাণ্টিকে ব্রিটেনরই বাণিজ্য পথ বিপন্ন করিবে—আর বাণিজ্য আক্রমণই দুর্বল জার্মান নৌবলের এবারকার রণনীতি। তাহা ছাড়া, নরওয়ে ও ডেনমার্ক জার্মানির অধিকারে আসিলে সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ডও বাণ্টিক-তটস্থ সোভিয়েট-অঞ্চল পর্যন্ত জার্মানির পাহারায় থাকিতে বাধ্য হইবে।

জার্মান সমাবেশও হইল দুঃসাহসিক, চমকপ্রদ, সর্বদিকে সম্পূর্ণ। জার্মান নৌবলের, বিমান-বলের ও সৈন্যদলের সহযোগিতায় সর্বাঙ্গীণ আক্রমণ বা টোটেল আক্রমণ এখানে সার্থক হয়। বিশেষ করিয়া ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল পঞ্চমবাহিনী কি, কতরূপ ধোকা ও বিশ্বাসঘাতকতা এই যুদ্ধে চলিবে, বিমানের বল কতরূপ, কত ভাবে সম্ভব আভ্যন্তরীণ আক্রমণ বা attack in depth (কথাটি Hugh Slater-এর ; দ্রষ্টব্য তাঁহার *War into Europe*)। ৯ই জার্মান নৌবলের সহায়তায় প্রায় একই সময়ে উত্তরে সুদূর নার্ভিক ও ট্রোন্‌ড্‌হেইম হইতে মধ্যস্থলে বের্গেন (Bergen) ও দক্ষিণে ষ্টাভাংগের (Stavanger), ক্রিষ্টিয়ান্‌সুণ্ড্ (Christansund), ওসলো (Oslo)—এই ছয়টি প্রধান বন্দরে জার্মান সৈন্য নামিয়া পড়িল। ওস্‌লোস্থিত নরওয়ের

নামসস
ক্রিষ্টিয়ানসুণ্ড
ট্রনডেইম
লিলেহামার
বেগেন
ওসলো
ষ্টাভাঙ্গের
চিহ্ন :—
জার্মান আক্রমন ক্ষেত্র
ব্রিটিশ আক্রমন ক্ষেত্র
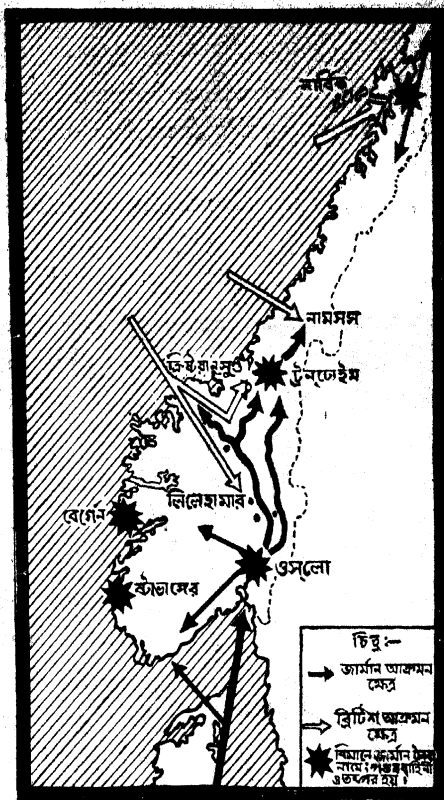
নরওয়ের যুদ্ধ

নৌকর্তা একখানা জাল টেলিগ্রাম পাইলেন—'জার্মানদের অবতরণে বাধা দিও না'। ক্ষুদ্র জার্মান নৌবলের এই গতি ব্রিটেন জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু নার্ভিকের পথেও তাহাদের ধরিতে পারিল না। অধিকাংশ জার্মান যুদ্ধজাহাজ ফিরিয়া আসে; কিছু রহে বন্দরে বন্দরে পাহারায়, আর কিছু স্কাগিরাকে সৈন্য পারাপারে নিযুক্ত। জার্মানি বোধ হয় ইহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়াই এই নরওয়ের যুদ্ধে নামে। জাহাজের সৈন্য নামিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে ও বন্দরে বিমান হইতে নামিতে থাকে জার্মান সৈন্য, আর আসিতে থাকে তাহাদের খাদ্য ও যুদ্ধোপকরণ। এই সময় জাহাজের কাজ গ্রহণ করিল বিমান। নরওয়ে কেন, ইউরোপে কেহ এইরূপ দৃশ্য দেখে নাই। ওস্‌লোর বিমান ঘাটিতে নামিয়া পার্ক ও পার্লামেণ্ট-গৃহ হইতে চমৎকার ব্যাণ্ড বাজাইয়া জার্মান সংগীতজ্ঞরা জনসাধারণকে কুতূহলী করিয়া তুলিল; জোঠীতে নৃত্যে ও গানে সকলকে বিমুগ্ধ করিল;—ততক্ষণে এদিকে কুইসলিং, পঞ্চমবাহিনী, জার্মান 'ভ্রমণকারীরা' ও নরওয়ের নাৎসিরা কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে, ততক্ষণে জাহাজের খোল হইতে লুক্কায়িত সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নরওয়ের গণ-তান্ত্রিকদের নিঃশেষ করিবার জন্য নামিয়া পড়িতেছে, আর ২৫০ সৈন্য-বাহী বিমান ষ্টেভেংগার বন্দরে ততক্ষণে মোট ৬০০০ জার্মান সৈন্য নামাইয়া দিয়াছে; নার্ভিকে লোহা লইবার জাহাজের খোল হইতে সৈন্য নামিয়াছে,—নার্ভিকের শাসক মেজর কুইসলিয়ের বন্ধু, কোনো বাধাই জার্মানরা তাই পায় নাই। জার্মানির এ যেন এক

নূতন গেরিলা যুদ্ধ। নরওয়ের সব ঘাটি অতর্কিত আক্রমণে জার্মানির হাতে আসিল।

যুদ্ধের ইহা প্রথম অধ্যায়—নরওয়েতে অবতরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়—নরওয়ে বিজয়। ব্রিটিশ নৌবল সৈন্য লইয়া নামসস (Namsos), আন্‌ডাস্‌নেস্ (Aandasnes) প্রভৃতি বন্দরে সৈন্য নামাইল, নার্ভিকে হানা দিল। জার্মানির চেষ্টা হইল—ডেনমার্ক ও নরওয়ের মধ্যস্থিত স্কাগিরাক্-পথ অক্ষুণ্ণ রাখা; আর বিমান আক্রমণে ব্রিটিশ সৈন্যের অবতরণেও ব্রিটিশ নৌবলকে সর্বত্র বাধা দেওয়া; তৃতীয়ত, নরওয়ের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ ও নরওয়ে সৈন্যদের জার্মান-বিমান ও স্থলসেনার সহযোগে পরাজিত করা। ক্ষুদ্র জার্মান নৌবলের যে দারুণ ক্ষতি হইল তাহাতে সন্দেহ নাই—৮ খানা আধুনিক ডেষ্ট্রয়ার ডুবিল, ১ খানা ব্যাট্‌লশিপ, ১ খানা ভারী ক্রুজার, ১ বা ২ খানা হাল্‌কা ক্রুজার জখম হইল। অর্থাৎ জার্মানির হাতে রহিল হয়তো মাত্র ২ খানা পকেট ব্যাট্‌লশিপ, খান ২।৩ ভারী ও হাল্‌কা ক্রুজার—অবশ্য তৈরী হইতেছিল ব্যাট্‌লশিপ বিসমার্ক ও টিরপিৎস্। কিন্তু নৌযুদ্ধ করা এবার জার্মানির অভিপ্রেত নয়; অভিপ্রেত ডুবোজাহাজে ও বিমানের দ্বারা ব্রিটেনের বাণিজ্য বন্ধ করা। সে হিসাবে এই ক্ষতি দিয়া নরওয়ে অধিকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইবে কেন? ব্রিটেনেরও এই সময়ে প্রয়োজন ছিল স্কাগিরাক্ আক্রমণ করা—জার্মানির সৈন্য-চলাচলের পথ বন্ধ করা; আর অন্য দিকে পশ্চিম উপকূলে নৌবলের দ্বারা ট্রেনড্‌হেইম-এ সৈন্য

নামানো—যেন নরওয়ের স্থলযুদ্ধে বিমানে অবতীর্ণ জার্মান সৈন্যদের বাধা দেওয়া যায়। কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন—বিমানে জার্মানির একাধিপত্য, উহার আক্রমণে নৌ-তরী বাঁচিবে কি? অথচ এই যুদ্ধে বিমানের হাতে তেমন মার খায় একমাত্র বিমানবাহী জাহাজ গ্লোরিয়াস্। সমস্ত নরওয়ের যুদ্ধে বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিমানের আক্রমণে রণতরী অত নিঃসহায় নয়। ব্রিটিশ নৌকর্তারা তখন পর্যন্ত চতুর্দিকে বিপন্ন হন নাই—নরওয়ের পরে সপ্তসাগরে ক্রমশ তাঁহাদের বিপদ ঘনাইয়া আসে। তবু স্কাগিরাকে ব্রিটিশ ডুবোজাহাজ শুধু টর্পেডো ছুঁড়িতে লাগিল। পশ্চিম উপকূলে ব্রিটিশ নৌতরী কাজ দিল শুধু সৈন্যদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য (৭-৮ই মে); আর সেই সৈন্যরাও ছিল ব্রিটেনের গুটি ৫ ডিবিশন সাধারণ টেরিটেরিয়াল—তাহাদের না ছিল ট্যাংক-মারা অস্ত্র, না বিমান-মারা অস্ত্র। আণ্ডাল্স্নেস্ হইতে ওসলোর দিকে ইহারা লিলেহামার (Lillehamar) পর্যন্ত অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশই অস্ত্রাভাবে, শিক্ষাভাবে ইহারা আবার ফিরিয়া গেল। নাভিকে তবু কিছু দিন (৯ই জুন পর্যন্ত) ব্রিটিশ সৈন্য ছিল।

জার্মানির ব্লকেডের ভয় দূর হইল। এমন চমৎকার ষ্ট্র্যাটেজি এবং নৌবল, বিমানবল ও স্থলসেনার এমন গ্রাণ্ড ট্যাক্‌টিক্‌স্ আর বড় দেখা যায় না।

(৪) ফ্রান্সের যুদ্ধ

নরওয়ের যুদ্ধ শেষ না হইতেই পশ্চিমপ্রান্তে যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। ৯ই এপ্রিল জার্মানি নরওয়ে আক্রমণ করে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রান্ত হইল ঠিক এক মাস পরে ৯ই মে। ইউরোপ টাইম-টেব্‌ল-বাঁধা যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পাঁচ দিনে (১৩ই মে) হল্যাণ্ড পরাজিত হয়, বেলজিয়াম অস্ত্র ত্যাগ করে ২৭শে মে,—তখন ফ্রান্সের পশ্চিম দুয়ার ভাঙিয়া পড়িয়াছে (১৪ই হইতে ১৬ই মে), জার্মান সৈন্য-স্রোত সমস্ত বেলজিয়াম ও উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স পরিবেষ্টন করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের পারে গিয়া পৌছিয়াছে। ফ্লেণ্ডার্সের (Flanders) পরিবেষ্টিত ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনীর ডানকার্কের (Dinkirk) পথে প্রত্যাবর্তনে (২৯ মে হইতে ৪ঠা জুন) পশ্চিম প্রান্তের এই যুদ্ধ-পর্ব শেষ হয়। ফ্রান্সের প্রতিরোধ-প্রাচীর এই ধাক্কাতেই একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—ইহার পরে বাকী রহিল ফ্রান্সের পতন। ফ্রান্সের যুদ্ধের তাই প্রথমার্ধে এই পশ্চিম প্রান্তের (৯ই এপ্রিল হইতে ৪ঠা জুন) ব্যূহভেদ; আর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের পতন (৫ই জুন হইতে ২৫শে জুন)।

নৈতিক সংকট

যুদ্ধের কুয়াশায় তখন যাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় নাই আজ তাহার অনেক কথাই জানিতে পারা গিয়াছে। নরওয়েতে

জার্মানি যুদ্ধের যে কৌশল গ্রহণ করে হল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে, ফ্রান্সেও তাহার আশ্রয় লয়, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করে অস্ত্রশক্তি। এই দুই অপরিচিত কৌশলে সকলে চমকিত, বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সামান্যতম ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্মানি পৃথিবীর একটা বৃহত্তম শক্তিকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলে। তাই জার্মানির এ যুদ্ধ-কৃতিত্বের মতই আজ যাহা প্রত্যক্ষ তাহা ফ্রান্সের শাসকশক্তির অধঃপতন, পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রীয় দুর্মতি। ইউরোপের পরাজয় শুধু সামরিক নয়, নৈতিক পরাজয়ও; পরাজয় উহাদের বুদ্ধির, সাহসের, রাষ্ট্রীয় চেতনার।

জার্মান কূটনীতি ও অস্ত্রসজ্জার ভয়ে নরওয়ের মত হল্যাণ্ড নিরপেক্ষ থাকিতে চায়—জার্মানির প্ররোচনায় বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পুরানো বন্ধুত্ব অস্বীকার করিয়া নিরপেক্ষ রহে। ইহা কূটনীতিক দুর্বুদ্ধি। জার্মান আক্রমণ যখন মাথায় ভাঙিয়া পড়িতেছে তখন বেলজিয়াম মে'র প্রথম সপ্তাহে ফরাসী ও ব্রিটিশ সাহায্য চাহে, হল্যাণ্ডও আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখে। তাহার পূর্বেই জার্মান বজরা হল্যাণ্ডের রটারডামে (Rotterdam) পৌঁছিয়াছে, তাহার গহ্বর হইতে ওলন্দাজ সৈন্যের বেশে লুক্কায়িত জার্মান সৈন্য তীরে নামিবে, জার্মান অধিবাসী ও ওলন্দাজ নাৎসি পঞ্চম-বাহিনীর কাজ করিবার জন্য নির্দেশ পাইয়াছে। বেলজিয়াম ফ্লেমিস্ ও ফরাসী ভাষীদের কলহ জার্মান গুপ্তচর বিভাগ কাজে লাগাইয়াছে। আর যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই হেগ (The Hague), রটারডাম প্রভৃতি বিমান-ঘাটিতে জার্মান পারাশুট

বৈমানিকরা নামিল—কাহারও সে দেশীয় ডাক-হরকরার পোষাক, কাহারও পুলিশের পোষাক, কাহারও বা মেয়ের বা পাদ্রীর পোষাক পরিধানে। অভ্যন্তরের রাস্তার মোড়, রেল ষ্টেশন সর্বত্র তাহারা দেখা দিল—সৈন্য চলাচলের পথ একেবারে অনিশ্চিত বিশৃঙ্খল হইল। কে জানে কেন জার্মান-বাহিনী বেলজিয়ামের প্রান্তে মাজ (Meuse) নদীর উপরে সেতু অক্ষত অবস্থায় পাইল! কেন তাহা ভাঙা হয় নাই—এই প্রশ্নের উত্তর নাই। এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যখন জার্মানরা সেদাঁর পথে (১৪ই-১৬ইয়ের পরে) ফ্রান্সে ঢুকিয়া পড়িতেছে। ছোঁ-মারা বোমারুর বিকট শব্দ, কামানের আওয়াজ, রচিত গল্পের বিভীষিকা, শাসকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা সমস্ত ফরাসী সৈন্য ও জনগণকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া দেয়। এ পরাজয় ঘটে তাই বুদ্ধির ও সাহসের অভাবে। অনেক ক্ষেত্রে দুই-চারিটি মোটর বাইকে বা ট্যাংকে আগত জার্মান সৈনিক দেখিলেই ফরাসীরা ঘাটি ছাড়িয়া দিয়াছে; মনে করিয়াছে, জার্মান বাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। পারাশুটে জার্মানরা সৈনিকের সঙ্গে খড়ের মানুষ ছাড়িয়া দিয়াও নীচেকার ফরাসীদের ত্রস্ত বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। গুপ্তচর ও পঞ্চম বাহিনীদের দ্বারা প্যারিসের পথে শত শত মিথ্যা শবানুগমনকারী কল্পনা করিয়া ফরাসী জনচিত্তে যুদ্ধে মৃত্যু-সংখ্যা সম্বন্ধে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়াছে। তারপর সাধারণ লোকদের পালাইবার উপদেশ দিয়া দেশের পথঘাট পলাতকের ভিড়ে সৈন্যগণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য

করিয়া তুলিয়াছে—মজুত ফরাসী সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রেও যাইতে পারিল না।

কিন্তু শুধু এই কৌশলেও ফ্রান্সের পতন হইত [illegible]। সে পতন প্রধানত হয়—ব্রিটিশ-ফরাসী রাষ্ট্রনীতির জ[illegible] তাহাদের সামরিক মতবাদের জন্য। ফ্রান্সের প্রথম পরাজয় ঘটে স্পেনে, তাহা সম্পূর্ণ হয় মিউনিকে;—সেদিন হইতেই জার্মানির দুই ফ্রন্টের যুদ্ধ সম্বন্ধে ভয় দূর হইতে থাকে। ব্রিটেন ও ফরাসী শাসক-শ্রেণী সোভিয়েটের সঙ্গে শান্তির ফ্রন্ট বা ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গঠন অস্বীকার করায় জার্মানি একেবারে নিশ্চিন্ত হইল। এই রাষ্ট্রীয় হিসাব এক নিমেষের জন্য ভুলিবার নয়—ফরাসী সৈনিক-তন্ত্র (পেতাঁ প্রভৃতি) ও ফরাসী ধনিকতন্ত্র ('দুইশ পরিবার') ফরাসী ফ্যাশিজ্‌মের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; ফ্রান্সের পরাজয়ে তাঁহারা দেখিতেছিল—ফরাসী জনগণের পরাজয়, নিজেদের সুযোগ।

কিন্তু সামরিক মতবাদ ও সামরিক অকর্মণ্যত[illegible]ান্সের পতনের সামরিক কারণ। আংশিকভাবে ব্রিটিশ [illegible]মরিক মতবাদও ইহার জন্য দায়ী। জার্মান টোটেল যুদ্ধ ও [illegible]াদের নিকটে ঐসব মতবাদ একেবারে উড়িয়া যায় (দ্রষ্টব্য পৃ. ১২১)। সে মতবাদ ও তাহার আলোচনা বিশেষজ্ঞরা বহুবার করিয়াছেন—এখনো করিতেছেন। তাহার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট। ফরাসী-মতবাদের গোড়ার কথা পাঁচটি সূত্রে বলা যায় (*The Battle for the World*—Max Werner; p. 99)।

(১) লম্বালম্বি যুদ্ধের লাইন বা সুরক্ষিত অঞ্চল রচনা করা; (২) প্রতিরোধের ভিত্তি হইল এইরূপ সুরক্ষিত ব্যূহ বা দুর্গক্ষেত্র, যেমন ম্যাজিনো লাইন; (৩) সৈন্য রচনার প্রণালী হইল এই যে—এক দল রহিবে সুরক্ষিত অঞ্চলের অন্তরালে, আর দল পিছনে মজুত থাকিবে—দরকার মত চালিত হইবে সম্মুখের ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য। ইহাই অন্তরাল-রীতি (*la Coverture*); (৩) ফরাসী সশস্ত্র বাহিনীর ভরসাস্থল হইল পদাতিকবাহিনী; (৪) আর সমর-সমাবেশ হইল প্রতিরোধ-মূলক সৈন্য-চালনা—যাহা-কিছু যুদ্ধ প্রতিরোধের দায়ে। মনে রাখা উচিত—এই মতবাদের জন্য পেতাঁ্যা নিজেও দায়ী। তিনি বহুকাল ছিলেন সামরিক মন্ত্রী; যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার লেখায় দেখা যায়, তিনি বর্তমানকালের উপযোগী অস্ত্রসজ্জার, বিমানের ও ট্যাংকের গুরুত্ব বুঝেন নাই—সচল যুদ্ধের সম্ভাবনাও বুঝেন নাই। সেই দিকে যাহা-কিছু দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন—হতভাগ্য ফরাসী মন্ত্রী রেনো (Reynaud), তরুণ সেনাপতি দ্য গল (De Gaulle, দ্রষ্টব্য *The Army of the Future*) তিনিও ট্যাংকের উপরই সব আস্থা রাখিতে চান—বিমান ও জনবলের বিষয়ে বিশে আস্থাবান ছিলেন না); আর ফরাসী সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী পিয়ের কো (Pierre Cot)।

ব্রিটিশ সামরিক মতবাদ প্রায় ইহারই সগোত্র। প্রধানত তাহা ব্রিটেনের মত দ্বীপের জন্য ও তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রণীত। তাই যাহা তাহার বৈশিষ্ট্য তাহা এই ইউরোপীয় যুদ্ধের

পক্ষে আরও ক্ষতিকরই। ব্রিটিশ মতবাদের গুটি ছয় ধারা দেখা যায় (*The Battle for the World*—Max Werner, p. 113); যথা :—(১) অর্থনৈতিক সংগ্রামের দ্বারাই বা ব্লকেড্ করিয়া চূড়ান্ত জয় সম্ভব; (২) সমুদ্রে ও আকাশে শক্তি বেশি থাকিলে স্থলশক্তির জন্য ভাবনা নাই; (৩) প্রথমত দেখা দরকার ব্রিটেনের রক্ষা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার পথ; (৪) মূলত, প্রতিরোধ-প্রধান যুদ্ধই গ্রাহ্য; (৫) ইউরোপের যুদ্ধের প্রধান ভাবনা ব্রিটেনের নয়; (৬) স্থল-বাহিনী বড় না করিয়া বরং যথাসম্ভব তাহা ক্ষুদ্র রাখাই ব্রিটেনের নিয়ম।

ব্রিটিশ সামরিক লেখক লিডেল হার্টের লেখায় অবশ্য (*Defence of Britain* বিশেষ দ্রষ্টব্য) এইসব মতবাদ আরও দৃঢ় হয়। কিন্তু তাঁহার গোড়ার কথায়—ট্যাংক ও বিমানের কথায়, আধুনিক অস্ত্রসজ্জার কথায়,—সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্ণপাতও করে নাই (দ্রষ্টব্য *Dynamic Defence*)। আর তাঁহার রাষ্ট্রীয় উপদেশ—সোভিয়েটের সহিত মিত্রতা করার কথা—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ছিল অভাবনীয়।

ব্রিটেন-ফ্রান্সের সামরিক পরাজয় তাই সম্পূর্ণ হইয়াই ছিল—অদ্ভুত কুশলতার সহিত জার্মানি এই পরাজয়কে সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিল।

আয়োজন—যুদ্ধের প্ল্যান

জার্মানির বিজয় যে এত ব্যাপক হইল তাহার কারণ জার্মানির এই যুদ্ধের সমাবেশ, কর্মক্ষমতা ও রণকৌশল। প্রথমত, নরওয়ের পরে জার্মানি বুঝিল—এবার ইউরোপের পশ্চিম সমুদ্র-উপকূল হস্তগত করিতে পারিলে উল্টা জার্মানিই ব্রিটেনকে প্রায় ব্লকেড করিতে পারে। তাহার জন্য হল্যাণ্ড, বেলজিয়ামের ও ফ্রান্সের সমুদ্রতট অধিকার দরকার। গত যুদ্ধে লুডেনডর্ফ ১৯১৮-এর মার্চ মাসে এমিয়ে্ঁর দিকে এই প্রয়াসই করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বেশি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সেবার বিচ্ছিন্ন হইল না। বিচ্ছিন্ন হইলে তখন হয়তো উহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মনোমালিন্য সৃষ্টি করাও সম্ভব হইত। এবার জার্মানির মাথায় ছিল লুডেনডর্ফের প্ল্যান, আর এই গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি বা পূর্ণ সমাবেশ—ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব ছেদ করা। তাহার সহিত অবশ্য জার্মানি যোগ করিল তাহার স্লীফেন প্ল্যানের সার বস্তু—একই কালে শত্রুর সম্মুখে যখন একাংশ সৈন্য সংগ্রাম করিবে, তখন প্রধান অংশ তাহার পার্শ্ব-বেষ্টন (encirclement) করিয়া পশ্চাতে গিয়া উঠিবে, ম্যাজিনো লাইন ঘিরিয়া ধরিবে (turning)। অবশ্য, এইজন্য জার্মানি ব্যবস্থা করিল উপযুক্ত রণসজ্জার—ট্যাক্‌টিকাল কৃতিত্বের পরিচয় তাহাতে; আর অন্য দিকে ব্যবস্থা করিল ছলনা ও কৌশলের। প্রথমে কিছুদিন সে সৈন্য জমা করে সুইট্‌সার-ল্যাণ্ডের দিকে। ফরাসীরা ভাবিল সেখানেই জার্মানি আক্রমণ

করিবে। তাহার পর সে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা গত যুদ্ধের মত সেদিকেই বেলজিয়ামের সীমান্ত রক্ষায় ছুটিল। তখন জার্মানি তাহাদের বিশেষ বাধাও দিল না, শুধু লুভেঁা (Louvain) তিরলেমোঁতে (Tirlemont) ঠেকা দিয়া রাখিল। কারণ, যতই মিত্রবাহিনী পূর্ব-উত্তরে অগ্রসর হইবে ততই তাহারা ফাঁদে জড়াইয়া পড়িবে—ফ্রান্সের কোথাও (যেমন সেদাঁয়, Sedan) তখন একবার ব্যূহভেদ করিলে মিত্রবাহিনীর আর পিছনে সরিবার সময় থাকিবে না। লিডেল হার্ট বলিতে চান—ইহাও জার্মান গৌণপ্রয়াস-রীতির আর এক সার্থক প্রমাণ। আবার, এই ব্যূহভেদের পরেও জার্মানি প্রথমে উপকূলে ছুটিবে, না প্যারিসে তাড়া করিবে, তাহাও তাহার শত্রুরা বুঝিতে পারিল না—জার্মানির গতির স্বাধীনতা (Freedom of Movement) তাই একেবারে অব্যাহত রহিল। যুদ্ধের দ্বিতীয়র্ধে তাই জার্মানরা যখন ফ্রান্সের দিকে ফিরিল তখন তাহাদের সৈন্যবল প্রচুর, অস্ত্রবল আরও বেশি—ফরাসী বাহিনীকে খণ্ড খণ্ড করিতে তাহাদের কিছুই অসুবিধা রহিল না।

গোড়ায় এ যুদ্ধে জার্মানির বল ছিল কত, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন ৮০ ডিবিশন মাত্র—আর তাহার শত্রু-পক্ষের তখন ১২৫ ডিবিশান সৈন্য ছিল (*War into Europe*, Slater, p. 36)। কিন্তু অন্য হিসাবে (*Battle for the World*, Max Werner, p. 136) জার্মানির ১২৫ ডিবিশান আসে যুদ্ধে, আরও ৫০।৭৫ ডিবিশান ছিল মজুত; আর

মিত্রশক্তির মোট ১০০ ডিবিশানের ১০ ডিবিশান সৈন্য ব্রিটেনের, ১০ ডিবিশান বেলজিয়মের, গুটি ১৫ ডিবিশান ম্যাজিনো লাইনেই নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সকল হিসাবেই ইহা স্পষ্ট—মাথা গুণতিতে যাহাই হউক, শিক্ষায় সংগঠনে আর সর্বোপরি অস্ত্রবলে জার্মান
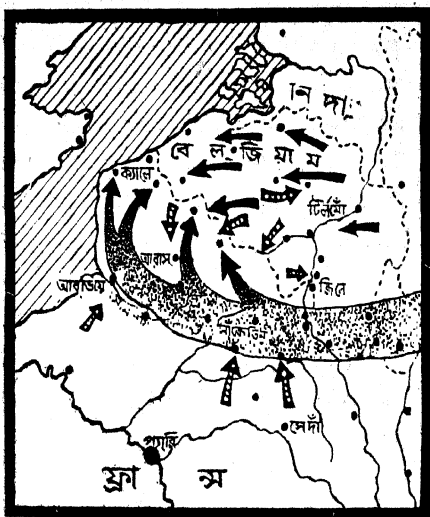
শক্তি ছিল অতুলনীয়। ফ্রান্সের ছিল হাজার ২০০০ আধা পুরানো ট্যাংক, ১০০ বোমারু বিমান ও ৪২০ খানা জঙ্গী বিমান—বিমান-মারা কামান ও ট্যাংক-মারা কামান প্রভৃতি রক্ষাস্ত্রও (defensive weapon) ফরাসী বাহিনীতে ছিল কম।

অন্য দিকে জার্মানদের ছিল ৭৫০০ ট্যাংক, ২৫০০ বোমারু বিমান,—উহার অনেকগুলিই আবার ষ্টুকা, আরও ৪০০০ যুদ্ধ বিমান—আর তাহাদের আক্রমণাস্ত্রই ছিল এই রক্ষাস্ত্রের অপেক্ষাও বেশি। যুদ্ধারম্ভে সৈন্যবলে তাঁহারা ছিল মিত্রশক্তির দ্বিগুণ ও অস্ত্রবলে অন্তত চতুর্গুণ (*Battle for the World* p. 137), আর যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে সৈন্যবলে তাহারা হয় ত্রিগুণ আর অস্ত্রবলে দশগুণ (ঐ p. 48)। ইহার সহিত মনে রাখা দরকার—জার্মানির আভ্যন্তরীণ গুপ্ত-আক্রমণ ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সমাবেশ কিরূপ ছিল? পরস্পরে সম্পর্কিত হইলেও তাহা সুনিবদ্ধ ছিল না—ব্রিটেন ইউরোপে যুদ্ধের জন্য তৈরী নয়; তাই ফ্রান্সে সৈন্য পাঠাইয়াছিল কম। আর উভয়েই ভাবিয়াছিল, বেলজিয়ামে ও ফ্রান্সে গত যুদ্ধের মত একটা যুদ্ধ চলিবে—স্থাণুযুদ্ধ (War of Position), যখন লাইন ভাঙিয়া সচল যুদ্ধে (War of Movements) পরিণত হইল তখন ফরাসী-ব্রিটিশের বুদ্ধিতে শিক্ষায় আয়োজনে কিছুই কুলাইল না।

প্রথমার্ধ—ফ্লেণ্ডার্সের যুদ্ধ

যুদ্ধের ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেল বিদ্যুদ্‌গতিতে। ১০ই মে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রান্ত হইল। এই হল্যাণ্ডে 'আভ্যন্তরীণ আক্রমণেই' সব বিশৃঙ্খল হয়। তবু রোটারডামের ওলন্দাজেরা একবার সেই বিমানঘাটি পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। ইহার

শাস্তি-স্বরূপ রোটারডামে জার্মান বিমানের যে ধ্বংসলীলা চলে এবারকার যুদ্ধে উহাই একটা বিভীষিকা। ওয়ারস'র ভাগ্যেও এমনি শাস্তি জুটিয়াছিল—পরে যুগোস্লাবিয়া'র বেলগ্রেডের উপর উহারই নিষ্ঠুরতম প্রকাশ দেখা যায়। এদিকে হল্যাণ্ডের য়িসেল-মা'স (Yssel-Maas) জলরেখা ধরিয়া এক জার্মান বাহিনী আসে, আর এক বাহিনী আসে রটারডামের দিকে। তাই ১৪ই মে ওলন্দাজ সেনাপতি ভিংকেলম্যান অস্ত্রত্যাগের আদেশ দেন।

বেলজিয়াম ও জার্মানির সীমান্তে প্রধান জিনিস এলবার্ট কানেলের পরিখা আর লিজ-নামুর প্রভৃতি দুর্গ। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই জানা গেল—জার্মান বাহিনী এলবার্ট ক্যানেল অতিক্রম করিয়াছে, উহার সেতু ভাঙা হয় নাই। নামুর ও জিবের (Namur, Givet) মধ্যে মাজ (Meuse) নদীর উপরের সেতুও ভগ্ন না হওয়ায় জার্মানরা সহজেই তাহা পার হইয়াছে, দক্ষিণ পশ্চিমের সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গ এবেন-মায়েল (Eben-Mael) তাহাও জার্মানরা দখল করিয়াছে। ইহার পরে জার্মানরা আর্দেনের (Ardenne) পার্বত্য ও অরণ্য প্রদেশে গিয়া ফরাসী লাইন ভাঙিতে থাকে—বেলজিয়ামে ততক্ষণ ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, ডিইল (Diyl) নদীর রেখা ধরিয়া জার্মানদের বাধা দিতেছে। তাই এদিকে ফ্রান্সের ভগ্ন পথে সমস্ত বেলজিয়ামই পরিবেষ্টিত হইতেছিল (২৩শে মে)। ফরাসী ও ইংরেজরা তখন থামিল (১৫-১৭)। একবার ইংরেজের ২ ডিবিশান সৈন্য ফ্রান্সে আরাসের (Arras) দিকে

ফিরিবার আদেশ পায় (মে ২১-২২)। তখন সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেলজিয়ামে আবদ্ধ ১০ ডিবিশান ব্রিটিশ ও ২ আর্মি ফরাসী সৈন্যদের জন্য ডানকার্ক ছাড়া বাহির হইবার আর তখন কোনো বন্দর নাই। ২৭শে মে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডও অস্ত্র ত্যাগ করেন। না হইলে তাঁহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হয়, এই কথাও সবাই বুঝিতেছিল। কিন্তু লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণে ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্যদের বিপদ ঘনায়িত হইল। ক্রুদ্ধ শক্তিদ্বয় তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিতে ছাড়িলেন না। পরাজয়ের বিভ্রান্তিতে মিত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল—ইহাই তো ছিল জার্মানিরও অভিপ্রেত।

এইবার ফ্লেণ্ডার্সের যুদ্ধ। কিন্তু তাহার কারণ আসলে জিবে ও সেদাঁর মধ্যস্থলে ব্যূহভেদ, ও এই ফ্লেণ্ডার্সের বাহিনীর পরিবেষ্টন। বেলজিয়ামের সীমান্তে এই অঞ্চলে ম্যাজিনো লাইন আগে ছিল না, উহা নূতন তৈরী হইয়াছিল। কাহারও মতে তাই উহা কাঁচা, কাহারও মতে খুব শক্ত। বেলজিয়ামের আর্দেনের পার্বত্য অঞ্চল পার হইলেই এই সীমান্ত। এখানে ছিলেন ফরাসী সেনাপতি কোপরা (Copra); তাঁহারও কিছু সৈন্য চলিয়া গিয়াছিল তখন বেলজিয়ামে। এই দুর্বল স্থানে জার্মান সেনাপতি রাইখেনাউ সংঘাত করিলেন। উপর হইতে ছোঁ-মারা বিমান বোমা করিতে লাগিল, নীচে পান্‌ৎসার অগ্রসর হইয়া আসিল, ব্যূহ বিদীর্ণ হইল (১৪ মে'র পরে)। দুই দিনে ৬০ মাইল চওড়া হইল এই ভাঙা জায়গা,—ফরাসী সেনা জার্মানদের ঘিরিয়া বাধা দিতে

গেল (Battle of the Bulge)। কিন্তু মাথার উপরের বিমান এবং রাইখেনাউর ৫ ডিবিশন পান্‌ৎসার ও ২।৩ ডিবিশান হাল্‌কা যান্ত্রিক বাহিনী তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। আক্রমণকারীর একবারে অগ্রে অগ্রে মোটর বাইকের হামলেদাররা ছুটিল, আর পিছনে আসিতে লাগিল মোটরবাহিত জার্মান পদাতিক। সম্পূর্ণ বিদ্যুদাক্রমণ তীর-বেগে অগ্রসর হইয়া গেল—১৯শে-২০শের মধ্যে উহা সোমের তীরে আসিয়া গেল। এতটা জার্মানরাও প্রত্যাশা করে নাই। সোম্ ও এস্‌নেতে (Aisne) প্রতিঘাতের (counter attack) শেষ চেষ্টা চলিতে পারিত; কিন্তু ফরাসী প্রধান সেনাপতি আক্রমণ করিতেও আর সাহস পাইলেন না। এই দুই নদীর পিছনে ফরাসী সৈন্যরা একবার দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল (ইহাই তথাকথিত 'ওয়েগাঁ লাইন')। লাওঁ (Laon) ও রেথেলে (Rethel) একটু বৃথা চেষ্টা হইল, উত্তরে আরাসে ব্রিটিশ সৈন্যরা একবার মাথা ঠুকিল (২১শে-২২শে), রাইখেনাউর বাহিনী ২৩শে তারিখে ডান পার্শ্বে বাঁকিয়া সমুদ্রতীরে এববিয়েতে (Abbeville) পৌছিল (২৩শে মে)। তারপর বোলোঁ (Bologue), তারপর কালে (Calais)—ফ্লেণ্ডার্সের অবরুদ্ধ বাহিনীর তখন একমাত্র দ্বার ডানকার্ক।

এই ডানকার্কের কথা ইংরেজ সভয়ে স্মরণ করে, সগর্বে চিন্তা করে। ইহাতে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল সত্যই। জার্মানরা বলিতেছিল—এ বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য—ধ্বংস প্রায় হইয়াই গিয়াছে। তবু প্রায় সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সৈন্যবল ও ৯০ হাজার ফরাসী

সৈন্য ২৯শে হইতে ৪ঠা জুনের মধ্যে ডানকার্কের পথে পার হইল—জার্মান জোয়ারের মুখে ব্রিটিশ ও জেনারেল প্রিয়োর (Prioux) ফরাসী বাহিনী নিজেদের প্রতিরোধ-শক্তির পরিচয় দেয় এখানে। আর জার্মান কামান ও বিমানের ধ্বংসলীলাকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশের জাহাজ ও নৌকার দাঁড়ি মাঝি লস্কর সবাই তাহাদের পারাপার করিতে যে সাহস ও জাতীয় চেতনার পরিচয় দেয়—তাহা তাহাদের শত্রুপক্ষেরও লক্ষ্যণীয় ছিল। ডানকার্কে জার্মানদের লাভ হইল—এই দুই বাহিনীর সমর-সম্ভার।

এই প্রথমার্ধ শেষ হইতেই দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হইল। জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী এবার (৫ই জুন) সোম ও এইস্‌নের তীর হইতে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ধাবিত হইল। সোম নদীর পারে এই পনের দিনেও ফরাসীরা ঠিক সামলাইয়া লইতে পারে নাই; তখনো ১৫।২০ ডিবিশান সৈন্য তাহাদের ম্যাজেনো লাইনে আবদ্ধ। ফ্রান্সের আসল যুদ্ধ এখানে হয় মাত্র পাঁচ দিন—১০ই জুন হইতে ১৫ই পর্যন্ত। আমিয়েঁর ফরাসী সৈন্যরা প্রাণপণ করিয়াও আর তাহার পরে তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহার পরে জার্মান চাপ বাড়ে সোয়াসোঁতে (Soisson); স্রোতের মত জার্মান পানৎসার দুই পথে আবার অগ্রসর হয়। ১২ই জুনের পরে ফরাসী বাহিনী বহু খণ্ডে বিভক্ত হয় ও পরিবেষ্টিত হয়। ১৩ই ঘোষিত হয় প্যারি বাধা দিবে না; ১৪ই প্যারিতে জার্মানরা উপস্থিত হয়। বলিতে গেলে তখন আর ফরাসী বাহিনী নাই—তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৫ই হইতে ২০শে পর্যন্ত ভগ্ন

ফরাসী বাহিনীকে পরিবেষ্টিত ও বন্দী করা চলে—২০শের কাছাকাছি জার্মানরা পশ্চিম ফ্রান্সের আটলান্টিক উপকূলে গিয়া উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে জার্মানরা আপনাদের শক্তির পরীক্ষা স্বরূপেই সারলাব-এর (Saarlab) নিকটে আসল ম্যাজিনো লাইন ভাঙিল—৬০০ ছোঁ-মারা বিমান, ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক তাহাতে প্রযুক্ত হয়। আবার ষ্ট্রাস্‌বুর্গের কাছে পূর্বশিক্ষিত জার্মান বাহিনী রাইন সাঁতরাইয়া পার হইয়া আলসাসে ঢোকে। কিন্তু এই সবের প্রয়োজন ছিল না; ফরাসির পরাজয় তৎপূর্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছিল।

রাজধানী তুর হইতে বুর্দোতে গেল, রেনোর বদলে পেতাঁ্যা প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যুদ্ধক্ষান্তির (১৭ই জুন) নিবেদন জানান। সেই ১৯১৮-এর সেই গাড়ীতে বসিয়াই হিটলার ২১শে যুদ্ধক্ষান্তির পত্র স্বাক্ষর করিলেন—এবার ফ্রান্‌স পরাজিত আর জার্মানি বিজয়ী।

শেষ কথা—১০ই জুন মুসোলিনও ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন—বাগাড়ম্বরে তাহা পড়িবার মত। কিন্তু ২৫শে পর্যন্ত খাঁটি ফ্রান্‌সে তাঁহার সৈন্যরা প্রবেশও করিতে পারে নাই।

একটা প্রকাণ্ড জাতি ডুবিয়া গেল, অথচ জার্মানির ক্ষতির পরিমাণ হাস্যকর। প্রথমত জার্মানির হতের সংখ্যা ১০,২৫২, আহতের ৪২,২৫৬, নিখোঁজ ৮,৪৬৩। ফ্রান্‌সের ক্ষতি সে তুলনায় বিস্ময়কর—৭০ হাজার হতাহত, আর ১৯ লক্ষ বন্দী। আর এই যুদ্ধের ফল যাহা হইল তাহা জার্মান কূটনীতির পক্ষে আরও

স্তিত্বের। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে কলহ শুরু হইল, ভিশিতে চক্র-শক্তির বন্ধুরূপে পেতাঁ-লাভালের দল প্রতিষ্ঠিত হইল, ইতালির যোগদানে মিশরে ও ভূমধ্য-সাগরে ব্রিটেনের অবস্থা সংকটাপন্ন হইল, সমস্ত ইউরোপের সমুদ্র-উপকূল জার্মান ডুবোজাহাজের ঘাটিতে পরিণত হইল, ব্রিটেন নিজে প্রায় ঘরবন্দী হইতে চলিল, সমস্ত ইউরোপের কল-কারখানা জার্মান যুদ্ধসম্ভার ও অস্ত্র-সম্ভার জোগাইতে লাগিল—আর ব্রিটেনের হাতে তখন কিছু নাই, যুদ্ধে সে তখন একা।

জার্মান সামরিক কর্তৃত্ব, না জার্মান রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব—কাহাকে এ যুগে শ্রেষ্ঠ বলিব? দুইয়ের সম্পূর্ণ সংযোজনায় দুইই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

ফ্যাশিস্ত নব-বিধান রচনা

ফ্রান্সের পতনের ফলে ইউরোপের রাজনীতিতে ওলট-পালট ঘটিল নাৎসি রাষ্ট্র-চিন্তার স্বরূপও আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিল। বৃহত্তর জার্মানি (Grossdeutschland) যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই প্রায় গঠিত হইয়াছিল, এবার ইউরোপীয় নব-বিধানের ('New Order') কথা ঘোষিত হইল। উহার ভিত্তি হইল দুইটি জিনিস: এক, এই নববিধানে সব রাষ্ট্র সমান নয়, ইহাতে 'অধিকার-ভেদ' আছে—কেহ হইবে প্রভু-রাষ্ট্র, কেহ বা তাহার তাঁবেদার-রাষ্ট্র মাত্র; কিন্তু সকলেই হইবে এই প্রভু-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। দুই,

প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন চলিবে নাৎসি-ধারায় 'এক-নায়কের' দ্বারা (Fuehrer Prinzep),—জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নয়। জনগণ তাহাদের শাসক-নায়ক নির্বাচনও করিবে না, তাহারা নায়কের নির্দেশ নির্বিচারে শুধু পালন করিবে। এই ফ্যাশিস্ত ব্যবস্থা শুধু ইউরোপেই বদ্ধ থাকিবে এমন নয়, আফ্রিকা-এশিয়ার উপরে বিস্তৃত হইবে, নাৎসিদের আলোচনায় তাহা স্পষ্ট হইতেছিল। ইহার অর্থ ক্রমশই বুঝা যাইতেছিল—ফ্যাশিস্ত শক্তিরা বিশ্ব-বিজয়ে কৃত-সঙ্কল্প। আর উহাতে তাহাদের পক্ষে যাহারা বাধা হইবে তাহাও বুঝা যাইতেছিল। ইউরোপ হইতে বাহির হইতে গেলেই অবশ্য ব্রিটেন বাধা দিবে। আর পৃথিবীতে ফ্যাসিস্ত-বিজয়ে যদি জাপান সহযোগী হয় তখনই যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্র হইবে চক্রশক্তির প্রতিবাদী। ইউরোপ ভূখণ্ডে তখনো আর এক প্রবল শক্তি নিরপেক্ষ রহিয়াছে, ফ্যাশিস্ত একাধিপত্য বিস্তারে সেও বাধা হইবেই—সে সোভিয়েট ভূমি। বিশ্বযুদ্ধ যে আসিয়া পড়িতেছে, এই সময় হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

চক্রশক্তির রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ফ্রান্সের পতনে যে-যে সামরিক সুযোগ করায়ত্ত হইল তাহা মোটামুটি আমরা দেখিয়াছি (পৃ. ১৬৪)। বাদ রহিল শুধু ফ্রান্সের রণতরীগুলি। তাহার কিছু ব্রিটেনে ও কিছু আলেকজেন্দ্রিয়ায় চলিয়া যাওয়ায় ব্রিটেনের হাতে পড়ে। ফ্রান্সের উপনিবেশ ওরাওঁতে বাকী কিছু ব্রিটেনের আক্রমণে ঘায়েল হইয়া থাকে। নাৎসিরা তথাপি

আটলান্টিকে ব্রিটেন-আমেরিকার বাণিজ্য-পথ আক্রমণ করিল; অন্যদিকে ইতালি হইতে ভূমধ্যসাগরে হানা দিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। অনেকের মত মনে হইল ব্রিটেন নিজে বিপন্ন, তাহার ভূমধ্যসাগরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, মিশরে স্থয়েজে প্রতিষ্ঠাও চূর্ণ হইবে। জার্মানিও প্রত্যাশা করিয়াছিল এইবার ব্রিটেন একটা বুঝাপড়া করিয়া যুদ্ধত্যাগ করিতে চাহিবে। কিন্তু তাহা হইল না।

একা ব্রিটেন যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ক্রমে আরম্ভ হইল—ব্রিটেনের যুদ্ধ।

(৫) ব্রিটেনের যুদ্ধ

এই ক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রধান ভরসা ছিল তাহার নৌবল আর জার্মানির প্রধান ভরসা ছিল তাহার বিমান-বল। জার্মান যুদ্ধ-চিন্তায় এইরূপ একটা মতবাদ প্রবল হইতেছিল: (১) উপযুক্ত ঘাটি হাতে থাকিলে বিমান-বল সমুদ্র-শক্তির ক্ষমতা খর্ব করিতে পারে। অতএব ব্রিটেনকে জয় করা সম্ভব। (২) সুপ্রস্তুত স্থলশক্তিকে সমুদ্র হইতে নৌবলে বা আকাশ হইতে বিমান-বলে নির্জিত করা যায় না। অতএব জার্মানির পরাজয় দুঃসাধ্য। (৩) নৌবল ও বিমান-বলের যোগে যতটা সামরিক শক্তি বাড়ে স্থলসেনার ও বিমান-বলের যোগে তাহার অপেক্ষা শক্তি বৃদ্ধি পায় বেশি। অতএব ব্রিটেনের নৌবল ও দুর্বল বিমানবল জার্মানির

সুগঠিত সৈন্যবল ও প্রবল বিমান-বলের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না।

জার্মানির এই গণনায় যে ভুল ছিল তাহা ডানকার্কের সাক্ষ্য হইতেও সে বুঝিতে চাহিল না। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান হইল তিনদিকে:—প্রথমত সরাসরি বিমানযোগে, ইহাই 'ব্রিটেনের যুদ্ধ'। দ্বিতীয়ত, ডুবোজাহাজ, যুদ্ধ-জাহাজ, মাইন ও বিমানের দ্বারা আটলান্টিকে ব্রিটিশ বাণিজ্য-পথ বন্ধ করার চেষ্টায়। ইহাও আসলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ, তবে ইহার নাম 'আটলান্টিকের যুদ্ধ।' এই পর্ব এখনো শেষ হয় নাই। তৃতীয়ত, ইতালির দ্বারা ভূমধ্যসাগরে ও উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যপথ ছিন্ন করার চেষ্টায়। ইহার একাংশের যুদ্ধ ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধের অন্তর্গত, অন্যাংশ আফ্রিকার যুদ্ধ। কোনো অংশই এখনো সমাপ্ত হয় নাই।

নাৎসি আক্রমণের ঝড়ে যখন ইউরোপে বিপর্যয় ঘটিতেছিল তখন ব্রিটেন একেবারে জাগিয়া উঠিল। দেশ রক্ষা করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞার নিকট সমস্ত দ্বিধা শঙ্কা বিদায় লইল। একদিকে ভরসা ছিল স্বল্পসংখ্যক বিমান ও বিমান-যোদ্ধা, অন্যদিকে জনগণের প্রতিরোধ-সঙ্কল্প ও প্রতিরোধ-শক্তি। কর্তৃপক্ষও দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধোপযোগী ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, জনগণও আপনা হইতে 'হোম-গার্ড' প্রভৃতি গঠন করিতে লাগিলেন। জার্মানিও অবশ্য ব্রিটেনকে ইউরোপ হইতে অর্ধ-চন্দ্রকারে ঘিরিয়া আক্রমণ করিবার জন্য নওরওয়ে হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত সর্বত্র বিমানের ঘাটি

ও যুদ্ধ-জাহাজের ঘাটি তৈরী করিয়া ফেলিল। প্রধানত, জার্মানির চেষ্টা ছিল বিমানবলে তাড়াতাড়ি ব্রিটেনকে পরাস্ত করা দুই ভাবে—ব্রিটেনের আর্থিক জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তাহার নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়া, এবং উপকূলস্থ বিমানঘাটি প্রভৃতি ব্রিটিশ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া নরওয়ের মত জল-পথে ও আকাশ-পথে ব্রিটেনে সসৈন্যে অভিযান করিয়া। এইরূপ প্রয়াস সার্থক না হইলে অবশ্যই সমুদ্রে ব্রিটেনকে অবরুদ্ধ করিতে হইবে—সেইরূপ জয় সময় সাপেক্ষ—তাই সঙ্গে সঙ্গে বরাবর এই জাহাজ-ডুবি চলিল। সমুদ্রে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে হিটলারের সংগ্রাম পূর্বেই চলিতেছিল—এবার আরম্ভ হইল ব্রিটেনের উপর হিটলারের বিমান আক্রমণ।

সাধারণ ভাবে এই ব্রিটেনের যুদ্ধকে তিন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায় ৮ই আগষ্ট হইতে ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত। গোয়েরিং-এর লুফ্‌ৎভাফে বিজয়গর্বে মত্ত হইয়া দিবাভাগে আকাশ ছাইয়া আসিতে লাগিল—প্রথম লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী বা কনভয় ও বাণিজ্যঘাটি ও বন্দর, (পোর্টল্যাণ্ড, ডোভার প্রভৃতি), তারপর ব্রিটিশ বিমানের নিকট ব্যাহত হইয়া লুফৎভাফের লক্ষ্য হয়—উপকূলস্থ বিমানঘাটি (ডোভার, ডিল, কেনলি ইত্যাদি)। য়ু ৮৭ (ছোঁ-মারা বিমান), ডো ১৭, য়ু ৮৮, হে ১১১ প্রভৃতি বোমারু বিমান ১০।১৫ হাজার ফিট উপরে থাকিত; ইহাদের পাহারায় থাকিত আরও ৫।১০ হাজার ফিট উপরে মে ১০৯, মে ১১০ প্রভৃতি জঙ্গী-বিমান। এই সমাবেশে

বোমারু বিমানের রক্ষা সুসম্ভব নয়; কিন্তু মদগর্বিত লুফৎভাফে সেদিকে দৃষ্টি দিল না। তাই ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান স্পিটফায়ার ও হারিকেন্ এবং রয়াল এয়ার ফোর্সের দুঃসাহসী বিমানবীরদের হাতে লুফৎভাফে মার খাইতে লাগিল। এই অধ্যায়ে মোট ২৬ বার বড় বড় আক্রমণ হয়—রুদ্ধ আক্রোশে এক-এক দিন ৫০০।৬০০ জার্মান বিমানও ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে থাকে। দশ দিনের শেষে দেখা গেল লুফ্‌ৎভাফে হারাইয়াছে মোট ৬৯৭ খানা বিমান ও তাহার বৈমানিক—আর. এ. এফ. ১৫৩ খানি, উহাদের আবার ৬০ জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছে (বিমানযুদ্ধে বিমান হারানো অপেক্ষা বৈমানিক হারানো কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়)। কিন্তু ১০ দিনের পর গোয়েরিং থামিল—প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। ব্রিটেনের বাণিজ্যতরী বা বন্দর বিনষ্ট হয় নাই—ক্ষতি হইলেও বিমানঘাটিগুলি অটুট রহিয়াছে। পাঁচ দিনের মত জার্মানরা নীরব রহিল—অবস্থাটা বিবেচনা করিতে লাগিল।

তারপর আরম্ভ হইল দ্বিতীয় অধ্যায়—২৪শে আগষ্ট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবার জার্মানির লক্ষ্যস্থল—ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ বিমানকেন্দ্র সমূহ, বিমানঘাটি ও বিমান-কারখানা সমূহ। হয়তো গোয়েরিং মনে করিয়াছিল উপকূলের ঘাটির মত সেগুলি অত সুরক্ষিত হয়। তাই এবারকার আক্রমণের লক্ষ্য-ক্ষেত্র হয় বিস্তৃত; উহাতে জার্মানি বোমারুদের রক্ষায় জঙ্গী-বিমানও নিযুক্ত করে বেশি; বোমারুর দলও হইল ক্ষুদ্রতর; আর জঙ্গী বিমান উপরে, নীচে ও দুই পার্শ্বে এবার উহাদের ঘিরিয়া

রাখিত; দিন অপেক্ষা রাত্রিতেই আক্রমণ বাড়িতে লাগিল। ২৪শে আগষ্ট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই অধ্যায়ে অন্তত ৩৫ বার বড় বড় আক্রমণ হয় নানা লক্ষ্য বস্তুর উপর। পোর্টস্মাউথ, সাউদাম্‌টন প্রভৃতি বন্দর তো লক্ষ্য বস্তু ছিলই—কেন্ট, এসেকস্ ও টেমস্ অববাহিকার বেসামরিক বাসিন্দারাও বাদ যায় নাই। এক দিনেই (৩০শে আগষ্ট) ৮০০ বিমান আভ্যন্তরীণ বহু বিমান-ঘাটিতে হানা দিল। এই অধ্যায়ে শেষ পর্যন্ত লুফংভাফে খোয়াইল ৫৬২ খানি বিমান ও তাহার বৈমানিক; আর আর. এ. এফ. ২১৯ খানি—উহারও ১৩২ জন ব্রিটিশ বৈমানিক তবু রক্ষা পাইল।

এই বারো দিনের পরে জার্মানরা কি ভাবিল তাহারাই জানে,—হয়তো ভাবিল, ব্রিটেনের বিমান-শক্তি নিস্তেজ হইয়াছে, এবার লণ্ডন আক্রমণ করিলেই হয়। হয়তো ভাবিল, খেলার দুই দানে জার্মানি ঠকিয়াছে, এখন শেষ দানে শত্রুকে মাৎ করিতে হইবে; অতএব লণ্ডন লইয়াই পড়া যাক। যাহাই ভাবুক—তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল লণ্ডনের বিরুদ্ধে।

৭ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রায় বরাবর লণ্ডনের উপর এই যুদ্ধ চলে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ে শুধু দিনের বেলাই ৩৮ বার প্রধান আক্রমণ হয়। ৭ইয়ের আক্রমণ শুরু হয় লণ্ডনের ডক এলেকায়। লণ্ডনের প্রভূত ক্ষতি হইল, কিন্তু জার্মানিও হারায় ১০৩ খানা বিমান। ইহার পরে খাঁটি লণ্ডন যে ভাবে বোমায় বিদগ্ধ ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল তাহা সুবিদিত। ১৫ই সেপ্টেম্বর এই ধ্বংসলীলা চরমে উঠে—সকালে ও বিকালে দুই

বার ২৫০ খানা করিয়া জার্মান বিমান হানা দিতে আসে; ১৮৫ খানি ধ্বংস হয়। তবু জার্মান প্রয়াস শেষ হইল না। ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত জার্মানি এই লণ্ডনের যুদ্ধেই মোট ৮৮৩ খানা বিমান খোয়াইয়া ব্যর্থ হইল—লণ্ডনবাসী ও আর. এ. এফ. অপরাজেয় রহিল। ব্রিটেনের প্রায় ৪,৫০০ অধিবাসী বিমান আক্রমণে প্রাণ হারায়, প্রায় ১৩,০০০ আহত হয়। কিন্তু ব্রিটেন বিজয় সুদূর হইয়া উঠিলেও জার্মান বিমান নিরস্ত হইল না; ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত আক্রমণ চলিল। আক্রমণ বেশি হইত রাত্রে। দূর পাল্লার বোমারু-বিমানের পরিবর্তে এবার প্রযুক্ত হইতেছিল ছোট পাল্লার জঙ্গী-বোমারু, অর্থাৎ মে ১০৯ ও কিছু কিছু মে ১১০। জার্মান বিমান রহিত সময়ে সময়ে প্রায় অলক্ষ্যে—৩০ হাজার ফিট উপরে আকাশে। ততক্ষণে ব্রিটিশ বিমানঘাটিও প্রথম দিক্‌কার ক্ষতি সামলাইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত এই ব্রিটেনের যুদ্ধে—৮ই আগষ্ট হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত—লুফৎভাফে অন্তত পক্ষে ২৩৭৫ খানা বিমান ও উহার বৈমানিদের হারাইল, আরও অনেকে হয়তো আর ঘাটিতে ফিরিতে পারে নাই; অন্যদিকে আর. এ. এফ.-এর ৩৭৫ জন বিমান-চালক হয় হত, এবং ৩৫৮ জন চালক হয় আহত। গোয়েরিং প্রায় নিজের ব্যর্থতা মানিয়া লইল।

অবশ্য এইখানেই 'ব্রিটেনের যুদ্ধ' শেষ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া জার্মানির বিমান আক্রমণ বন্ধ হয় নাই। বরং ৩০শে ডিসেম্বরের (১৯৪০) লণ্ডনে আগুনে-বোমার, ৫-৬ই জানুয়ারীর (১৯৪১) কার্ডিফে ও ব্রিষ্টলে বোমার ধ্বংস এক বিভীষিকার

অধ্যায়। তবে শীতের আকাশে কিছুদিন মেঘ ও ঝড়ে বিমান যুদ্ধ দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু মার্চ মাসে পড়িতেই আবার লুফৎভাফের ব্রিটেনে আক্রমণ বাড়ে, এবং মে মাস পর্যন্ত সে আক্রমণ বরাবর চলে—অবশ্য তখন অন্যান্য রণক্ষেত্রে, যথা আটলান্টিকে, বল্কানে, আফ্রিকায়, নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে; ব্রিটেনকে এইভাবে পরাজিত করার আশা জার্মানির ফুরাইয়া আসিতেছে, দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ প্রায় তাহার নিকট অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। তাই মে মাসের পর হইতে লুফৎভাফে আর ব্রিটেনে তত আক্রমণ চালাইল না—ক্রীটে আবার তাহার সার্থকতা দেখাইল; তাহার পরে রুশ রণাঙ্গনেই তাহার শক্তি নিয়োজিত করিতে হইল। ১৯৪১-এ ব্রিটেনে বেসামরিক অধিবাসীদের প্রায় ১৯ হাজার বিমান আক্রমণে হত হয়, আর আহত হয় প্রায় ২০ হাজার। তখন হইতে ব্রিটেনও উল্টা বিমান আক্রমণে অগ্রসর হইয়া যায়। অবশ্য বরাবরই ব্রিটিশ বিমানও জার্মানি আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। ফ্রান্সের পতনের পূর্বেও রুর প্রদেশের কারখানায় তাহারা বোমা ফেলিয়াছিল। এখন ১৯৪১-এর শেষদিক হইতে ফ্রান্সের উপকূলে, জার্মানিতে ইতালিতেও দ্বিগুণ উৎসাহে সর্বত্র ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ চালাইল। ইহাতে এই বিমান বহরেরও ক্ষতি হইল খুব। কিন্তু এই সময়ে (১০ই নবেম্বর, ১৯৪১) চার্চিল ঘোষণা করেন বিমান-শক্তিতে ব্রিটেন জার্মানির সমতুল্য হইয়াছে।

শুধুমাত্র বিমান-প্রয়োগে একটা দেশ জয় করা যায় কিনা,

অন্তত শিল্পোন্নত একটা দেশের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করিয়া তাহার যুদ্ধেচ্ছা নষ্ট করা যায় কিনা, এই ব্রিটেনের যুদ্ধে একটা হিসাবে তাহার পরীক্ষা হইল। ইহার পূর্বে জার্মান বিমান অন্য বলের সহকারীরূপে কাজ করিয়াছে ফ্রান্সে, পোল্যাণ্ডে, নরওয়েতে; ব্রিটেনে উহা স্বাধীনভাবে (Independent Air Action) প্রযুক্ত হয়। বুঝা গেল শুধুমাত্র বিমান বলে যুদ্ধের লক্ষ্য আয়ত্ত করা যায় না। অবশ্য ক্রীটে পরে প্রায় বিমান বলেই জার্মানি সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ক্রীটের যুদ্ধ ও ব্রিটেনের যুদ্ধের তুলনা চলে না। চলে না বলিয়াই ক্রীট জয়ের পরেও জার্মানি আর ব্রিটেনে আক্রমণ চালাইল না, বরং একেবারে যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দিতে চাহিল রুশিয়া আক্রমণ করিয়া। ক্রীটে ব্রিটেনের বিমানঘাটি প্রায় ছিল না, বিমান প্রায় ছিল না, ভূমিতে বা আকাশে বিমানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল না। সে ব্যবস্থা ছিল বহুদূরে—মিশরের উপকূলে। ক্রীটের ব্রিটিশ নৌ-পাহারাও তাই সমুদ্র উপকূলে সহজেই জার্মান বিমানের লক্ষ্যস্থল হয়, মার খায়। অন্যদিকে ব্রিটিশ হোম্ ফ্লিটের অবাধ গতি ও অপর্যাপ্ত শক্তি জার্মানির ব্রিটেন আক্রমণ অসম্ভব করিয়া তোলে। ক্রীট ছোট দ্বীপ, ব্রিটেন বড়; ক্রীটের অধিবাসী অল্প, বিমানবাহিত জার্মান সৈনিকদের সঙ্গে তাহারা আটিয়া উঠিবে কিরূপে? ব্রিটেনের প্রায় ৫ কোটি লোক; সৈন্যের অভাব নাই; তাহা ছাড়াও জনগণ জার্মান-আক্রমণে নিজেরাই ২০ লক্ষ গৃহরক্ষী বা হোম গার্ড গঠন করিয়া প্রস্তুত হইতেছে। শুধু বিমান-বাহিত সৈনিক তো দূরের কথা, উপকূলের ব্রিটিশ

বিমান-ঘাটি ধ্বংস করিয়া যদি বা লুফৎভাফে একইকালে কোথাও উপকূলস্থ আকাশে ও সমুদ্রে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত এবং তাহার ফলে ব্রিটেন আক্রমণের জন্য অন্তত সেই উপকূল ও সমুদ্রে জার্মানির অবাধগতি (freedom of movement) লাভ হইত—জাহাজে, বজরায়, লঞ্চে, বিমানে জার্মানদের ব্রিটেনে অবতরণ সম্ভব হইত, ব্রিটেনে বরাবর সৈন্য প্রেরণ অক্ষুণ্ণ থাকিত, খাদ্যোপকরণ, যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ (supplies) করা চলিত,—তাহা হইলেও ব্রিটেনের ভূমিস্থিত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা, সৈন্য ও গৃহরক্ষীদের বাধা, আকাশের বিমান-প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি সাগরে ব্রিটিশ নৌবলের অতুলনীয় সামর্থ্যের নিকটে সেই পরিকল্পিত জার্মান আক্রমণকারীদের কি দশা হইত, তাহা বলা সহজ নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী যতই অকর্মণ্য হউক, ব্রিটেনের জনগণ স্বগৃহে আক্রান্ত হইলে কি দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল এই বিমান-আক্রমণের কয় মাসে। আর ব্রিটিশ স্বদেশপ্রীতি যে মরে নাই, এই সময়েই তাহারও প্রমাণ দিল—অক্লান্ত আর. এ. এফ. ও নির্বাক, অতন্দ্র ব্রিটিশ হোম্ ফ্লিট্।

ব্রিটেনের যুদ্ধে দেখা গেল নাৎসি জার্মানির প্রথম ব্যর্থতা, দেখা গেল দুহে (Douhet)-কথিত বিমান-বাদের নিষ্ফলতা,—শুধুমাত্র বিমান-বলের (Independent Air Action) যুদ্ধজয়ে অক্ষমতা। এইজন্যই এই যুদ্ধ এতটা বিষদভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু তাই বলিয়া বিমান যে এ যুগের প্রধান অস্ত্র হইয়া

উঠিয়াছে, তাহা ইহা দ্বারা অপ্রমাণিত হয় নাই; প্রমাণিত হইল শুধু এই যে, একমাত্র বিমান দ্বারা শত্রুর ভূমিস্থিত আকাশস্থিত ও সমুদ্রস্থিত সম্মিলিত প্রতিরোধ বিনষ্ট করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য বলে মোটামুটি সমান হইলে বিমানে শ্রেষ্ঠতা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হয়। আরও একটি কথা, এই ব্রিটেনের যুদ্ধে বুঝা গেল যন্ত্র হিসাবে ব্রিটিশ বিমান উন্নত জিনিস, ব্রিটিশ বৈমানিক যোদ্ধা হিসাবে দুর্জয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা— জনগণ যেখানে দৃঢ়সঙ্কল্প সেখানে বিমানের বিভীষিকায় উল্টা ফলই ফলে। লণ্ডনের বহু পাড়া শ্মশান হইল, কভেন্ট্রির মোটর-কারখানা নিশ্চিহ্ন হইল, বোষ্টন বিনষ্ট হইল, রেমস্‌গেট পুড়িয়া ছাই হইল;—কিন্তু লুফ্‌ৎভাফে পরাজয় স্বীকার করে—ব্রিটিশ বিমান-বল বা নৌবলের কাছে নয়—ব্রিটেনের জনগণের কাছে।

দীর্ঘকালীন যুদ্ধের আয়োজন

'ব্রিটেনের যুদ্ধ' নিষ্ফল হওয়ায় যুদ্ধ শেষ হইল না। হের হিটলার দেখিলেন, যুদ্ধ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। দীর্ঘযুদ্ধ ব্রিটেনের অভিপ্রেত; কারণ তাহা হইলে তাহার বিপুল সাম্রাজ্যের ধনবল ও জনবল সে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিতে পারিবে এবং কূটনৈতিক পথে মার্কিন মুলুকের নিকট যুদ্ধ-শিল্প ও আর্থিক সাহায্য পাইবে; এমন কি, রুজভেল্টকে হয়তো একেবারে যুদ্ধেও নামাইতে পারিবে। হিটলার বাধ্য হইয়া দীর্ঘযুদ্ধের জন্য

আয়োজন করিলেন—সমুদ্রে ব্রিটেনকে ব্লকেড বা ঘরবন্দী করিতে চেষ্টা করিয়া—'আটলান্টিকের যুদ্ধ' ইহাই ;—এবং ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-পথ ছিন্ন করিয়া। আর স্থল-পথে তাঁহাদের চেষ্টা হইল—ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা; মিশর ও সুয়েজ খালের অধিকার ব্রিটেনের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া এবং দক্ষিণ ইউরোপের বল্কান-মণ্ডলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ তাহা হইলে মিশর পালেষ্টাইন হইতে জার্মানির এই পিছনের দুয়ার দিয়া ব্রিটেন আর বল্কান-মণ্ডলে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু সমস্ত ইউরোপের সামরিক সামর্থ্য ফ্যাশিস্ত-চালনায় সংহত করা যাইবে, ইতালির মারফৎ আফ্রিকার কাঁচা মালও চক্রশক্তির হস্তগত হইবে, এবং এইরূপে দীর্ঘযুদ্ধেও এবার আর জার্মানি ঘরবন্দী হইবে না—উল্টা বরং ব্রিটেনই ঘরবন্দী হইবে।

এখন হইতে বরাবর তাই বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে একই সময়ে যুদ্ধ চলিল, একটি আক্রমণে আর যুদ্ধ শেষের আশা রহিল না। জার্মানি যেরূপ যুদ্ধ চালাইতেছিল তাহাই তখনো অবশ্য চালাইল, —বিদ্যুদাক্রমণ থামিল না, এক এক করিয়া দেশ জয়ও চলিল। এক-একটি ক্ষেত্রে এক-এক বারে নিজ বল কেন্দ্রিত করিয়া তখনকার মত সেই রণাঙ্গনে সে তাহার বলাধিক্য ঘটাইত এবং যুদ্ধের উদ্যোগ (initiative) নিজ হাতে রাখিত। মোটের উপর হিটলারের সুযোগও ছিল—তাহার বল বহুব্যাপ্ত হইল বটে, কিন্তু ইউরোপের মধ্যস্থল হইতে উহা নানাদিকে চালিত হইতে

পারিল ;—ব্রিটেনের মত তাঁহার বল বিক্ষিপ্ত হইল না। আর বহুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিলেও মোটের উপর জার্মানির একাধিক রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে হইল না—ভূমধ্যসাগরের ক্ষেত্রে ইতালিই প্রধানত প্রয়োজন জোগায়। তবু বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র পরস্পর সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়; দীর্ঘযুদ্ধের এইরূপ নানা ছোট বড় ঘটনা কোনোটিই একান্ত নয়। সবগুলি যুদ্ধ সমান গুরুতরও নয়। শুধু দেখা দরকার—মহাযুদ্ধের গতিপথে বড় বড় রাজনীতিক মোড়গুলি আর উল্লেখযোগ্য খণ্ড যুদ্ধগুলির সামরিক সাক্ষ্য ও ফলাফল।

(৬) আটলাণ্টিকের যুদ্ধ

'ব্রিটেনের যুদ্ধে'র আর একদিক 'আটলাণ্টিকের যুদ্ধ'—অথবা জার্মানির দ্বারা ব্রিটিশ বাণিজ্য বিনাশের যুদ্ধ। প্রধানত আটলাণ্টিকই উহার ক্ষেত্র। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই এ চেষ্টা শুরু হয়; ইতালি যুদ্ধে যোগ দিলে ভূমধ্যসাগরে উহারই আর এক দিক খুলিয়া যায়। এ যুদ্ধ আজও সাত সাগরে সমানে চলিতেছে। ইহার ঘটনাবলী অজস্র। বাণিজ্য জাহাজ ডুবিতেছে সব সময়েই, মাঝে মাঝে দুই-একটি নৌ-জাহাজও ইহাতে ডুবিতেছে। কিন্তু সম্ভবত সত্যকারের নৌযুদ্ধ হইবে এবার প্রশান্ত মহাসাগরে।

নৌযুদ্ধ এবারকার জার্মানির ঈপ্সিত নয়। কারণ জার্মানির তত নৌবল নাই (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৩)। অতএব, এবারকার জার্মানির নৌ-ষ্ট্র্যাটেজি হইল—বাণিজ্য-যুদ্ধ। তাহার রণপদ্ধতি

—যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই নিজের যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি লইয়া সমুদ্রে বাহির হইয়া পড়া, সেখানে শত্রুর বাণিজ্য-পথ বন্ধ করা। এই কাজে জার্মানির প্রধান অস্ত্র অবশ্য ডুবোজাহাজ; তাহার পরেই স্থান তাহার দূর পাল্লার বোমারু বিমান ও সামুদ্রিক বিমানের; তৃতীয়ত নানা যুদ্ধ জাহাজ ও সশস্ত্র বাণিজ্য জাহাজের, আর শেষে চুম্বক মাইন ও শব্দভেদী মাইনের। ইহার বিরুদ্ধে ব্রিটেনও অবলম্বন করে যুদ্ধ-জাহাজের ও নৌ-বিমানের পাহারায় (convoy) বাণিজ্য জাহাজ চালানো, আর তাহাদের নূতন মাইন-ঠেকানো বেড়ায় জাহাজ সুরক্ষিত করা, মাইন-ঝাঁটানো জাহাজে মাইন ঝাঁটাইয়া ফেলা, শত্রুর ডুবোজাহাজ বিনষ্ট করা ইত্যাদি—শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি পাইলে তো কথাই নাই।

ছোট বড় ঘটনা উল্লেখ না করিয়া শুধু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই বুঝিয়া রাখা উচিত। যুদ্ধারম্ভে জার্মান কৃতিত্ব দেখা যায় বিমানবাহী জাহাজ 'কারেজিয়াসে'র ধ্বংসে (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯); ব্রিটেনের অসাবধানতার প্রমাণ মিলেস্কাপা ফ্লোতে ব্যাটলশিপ 'রয়েল ওকের' বিনাশে (১৪ই অক্টোবর)। ব্রিটিশ নৌবল কার্যশক্তির প্রমাণ দিল পকেট ব্যাটলশিপ গ্রাফ্ স্পির সঙ্গে যুদ্ধে ১৩ই ডিসেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার মন্টিভিয়োডোর নিকটে। গ্রাফ্ স্পি পরে আত্মসংহার করিয়া নিস্তার পায়। কিন্তু পকেট ব্যাটলশিপের গতি ও কামানের পাল্লা ছিল বেশি, ব্রিটিশ নৌসেনার নিকটে তাহা ব্যর্থ হইল; এই যুদ্ধের গুরুত্ব এইখানে। ইহার পরে আসে নাভিকের যুদ্ধ—প্রমাণ

হয়, বিমানের সম্মুখে যুদ্ধ-জাহাজ নিঃসহায় নয়। ইহার পরে আটলান্টিকের সর্বপ্রধান ঘটনা। নবনির্মিত জার্মান ব্যাটলশিপ 'বিসমার্ক' তখন সমুদ্রে বাহির হইয়াছে। ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ রণতরীগুলি তাহাকে আগলাইতে ছুটে। 'বিসমার্ক' অবশ্য বিনষ্ট হইল পরে (২৭শে মে, ১৯৪১); কিন্তু উহার নৌ-সেনার অপূর্ব দক্ষতা ও সাহসের কথা মানিতেই হইবে। ২৩ হাজার ফিট দূর হইতে উহাদের প্রথম একটি গোলাতেই 'হুডে'র মত ব্রিটিশ ব্যাট্‌ল্‌ক্রুজার একেবারে ফাটিয়া শেষ হইয়া গেল (২৩শে মে), নূতন ব্যাটলশিপ 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌ও' ঘায়েল হইল। গত যুগ হইতে যে শিক্ষা টিরপিৎস্ জার্মান নৌ-সেনাদের দিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হয় নাই। অবশ্য ইহার পরে 'বিসমার্ক'কে তাড়া করিয়া টর্পেডোর পর টর্পেডোতে বিনাশ করা, ব্রিটিশ নৌবল ও নৌবিমানের সংযোজনার ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক। তাহা আরও গুরুতর এইজন্য যে, ইহার ফলে জার্মান ব্যাটলশিপ আর বাহির সমুদ্রে ব্রিটিশ রণতরীর সম্মুখীন হইতে চাহে নাই। তথাপি ব্রেষ্ট হইতে গ্রেসেনাউ ও শার্নহোরষ্টের (মার্চ, ১৯৪২), বিমান-ছত্রের অন্তরালে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া ব্রিটিশ বিমানবহর ও নৌবহরের পক্ষে লজ্জার কথা—অবশ্য তখন সাত সাগরে ব্রিটিশ নৌবল ছড়ানো, প্রশান্ত মহাসাগরে সে আহত, কোনো একটি ক্ষেত্রে সে আর একা সর্বেসর্বা নয়।

কিন্তু আটলান্টিক যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য নৌযুদ্ধ নয়—ব্রিটেনের সরবরাহ বন্ধ করা। সেই হিসাবে ইহা প্রধানত জাহাজ-ডুবির

হিসাব ও পাল্টা ডুবোজাহাজ বিনাশের হিসাব। সত্য জানিবার উপায় নাই। মোটামুটি তবু কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার—প্রথমত, শত সত্ত্বেও ব্রিটেনের বাণিজ্য এখনো চলিতেছে আর জার্মানি ও ইতালি বাহির সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে পারে না। এই হিসাবে ব্রিটিশ নৌবহরের কার্যকারিতা মানিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, জার্মান-বিজিত দেশগুলি হইতে ব্রিটেন প্রায় মোট ৬০ লক্ষ টন জাহাজ পাইয়াছে,—উহাদের অনেক বাণিজ্য জাহাজই ব্রিটেনে চলিয়া আসে, জার্মানির হাতে পড়ে নাই। কিন্তু ফ্রান্সের ও নরওয়ের যুদ্ধের পরে ব্রিটেনেরও বাণিজ্য-পথ খুব বিপদসংকুল হয়। ক্ষতিও বেশি হইতে থাকে। হিটলার ডুবোজাহাজের ভয় দেখাইতে থাকেন, মিঃ চার্চিলও উহার সামরিক গুরুত্ব স্বীকার করেন। এই অবস্থায় অবশ্য ব্রিটেনেরও সাহায্য জুটিল—প্রথমত, পশ্চিম সমুদ্রে কয়েকটি ব্রিটিশ দ্বীপের ঘাটি ইজারা লইয়া রুজভেল্ট ৫০ খানি পুরানো ডেষ্ট্রয়ার বিক্রী করিলেন (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০)। তাহা ছাড়া, রুজভেল্ট আইসল্যাণ্ডে নিজে ঘাটি করিলেন; উহার কিনারা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজকে নিরপেক্ষ আমেরিকাই রক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরে আজ তো আমেরিকাই যুদ্ধে নামিয়া পড়িয়াছে। এদিকে ব্রিটেনের জাহাজ-তৈরীর ঘাটিতে, কানাডায়, বিশেষ করিয়া আমেরিকায় বাণিজ্য-জাহাজ তৈরী হইতেছে। এই তৈরীর পরিমাণ এখন প্রায় অভাবনীয়—দিনে তিনখানা করিয়া জাহাজ আমেরিকা ভাসায়, এক সেপ্টেম্বরেই (১৯৪২) মোট ১০ লক্ষ ৯০ হাজার টনের জাহাজ আমেরিকা

তৈরী করিয়াছে। কিন্তু এই তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ? আজকাল এই হিসাবে কেহই বাহির করে না। ৫ই জুলাই ১৯৪২, জাহাজ ডুবির শেষ হিসাব বাহির হয়। সে পর্যন্ত যুদ্ধে জানা যায় ব্রিটেন ও তাহার বন্ধুদের মোট ৭১ লক্ষ টন পরিমাণ ১৭৩৮ খানা জাহাজ ডুবিয়াছে—সপ্তাহে গড়ে ডুবিয়াছে ৩॥০ লক্ষ টন জাহাজ। ইহার পরে ১২ই নবেম্বর (১৯৪১) চার্চিল বলেন, পূর্ব তিন মাসের গড়পড়তা সাপ্তাহিক ক্ষতি ৭॥০ লক্ষ টনের মত। আমেরিকা জানায়, যত জাহাজ তৈরী হইতেছে তাহার অপেক্ষা বেশি ডুবিতেছে। এই অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন হইয়াছে, কারণ আজ তৈরীর পরিমাণ ভয়ানক; তবু ক্ষতির পরিমাণও গুরুতর। কিন্তু কথা এই যে, মিত্রশক্তির 'কনভয়' এখনো শত্রুর আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া মাণ্টাতে, ভারতবর্ষে, মুর্মান্স্কে পর্যন্ত যাতায়াত করে।

এখনো এই বাণিজ্য-যুদ্ধ অনিশ্চিত। তবে মনে রাখা দরকার, দীর্ঘ কালীন সমর-সমাবেশ হিসাবে জার্মানির নিকট ইহার গুরুত্ব খুব বেশি; ইহাই সমুদ্রে তাহার প্রধান ষ্ট্র্যাটেজি।

(৭) ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধ

এই কথা অনেকেই ভাবিতে পারে নাই যে, ফ্রান্সের পতনের পরে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবল ও নৌঘাটি আর টিকিতে পারিবে। ইতালির নৌশক্তি, বিশেষত ১০০ ডুবোজাহাজ ও

নৌঘাটিগুলি, কাজে লাগাইলে ব্রিটেনের দুরবস্থাই হইত। কিন্তু উহার বদলে দুরবস্থা হইল ইতালির। জার্মানি বল্কান-মণ্ডল ও ক্রীট দ্বীপ জয় না করা পর্যন্ত ও ভূমধ্যমণ্ডলের সমর-ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত ব্রিটেনের ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে অব্যাহত ছিল—১৯৪১-এর শেষ দিক হইতে তাহা আর নাই। ইহার মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটে তাহা ইতালির অকর্মণ্যতার ও ব্রিটিশ নৌবলের যোগ্যতার প্রমাণ—অবশ্য ওরাঁও-স্থিত ফরাসী নৌবলকে (৩রা জুলাই, ১৯৪০) শাসন করা ইহার অন্তর্গত নয়। ইহার মধ্যে ১১ই-১২ই নবেম্বরের (১৯৪০) টারাণ্টোর জাহাজ-ঘাটিতে ব্রিটিশ বিমানের টর্পেডো আক্রমণই প্রধান জিনিস। ইতালির মোট ৬ খানা ব্যাটলশিপের ৩ খানা সেখানেই ঘায়েল হয়। আর ইহাতে দেখা গেল নৌবলের উপর নৌ-বিমান-টর্পেডোর আক্রমণ একেবারে মোক্ষ অস্ত্র—এইভাবে খানিকটা বাতিল হইল নার্ভিকের শিক্ষা; দেখা গেল বিমান কি ভাবে ব্যাটলশিপকেও নষ্ট করিতে পারে। ব্রিটেনই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত দেখাইল এই টারাণ্টোতে, এবং দ্বিতীয়বার প্রমাণ দিল 'বিসমার্কে'র সংহারে (২৭শে মে, ১৯৪১); কিন্তু তথাপি জাপানী বিমানের মুখে ব্রিটিশ ব্যাটলশিপ (৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪২) 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ও 'রিপালেস' যেন নিয়তি-চালিত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। অবশ্য, ভূমধ্যসাগরে নৌ-সমাবেশের দিক হইতে মাতাপান অন্তরীপের যুদ্ধও (২৮শে মার্চ, ১৯৪১) খুব গৌরবের। সেখানেও নৌ-বিমানের হাতে ইতালীয় ব্যাটলশিপ প্রভৃতি ঘায়েল হয়—

৩ খানা ব্যাটলশিপ, ১১ খানা ক্রুজার লইয়া ইতালীয় নৌবহর বহু বল সত্ত্বেও বহু ঘা খাইয়া পালাইতে থাকে। ইহার পরে উভয় পক্ষের নৌযুদ্ধ দাঁড়াইয়াছে—'আফ্রিকার' যুদ্ধের একাংশরূপে—কি করিয়া সেখানে মাল-সরবরাহ বন্ধ করা যায়, উহাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ১৯৪২এ নানাক্ষেত্রে ব্রিটিশ নৌ-বলের ডাক পড়ায় ক্রমশই ভূমধ্যসাগরে তাহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—তাহার ক্ষতিও ক্রমশ বাড়িয়াছে। ১৯৪১এর জানুয়ারীতেই ব্রিটিশ নৌবল হারায় নৌ-বিমানবাহী রণতরী 'গ্লোরিয়াস্' ও ক্রুজার 'সাউদামটান'; তাহার পরে ডুবিল ক্রীটের উপকূলে ৩ খানা ক্রুজার ও ১ খানা বিমানবাহী জাহাজ; আর পরে ডুবো-জাহাজের ঘায়ে ডুবিল সুপ্রসিদ্ধ বিমানবাহী 'আর্ক রয়েল'; আহত হইল ব্যাটলশিপ 'নেলসন'; ও ডুবিল ব্যাটলশিপ 'বরহাম'।

এই সবে মিলিয়া ক্রমেই ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের ক্ষমতা খর্ব হইয়াছে। ফলে 'আফ্রিকার যুদ্ধে'ও ব্রিটেনের অসুবিধা দেখা দিয়াছে। তথাপি মনে রাখিবার মত কথা এই যে, জিব্রাণ্টার, মাণ্টা, সাইপ্রাস, হাইফা ও আলেকজেন্দ্রিয়া এই সব ঘাটি আজও অবিজিত। বিশেষ করিয়া মাণ্টা যে টিকিয়া আছে ইহা বোধ হয় এই ভূমধ্যজগতের যুদ্ধের প্রধান বিস্ময়বস্তু। বিমান-বলে ক্রীট জয় হইল, কিন্তু মাণ্টা কেন রহিল অপরাজেয়? কারণ মাণ্টার প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও অসাধারণ। মাণ্টার জন্যই এখনো 'আফ্রিকার যুদ্ধে'ও চক্রশক্তি অবাধে রোমেলকে মাল সরবরাহ করিতে পারে না।

(৮) বল্কান-মণ্ডলের যুদ্ধ

বল্কান-মণ্ডলে যুদ্ধ আসিতেই ছিল। ফ্রান্সের পতনে এই রাষ্ট্রগুলির বুঝিতে বাকী ছিল না, এইবার হের হিটলার তাহাদের ভাগ্য-বিধাতা। রুমানিয়া ও গ্রীস ছিল মিত্রশক্তির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। রুমানিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চাহিল প্রথম। নবেম্বরে নাৎসি 'নব-বিধান' ঘোষিত হইলে হ্যাঙ্গেরি, শ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল— রুমানিয়ার বৎসরের ৬৬ লক্ষ গ্যালন তেল এবং প্রচুর শস্য ও খাদ্য নাৎসিদের করায়ত্ত হইল। যুগোস্লাবিয়া ও বুলগেরিয়া ইতস্তত করিতেছিল। এ সময়ে গ্রীসেও মুসোলিনি যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রথম দিকে তাঁহার সুবিধা হইল, কিন্তু একটু পরেই গ্রীক স্বদেশ-প্রীতি ও সাহসের নিকট বারবার ইতালির পরাজয় ঘটিতে লাগিল। গ্রীকেরাই উল্টা এলবেনিয়ায় ঢুকিয়া করিট্জা দখল করিল— ইতালির সেনাপতি মার্শাল বোডাগ্লিওকে পদচ্যুত করিয়াও মুসোলিনি আপনার মান রাখিতে পারিলেন না। বিশেষত ততক্ষণে (৯ই ডিসেম্বরের পর) মিশরেও ওয়াভেলের হাতে ইতালির পরাজয় শুরু হইয়াছে। গ্রীসের হাতে যখন মুসোলিনির লাঞ্ছনা ঘটিতেছে তখন 'নব-বিধানের' নেতা হের হিটলারের পক্ষে গ্রীসে হস্তক্ষেপ অনিবার্য হইয়া উঠিল। প্রথম দরকার যুগোস্লাবিয়া ও বুলগেরিয়াকে হস্তগত করা। কিন্তু স্লাব জাতের টান চিরদিন রুশদের প্রতি। অতএব বল্কান অঞ্চলে এই

কূটনৈতিক ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিল—চক্রশক্তি, সোভিয়েট ও সমুদ্রোপকূলে ব্রিটেন। সোভিয়েট তখনও নাৎসিদের বন্ধু, কিন্তু সে ইউরোপের 'নব-বিধানে' যোগদানে করিতে স্বীকৃত হইল না। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বরং বল্কানের স্লাব রাষ্ট্রগুলিকে হিটলারী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। যুগোস্লাভিয়ার প্রিন্স্ পল্ হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণের শর্ত স্থির করিলেন, কিন্তু বালক রাজা পিটার ও জেনারেল সিমোভিচ (২৭শে মার্চ, ১৯৪০) তাহা নাকচ করিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। ব্রিটেনের পক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করার সময় ছিল না। জার্মানি (৬ই এপ্রিল) গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করিল—যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জার্মান বিমান এক নৃশংস ধ্বংস লীলা চালাইল। ব্লিৎসক্রীগের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল—গ্রীস পার্বত্যদেশ, ট্যাংকের পক্ষেও দুর্গম ; সেখানে মিশর ও পালেষ্টাইন হইতে ব্রিটিশ সৈন্যও আসিয়া পৌছিয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার উপর দিয়া জার্মানরা ষ্ট্রুমিৎজা গিরিপথ (Strummitza Pass) অতিক্রম করিল—গ্রীক ও যুগোস্লাভ সৈন্যেরা বিভক্ত হইয়া পড়িল ; সোলোনিকা (৯ই এপ্রিল) অধিকার করিলে সেখানকার গ্রীক সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হইল। মোনাষ্টির গিরিদ্বারের নিকট ব্রিটিশ সৈন্য বাধা দিতে গেল—তিষ্ঠিতে পারিল না। থার্মোপেলিতেও তাহারা ব্যর্থ হইল। পলায়নমান ব্রিটিশ সৈন্যেরা আবার ডানকার্কের মত ষ্টুকার আক্রমণ মাথায় লইয়া জাহাজে ফিরিতে লাগিল (২৪শে

হইতে ৩০শে এপ্রিল)। ভগ্ন গ্রীক সৈন্যও এপিরুসে আত্মসমর্পণ করিল ২২শে এপ্রিল। পার্বত্য অঞ্চলেও ব্লিৎসক্রীগ্ সার্থক হইল।

গ্রীসের রাজা ও রাজসরকার ক্রীটে গেল। প্রায় এক মাস পরে ২০শে মে হইতে ক্রীটে জার্মান আক্রমণ শুরু হয়। ইহার সামরিক গুরুত্ব পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য 'ব্রিটেনের যুদ্ধ,' পৃঃ ১৭৩)। প্রধানত এই যুদ্ধেই দুহের মতবাদের পরীক্ষা হয়; আর সত্যই পরীক্ষা হয় সার্থক—বিমানবলেই দেশ জয় চলে। গ্লাইডার, সৈন্যবাহী বিমান, জঙ্গীবিমান, বোমারুবিমান লইয়া এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে জার্মানি প্রায় ১০০০ বিমান নিযুক্ত করে, আর ক্ষতি দেয় তেমনি যদৃচ্ছভাবে। ৩১শে মে (১৯৪১) ব্রিটিশ সৈন্য ক্রীটদ্বীপ পরিত্যাগ করে।

ক্রীটের পরে মনে হইল—হয়তো ব্রিটেনেও এইরূপ বিমানের পুনরাক্রমণ হইতে পারে। না হয় জার্মানি এবার সিরিয়ার পথে বা তুরস্কের পথে নিকট-প্রাচ্যে অগ্রসর হইবে। ইরাকে রশিদ আলি অসময়ে (১লা-৩রা এপ্রিল) বিদ্রোহও করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু ৩০শে মে সে বিদ্রোহ নিঃশেষ হয়। এদিকে ৮ই মে তাড়াতাড়ি মিত্রশক্তি সিরিয়া দখল করিতে লাগিয়া যায়। অন্য দিকে মিশরেও ওয়াভেল হাটিতে বাধ্য হইয়াছেন (১২ই এপ্রিল)। মিশরের দিক হইতেও হয়তো আবার নিকট-প্রাচ্যের দিকেই জার্মানি চাপ দিবে—ইহাই ছিল সকলের ধারণা।

কিন্তু বল্কান অঞ্চলের যুদ্ধকালেই একটি কথার আভাস পাওয়া যাইতেছিল—এই অঞ্চলে জার্মান আধিপত্য বিস্তার

সোভিয়েটের পক্ষে আপত্তিকর। ইউরোপে এই দ্বিতীয় মহাশক্তির প্রভাব বিনাশই এবার নাৎসি নেতার লক্ষ্য হইল—আর তাহার আশা ছিল, ইহাতে ব্রিটেনের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ মিটিয়াও যাইতে পারে।

(৯) আফ্রিকার যুদ্ধ

ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ উপকূলে কিন্তু যেরূপ ভাবা গিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। ইতালির উত্তর আফ্রিকায় জলে, স্থলে, আকাশে সৈন্য ও সুযোগ ছিল অপরিমিত। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড তাহার হাতে পড়িল,—মাসোবা বন্দর হইতে সে প্রায়ই আরব সাগরে ঢুকিতে পারে নাই,—সুদান ও কেনিয়ায় ও ব্রিটেন খানিকটা পশ্চাদপদ হইল, জেনারেল ওয়াভেল মিশরেও মাইল ৬০ মরুভূমি ছাড়িয়া নিজের ব্যূহ স্থির করিলেন। কিন্তু ইতালি এদিকে না আসিয়া গ্রীসেই অগ্রসর হইল। সেখানে যখন গ্রীসের হাতে ইতালি ঘা খাইতেছে তখন ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪০-এ জেনারেল ওয়াভেল লিবিয়ার প্রথম অভিযান শুরু করিলেন।

কাইরেনাইকার যুদ্ধের ইহা প্রথম পর্ব। সিদি বারানিতে ভারতীয় সৈন্যদের দুর্ধর্ষ বীরত্বে এই বিজয়ের সূচনা হয় আর বেনগাজী অধিকারে ওয়াভেলের বিজয়পর্ব সমাপ্ত হয়। মরুদেশের এই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের জোয়ার-ভাটা বারবার চলিয়াছে। সুকৌশলী সেনাপতিরা বালু-প্রান্তরে সৈন্য, ট্যাংক প্রভৃতি

চালিবার (manoeuvre) সুযোগ পান ; কিন্তু মরুর বুক দিয়া দীর্ঘপথে সরবরাহ (supplies) হয় সমস্যা। তাই যখনি শত্রু বল-

মরুযুদ্ধের জোয়ার-ভাটা
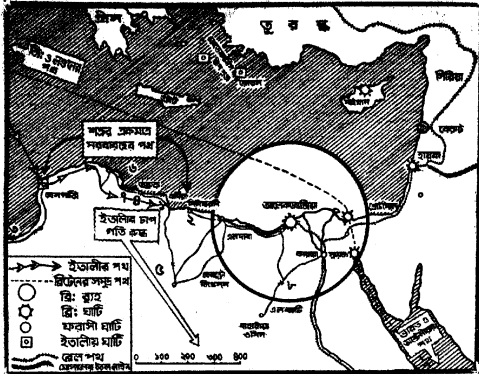
১। ফ্রান্সের পতন কালের অবস্থা ২। ওয়াভেলের আক্রমণ আরম্ভ হয় ৩। ওয়াভেলের প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হয় ৪। তব্রুকে পৌছা যায় ৫। অকিনলেকের আক্রমণ আরম্ভ ৬। রোমেলের প্রতি-আক্রমণ ৭। রোমেলের প্রধান আক্রমণ—অকিনলেকের প্রত্যাবর্তন ৮। আলেকজেন্দ্রিয়ার পথে রোমেলের ব্যূহ।

সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাঘাত করে, তখনি আবার বিজেতাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। ওয়াভেলের হাতে ইতালীয় জেনারেল গ্রাৎসিয়ানির

পরাজয়ের পরে হিটলার মুসোলিনিকে উদ্ধার করিবার জন্য দ্রুতবেগে সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল রোমেল, জার্মান সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইলেন। চক্রশক্তি হৃতবল উদ্ধারের বিপুল আয়োজন করিল। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবার মত ওয়াভেলের বল ও অস্ত্র নাই। মাস দেড়েক পরে, ২৪শে মার্চ, ব্রিটিশের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়; ১২ই এপ্রিল একেবারে বার্দিয়া আসিয়া তাহা শেষ হয়। অবশ্য চক্রশক্তির পার্শ্ব দেশে তব্রুকের ঘাটি অবিজিত রহিয়া গেল। ওয়াভেলের এই যুদ্ধের গুরুত্ব তবে কোথায়? সংক্ষেপে তাহা এই:—(১) ইতালির বিপুল আয়োজনের সম্মুখে ভূমধ্য-উপকূলে ব্রিটেনের টিকিয়া থাকাটাই তখন বিস্ময়ের কথা। (২) ওয়াভেলের কৃতিত্ব এই যে, তিনিই দেখাইলেন যে ব্রিটেনও বিদ্যুদাক্রমণে বা ব্লিৎজক্রীগে সমর্থ; (৩) আর এই ব্লিৎজক্রীগ তিনি চালাইলেন মরুভূমির বুকে, এবং (৪) অপেক্ষাকৃত অল্প বল ও অল্প অস্ত্রশস্ত্র লইয়া; (৫) আর স্থল, জল, ও বিমান-বলের গ্র্যাণ্ড-টাকটিকসের দ্বারা। লিবিয়ায় ইতালির সৈন্যবল ছিল প্রায় ৫ লক্ষ, ব্রিটেনের ২ বা ২॥০ লক্ষ, (একমাত্র ট্যাংকে ব্রিটেন ও ইতালি সম্ভবত সমান ছিল, দ্রষ্টব্য *Battle for the World* p. 200) (৬) লিবিয়ায় ইতালীয় সমরশক্তি একেবারে ইহাতে ভাঙিয়া পড়ে; ১ লক্ষ ২১ হাজার ইতালীয় বন্দী হইল—ওয়াভেলের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার, অন্য দিকে প্রায় দেড় হাজার ইতালীয় কামান, ৩৬৬টি ট্যাংক ব্রিটেনের হাতে পড়ে, ৪৫০টি বিমান বিনষ্ট হয়। বলিতে গেলে ইতালির নৈতিক পরাজয় একেবারে সম্পূর্ণ

হইল—আফ্রিকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইতালির পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়।

আবিসিনিয়ায় ও পূর্ব-আফ্রিকায় ব্রিটেনের জয়লাভ এবং ইতালীয় সাম্রাজ্যের বিলোপ ওয়াভেলের এই অভিযানেরই ফল। একে একে ব্রিটেন সুদানের কাসসালা পুনরাধিকার করিল (১৬-২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১), এরিট্রিয়া, কেনিয়া ও আবিসেনিয়ার তানা অঞ্চল হইতে তিন পথে আবিসেনিয়ায় অগ্রসর হইয়া গেল। একমাত্র কঠিন বাধা মিলল উত্তর এরিট্রিয়ায় কেরেন-এ, বারো দিনে তাহা শেষ হয় (১৫ই মার্চ ১৯৪১)। জেনারেল ক্যানিংহাম ৬ই এপ্রিল আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা অধিকার করেন। ইতালির সেনাপতি ডিউক অব এওষ্টা আম্বা আলাগিতে টিকিয়া ছিলেন ২০শে মে পর্যন্ত; আর দুর্গম গোণ্ডারে ইতালীয় প্রতিরোধ শেষ হয় বর্ষার পরে প্রায় নবেম্বরে। অবশ্য তাহার বহুপূর্বে ওয়াভেলের ক্ষণস্থায়ী বিজয়ও লিবিয়ায় শেষ হইয়াছে—লিবিয়ার যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বও সমাপ্ত হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের সেই দ্বিতীয় পর্বে সেনাপতিরূপে জেনারেল রোমেল উদিত হন; ইহা শেষ হয় ১২ই এপ্রিল (১৯৪১) আন্দাজ। ওয়াভেলের একাংশ সৈন্য গিয়াছিল গ্রীসের যুদ্ধে চক্রশক্তির আক্রমণের সম্মুখে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর পরাজয় [illegible] ক্ষতিকর হয়; মোট ২ হাজার সৈন্য ওয়াভেল হারান। কিন্তু সব চেয়ে গুরুতর কথা, অত্যন্ত দৈবক্রমে তাঁহার প্রধান চারিজন সেনাপতিই আক্রমণকারীদের হাতে বন্দী হইয়া পড়ে। আর

তাহা ছাড়া বুঝা গেল—মিশর বা ভূমধ্য-উপকূল চক্রশক্তির ছায়ায় পড়িতেছে, তাহা রক্ষার জন্য মিত্রশক্তির আরও সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চাই। তবু এই দ্বিতীয় পর্বেও তব্রুকের বাহিনীর আত্মরক্ষা নিজেদের ও ব্রিটিশ নৌবলের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হয় ১৯৪১-এর ১৮ই নবেম্বর জেনারেল অকিনলেকের পুনরাক্রমণে। ইউরোপে তখন সোভিয়েট-রণাঙ্গনে জার্মানি তাহার সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়াছে; আফ্রিকায় পাঠাইবার মত বেশি লোক নাই। তথাপি এল রাজ্জাক হইতে তব্রুক পর্যন্ত পথ করিতে ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রায় ব্যর্থ হইতে হইয়াছিল। ৫ দিন পরে রোমেলের বাহিনী এল আদেম-এও পশ্চাৎপদ হইল, বেনগাজী পুনরাধিকৃত হইল ২৭শে ডিসেম্বর। কিন্তু রোমেল বরাবর সুকৌশলে আপনার বল অটুট রাখেন। তাই এক মাস যাইতে না যাইতে বেনগাজী আবার তিনি পুনরাধিকার করেন (৩০শে জানুয়ারী ১৯৪২)। কয়েকমাস চুপ করিয়া থাকিয়া ১৯৪২-এর ২৬শে মে রোমেল তাহার চমকপ্রদ দ্বিতীয় অভিযান শুরু করেন—আবার ব্রিটেনের পরাজয় ঘটে, একেবারে এলেকজেন্দ্রিয়ার ও নীল-উপত্যকার দুয়ারে আসিয়া রোমেল দাঁড়াইয়াছেন। ভগ্ন ব্রিটিশ ৮ম আর্মি যে এখানেও তাঁহাকে তখন ঠেকাইতে পারিল ইহাই যথেষ্ট। রোমেলের পক্ষে এই বিজয়ে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, ব্রিটেনের সৈন্যবল ও অস্ত্রবল সম্ভবত বেশিই ছিল; রোমেলের কৌশলে তাহা বিনষ্ট হয়। ব্রিটিশ সেনাপতি রিচি রোমেলের ট্যাংকের

পিছনে ছুটিয়া রোমেলের ট্যাংক-মারা কামানের মুখে গিয়া পড়েন ;—১৩ই জুন একদিনে এইরূপে মোট ৩৭০ খানা ব্রিটিশ ট্যাংকের ৩০০ খানাই শেষ হয়। দ্বিতীয় শোচনীয় ঘটনা—মাত্র দুই দিনের অগ্নিবৃষ্টিতে ৩০ হাজার সৈন্য ও বহু রসদ লইয়া তব্রুক আত্মসমর্পণ করে—অবশ্য তব্রুকের আর ভূমধ্য নৌবলের সাহায্য মিলিতেছিল না। তথাপি ব্রিটিশ সামরিক শ্রেণীর অকর্মণ্যতার প্রমাণ হিসাবে সিংগাপুরের পরেই তব্রুক উল্লেখযোগ্য হইবে।

যুদ্ধ ইহার পূর্বেই পৃথিবীব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল, ইউরোপের চক্রশক্তি ককেশাসের পথে ইরানের দিকে, ও মিশর-সুয়েজের পথে 'নিকট-প্রাচ্যে' অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিতেছে, এই দুই সাঁড়াশীর চাপে ইরান, ইরাক, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়ার মিত্রশক্তিকে শেষ করিয়া তাহারা ভারত সমুদ্রের তীরে অথবা ভারতবর্ষের বুকে এশিয়ার চক্রশক্তি জাপানের সহিত হাত মিলাইবে—এই তাহাদের হইয়া উঠিয়াছে যুদ্ধজয়ের প্রধান ষ্ট্র্যাটেজি। এই জন্যই রোমেলকে বাধা দিবার জন্য অকিন্‌লেক ও রিচিকে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবল যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে, সিংগাপুর মালয় ব্রহ্মে ব্রিটেন তাহার ফলেই দুর্বল থাকে,—মিঃ চার্চিলের ইহাই ছিল ইতিপূর্বে বক্তব্য। সেই উত্তর আফ্রিকায়, বিশেষত তব্রুকে, এই পরাজয়ে কাজেই ব্রিটিশ সমর-নায়কদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আবার চারিদিকে সংশয় দেখা দিল। আবার এই পরাজয়েই ব্রিটেন ও আমেরিকা আর মলোটফকে প্রতিশ্রুতি দিলেও ১৯৪২-এ 'ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন' খুলিতে চাহিল না—রুশিয়ার ডোনেৎস্ অঞ্চল ও ককেশাস

চক্রশক্তির একমাত্র রণাঙ্গন হইয়া রহিল—তাহাদের বিজয়ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

আফ্রিকার যুদ্ধে কিন্তু পঞ্চম পর্বেরও ইতিমধ্যে সূচনা হইয়াছে—২৩শে অক্টোবর জেনারেল আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার সহকারী জেনারেল মণ্টোগোমারি আবার আক্রমণ আরম্ভ করেন। বারো দিনের দিনরাত্রি যুদ্ধে অবশেষে শত্রুর ব্যূহ-ভেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে, ৫ই নবেম্বর রোমেলের সৈন্যদল আবার পশ্চাৎপদ হইতেছে। এই পঞ্চম অঙ্কে ব্রিটিশ বাহিনীর কৃতিত্ব ও রোমেলের ভুল অবশ্যই সামরিক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আক্রমণ কখন হইবে রোমেল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, উত্তরে না হইয়া দক্ষিণেই মিত্রশক্তির প্রধান আক্রমণস্থল হইবে। আর তৃতীয়ত, উত্তরে ঘেরাও-করা সৈন্যদের ('পকেট') বাঁচাইতে গিয়া তিনি বহু বল হারান। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আক্রমণ-কৌশলের যে নূতন আভাস এই যুদ্ধে মিলে তাহা আরও উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন হইতেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্রিটেন ও আমেরিকা বিমানকেই প্রাধান্য দিতেছে,—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এইরূপ নূতন করিয়া বিমান-বলের পরীক্ষা যে একটি নূতন ষ্ট্র্যাটেজি ও কৌশলের ইঙ্গিত দেয়—তাহা এখন হইতে লক্ষণীয় হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই যুদ্ধে ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের মতই আক্রমণ আরম্ভ হয় কামানের গোলাজাল (artillery barrage) বুনিয়া, শত্রুর মাইন ও রক্ষা-ব্যবস্থা নষ্ট করে বিমান ও কামান; ট্যাংক অগ্রসর হয় পরে।

অর্থাৎ আর্টিলারিতে যেন আবার যোদ্ধাদের আস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার জন্য অবশ্য কৃতিত্ব প্রথম প্রাপ্য লাল-ফৌজের আর্টিলারির।

এবার আফ্রিকায় মিত্র-বাহিনীর লক্ষ্য রোমেলের বিনাশ। তাহা সার্থক হইলে আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হইবে, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌশক্তি অনেকটা আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে এবং হয়তো ইতালির অবস্থা এই সবের ফলে শোচনীয় হইয়া উঠিবে—মহাযুদ্ধের ভূমধ্য-জগতের অঙ্ক শেষ হইতে থাকিবে। কিন্তু তাহাতেও চক্রশক্তির মর্মস্থলে আঘাত পড়িবে না। সেইরূপ আঘাত সম্ভব ইউরোপেই—অন্যত্র নয়।

এই হিসাবে এ যুদ্ধের ভাগ্যক্ষেত্র এখনো সোভিয়েট-দেশ—আর সোভিয়েট প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র।[১]

---

১ মিশরে ব্রিটেনের নূতন অভিযানের সঙ্গে আতলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ ফরাসী উপনিবেশে ৭।৮ নবেম্বর দেড় লক্ষ আমেরিকান বাহিনীর অবতরণ সম্ভবত 'আফ্রিকার যুদ্ধের' সর্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা। ইহাতে এই অঞ্চলের যুদ্ধের একটা সুস্পষ্ট পরিণতি নিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে—অন্তত অনেকাংশে তাহাতে ভূমধ্য-জগতের যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করিতে বাধ্য। তাহা হইলে এই দক্ষিণ ইউরোপেই হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন পাওয়া যাইবে—ইতালিতে বা ফ্রান্সে। ইতি ১০।১১।৪২

দুই

সার্বজনীন যুদ্ধ

১৯৪০-এর ২২শে জুন রাত্রি ৪টায় হিটলারের আদেশে জার্মানরা সোভিয়েট-দেশ আক্রমণ করে—মরু সমুদ্র হইতে কৃষ্ণ সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় ১,৬০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে আকস্মিক অভিযান শুরু হইল। পূর্বেই ফিন্‌ল্যাণ্ড জার্মান বাহিনীর পথ করিয়া দেয়; আর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া প্রভৃতি ফ্যাশিস্ত 'নব-বিধানের' তাঁবেদার রাজ্যগুলিও সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; ইতালীয় বীরেরাও একমুহূর্ত দেরী করিল না; পরাজিত ফ্রান্‌স, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ হইতেও এই যুদ্ধে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফ্যাশিস্ত স্বেচ্ছা সৈনিকদল আসিতে লাগিল; স্পেনের কর্তা (Caudillo) ফ্যালাঙ্গিস্ত অনুচরদের পাঠাইতে লাগিলেন—ইউরোপের সমস্ত ফ্যাশিস্ত-মণ্ডলী যুদ্ধে অগ্রসর হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রথমাবধিই তাই স্পষ্ট বুঝা গেল—এই যুদ্ধ শুদ্ধ জার্মানি ও রুশিয়ার নয়, এই যুদ্ধ ফ্যাশিস্ত ইউরোপের সঙ্গে সোভিয়েট দেশের, ইউরোপীয় ফ্যাশিস্ত-তন্ত্রের সঙ্গে সোভিয়েট-তন্ত্রের।

যুদ্ধ রূপান্তরিত হইল;—কিন্তু সে রাষ্ট্রীয় হিসাবে। অবশ্য যুদ্ধের গোড়ার হিসাবও রাষ্ট্রীয়। তাই এই হিসাব গ্রহণ করিতেই

হইবে—প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকশক্তি এখন জনশক্তির প্রধান আশ্রয় নিঃশেষ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাই এখন হইল যুদ্ধের মূল রূপ। কিন্তু যুদ্ধ হিসাবেই যেখানে যুদ্ধ আলোচ্য সেখানে যুদ্ধের এই রূপান্তর বুঝিয়া লইয়া দেখিতে হয়—সেই রূপান্তরের সামরিক ফল কি, তাহাতে কোনও নূতন সামরিক নীতি বা লক্ষণ দেখা দিল কিনা, উভয় পক্ষের প্রকৃতিগত বিভেদের জন্য তাহাদের যুদ্ধপদ্ধতিতে কতটা ভেদাভেদ প্রকাশ পাইল। এই রাষ্ট্রীয় ও সামরিক হিসাব মিলাইয়াই এখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাকে আমরা বলিতেছি 'সার্বজনীন যুদ্ধ' বা 'জনযুদ্ধ'।

ফ্যাশিস্ত উদ্দেশ্য

হিসাব করিতে বসিয়া অতি সংক্ষেপে গোড়াতেই উভয় পক্ষের সামরিক সমস্যা, সামরিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি গণনা করিয়া রাখা দরকার। যুদ্ধের মূল কারণ অবশ্যই জানা কথা—বিপ্লবী গণশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকশক্তির অভিযান। সোভিয়েট রাষ্ট্রও জন্মাবধিই তাহা জানে, তাহার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছে; ফ্যাশিস্তরাও নিজেদের লক্ষ্য গোপন করে নাই। উপস্থিত কারণ এই যে, প্রথমত ইউরোপে এই সোভিয়েটতন্ত্র ও সোভিয়েটশক্তি প্রবল থাকিলে ফ্যাশিজ্‌ম ইউরোপেই নিষ্কণ্টক হইতে পারিবে না—ফ্যাশিজ্‌মের বিশ্বাধিপত্য তো দূরের কথা। অতএব, ইউরোপে যতই ফ্যাশিজ্‌ম জয়ী হইতেছিল ততই

সোভিয়েট আক্রমণের দিন নিকটতর হইতেছিল। আবার যতই যুদ্ধ চলিতেছিল ততই চক্রশক্তির বলক্ষয় হইতেছিল আর সোভিয়েট-শক্তি পূর্ণতেজে বাড়িতেছিল। দ্বিতীয়ত, ফ্যাশিস্তদের ক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে বল্কান-মণ্ডল জয়ের পর—সোভিয়েটকে আক্রমণ করিবার তখনি তাই হইল পরম সুযোগ। তৃতীয় উপস্থিত কারণ সামরিক: 'ব্রিটেনের যুদ্ধের' পর হইতে বুঝা গিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অনিবার্য। মলোটোফকেও বার্লিনে ডাকিয়া 'নব বিধানে' রাজী করানো গেল না। দীর্ঘযুদ্ধের জন্য হিটলারের প্রয়োজন—এক, উক্রেইনের শস্য ও শিল্প এবং ককেশিয়ার তেল; দুই, দক্ষিণ ইউরোপের পথে ইরাকে ইরানে ভারতবর্ষে অভিযান; তিন, সোভিয়েট-শক্তির বিনাশ—যেন দীর্ঘ যুদ্ধের সুযোগে পদানত ইউরোপের—বল্কান দেশের, স্কাণ্ডিনেভিয়ার, ফ্রান্সের, বেলজিয়ামের—জাতিরা বিদ্রোহ করিলে আর বাহিরের সাহায্য না পায়; বিশেষ করিয়া যেন জার্মানি-ইতালির ফ্যাশিস্ত-পীড়িত জনগণ সোভিয়েটের দিকে চাহিয়া আর বিদ্রোহের ভরসা না পায়; অন্য এক উদ্দেশ্য নাৎসি দলের অভ্যন্তরেও ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্রের সহিত যাহাদের আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব আছে (হেস প্রভৃতি?) তাহাদের পরিতুষ্ট করা, এবং এই সোভিয়েট-উচ্ছেদের যজ্ঞে পৃথিবীর ধনিক-তন্ত্রীদের পুরানো 'মিউনিকী একতা' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা (হেস-দৌত্যের ইহাই মর্ম কথা)। (দ্রষ্টব্য—'The Turning Point'—Hindusthan Standard, 23, June, '41)

জার্মানির কি সুযোগ ছিল? প্রথমত সমস্ত ইউরোপের ফ্যাশিস্ত-একতা,—ইউরোপের ধনবল ও জনবল, শিল্প ও শস্য, স্পেন ফ্রান্স সুইডেনের লোহা, রুমানিয়ার তেল, বল্কান ও নিদারল্যাণ্ড অঞ্চলের শস্য ও খাদ্য সম্ভার। তদুপরি এই দেড় বৎসরের যুদ্ধে তাহার সুসম্পূর্ণ সমর-সজ্জা, সৈন্যসজ্জা ও সামরিক শিল্প-সজ্জা; সামরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি অতুলনীয় সামরিক প্রতিষ্ঠা। চতুর্থ কথা, ইহার উপর যুদ্ধোদ্যোগ (initiative) সেই গ্রহণ করিবে, অতএব তাহার সুযোগ বেশি। পঞ্চম, অতর্কিত আক্রমণে সে সোভিয়েট-শক্তিকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে; ষষ্ঠ, তাহার পরে 'বিদ্যুদাক্রমণে' তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে। শেষ কথা—একবার ফ্যাশিস্তরা অভ্যন্তরে অগ্রসর হইলেই সোভিয়েটের ঐক্য ভাঙিয়া পড়িবে,—একে তো ইউক্রেনী, কাজাক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি স্বতন্ত্র হইতে চাহিবে, তারপর পুরাতন আভিজাত-শ্রেণী হিটলারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, আর তাহা ছাড়া ট্রটস্কি, টখাচেভস্কি প্রভৃতি পূর্বতন নেতাদের অনুচরেরা ষ্টালিন-রাষ্ট্র নাশে হিটলারের সহায় হইবে।

তাই হিটলারের সামরিক লক্ষ্য হয়—(১) সোভিয়েট রাষ্ট্র ধ্বংস, (২) সোভিয়েটের লালফৌজ ধ্বংস, (৩) সোভিয়েটের শিল্প, শস্য ও খনি-অঞ্চল অধিকার; (৪) ইরানে-ইরাকে ও ভারতের দিকে যাত্রা। এইজন্য সময় স্থির হয় ৬ হইতে ১০ সপ্তাহ;—আর পদ্ধতি—সেই টোটেল যুদ্ধ, অতর্কিত আক্রমণ ও ব্লিৎস্‌ক্রীগ।

সোভিয়েটের অবলম্বন

সোভিয়েটের আয়োজন-অবলম্বনও স্মরণে রাখা দরকার। প্রথমত সোভিয়েট বরাবর জানে শুধু ফ্যাশিস্ততন্ত্র কেন, সমগ্র ধনিকতন্ত্রই হয়তো তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে পারে। যুদ্ধের মধ্যেই সোভিয়েটের জন্ম; যুদ্ধেই তাহার পরীক্ষা হইবে। অতএব যুদ্ধের জন্য সোভিয়েট মোটামুটি প্রস্তুত। এই প্রস্তুতির হিসাব এখন উল্লেখ করিয়া লাভ নাই (দ্রষ্টব্য *Military Strength of the Powers*, Max Werner); তবে মনে রাখিবার মত কথা এই যে, পারাশুট, বিমানবাহী ট্যাংক, জলচর ট্যাংক প্রভৃতি ট্যাংক ও বিমানের নানা প্রয়োগে সে পথ-প্রদর্শক; সংখ্যায়, শিক্ষায়, প্রেরণায় লালফৌজ দল অগ্রগণ্য (দ্রষ্টব্য *Red Army*, Fifty Questions, Ivor Montague); (দ্রষ্টব্য ২৯শে জুনের রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখকের 'সোভিয়েট সমর')। এবং শিক্ষা প্রসারের ফলে তাহার সামরিক বনিয়াদ দৃঢ় হইতেছিল। দ্বিতীয়ত, যেমন ইউরোপে ফ্যাশিস্ত ঐক্য এক দিকে সংঘটিত হইতেছে তেমনি, সোভিয়েট জানে, এই সব ফ্যাশিস্ত দেশে এবং পৃথিবীর সর্বত্র উৎপীড়িত জনশক্তিও সোভিয়েটের নেতৃত্বে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে ক্রমশই এই সর্বরাষ্ট্রীয় গণশক্তি ও মুক্তিকামী জাতীয় শক্তি সোভিয়েটের পক্ষে সহায়ক হইবে। তৃতীয়ত, সোভিয়েট কূটনীতি (আগষ্ট, ১৯৩৯-এ) ধনিকতন্ত্রের 'মিউনিকী

মিতালি' বেচাল করিয়া ধনিকতন্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যেই এমনি বিরোধ বাধাইয়া দিয়াছে যে, ব্রিটেন ও আমেরিকা অন্তত সহজে হিটলারের সঙ্গে জুটিয়া সোভিয়েটতন্ত্রকে এই সময়ে আক্রমণ করিতে আসিতে পারিবে না। চতুর্থত, সোভিয়েটের নিজ সমর-শক্তি ও সামরিক সংগঠন যুদ্ধকালেও দিনে দিনে দৃঢ়তর ও বৃহত্তর হইতেছিল। পঞ্চমত, বল্কান-মণ্ডলে জার্মানি অগ্রসর হইয়াছে বটে কিন্তু সোভিয়েটও পূর্বাহ্নেই সোভিয়েট-ভূমির পশ্চিম সীমা অতিক্রম করিয়া বেসারেবিয়া দখল করিয়াছে, বাল্টিক দেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ করায়ত্ত করিয়াছে, নাৎসি আক্রমণের প্রথম ঝাপ্টা সামলাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ষষ্ঠত, সোভিয়েটেরও প্রকৃতিগত সামরিক সুবিধা আছে—ইহার আয়তন বিপুল—বিজয়ী যেন উহার শেষই দেখিতে পাইবে না; আর উহার জন-সংখ্যাও ১৭ কোটি—ফ্রান্স বা বেলজিয়ামের মত অল্প নয়। অতএব, সোভিয়েটের আয়তন ও জনসংখ্যা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধেরও উপযোগী। সর্বাপেক্ষা বড় কথা—সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বরূপ। এ রাষ্ট্রে শাসক আর শাসিত বলিয়া দুই শ্রেণী নাই—রাষ্ট্রও সার্বজনীন, দেশও সার্বজনীন, তাই তাহার রক্ষাও সার্বজনীন দায়িত্ব হইবে—শুধু সামরিক শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীর দায়িত্ব ও নেতৃত্বের উপর দেশরক্ষা নির্ভর করিবে না। এখানে পঞ্চম বাহিনীর চোরা আক্রমণ চলিবে না, জাতিগত বা দলগত বিভেদ-সৃষ্টি খাটিবে না; 'আভ্যন্তরীণ আক্রমণে'র ('Attack in Depth') দ্বারা বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টি সম্ভব নয়; বরং দেশ বিজিত

হইলেও মানুষ রহিবে অবিজিত,—তাই সোভিয়েট সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জনগণের যুদ্ধ-সংকল্প বিনষ্ট হইবে না।

সোভিয়েটের সামরিক কৌশল

সোভিয়েটের সামরিক লক্ষ্য ও পদ্ধতি এই সব অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিল। তাহাদের সামরিক মতবাদ পূর্বে অবশ্য ছিল আক্রমণ-মূলক সচল যুদ্ধ (দ্রষ্টব্য পৃঃ ১২৪)। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা প্রধানত স্থির হইল এই গণনা দ্বারা,—ফ্যাশিস্তরা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের সমরসজ্জা সম্পূর্ণ; সেই তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রস্তুত নয়—বড় দেশ, যান-বাহনের (transport) অপ্রাচুর্যে সমরসজ্জা ও একত্রীকরণ সময়-সাপেক্ষ। আবার, দেশের আয়তনের জন্য, নিজ লোকবলের জন্য এবং পৃথিবীর জনশক্তির বৈপ্লবিক জাগরণের জন্য যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলেই সোভিয়েটের সুবিধা, নাৎসিদের অসুবিধা। নেপো-লিয়নের আমল হইতে রুশিয়া এই যুদ্ধ-কৌশলের সুযোগ মনে করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, সোভিয়েটেরও গণনায় 'কালক্ষয়' (delaying action) একটা বড় কৌশল হইল। তাই তাহার সামরিক মতবাদ বর্তমান ক্ষেত্রে হইল এইরূপ :—প্রথম পর্বে পদে পদে প্রতিরোধ, এবং প্রতিরোধ-মূলক আক্রমণের দ্বারা শত্রুর বলক্ষয়। সে প্রতিরোধ হইবে সার্বজনীন, সর্বাঙ্গীণ, সর্বত্র—শত্রুর সম্মুখে, পার্শ্বে, পিছনে; লালফৌজের প্রতিরোধ ও জনসৈন্যের

প্রতিরোধ, এবং গেরিলাদের গুপ্ত আঘাত। আর [illegible] পর্বে আসিবে শত্রুকে আক্রমণ-মূলক আঘাতের দ্বারা [illegible] করা, তাহার গণশক্তিকে বন্ধনমুক্ত করা, বৈপ্লবিক শক্তির দ্বার খুলিয়া দেওয়া।

কার্যত তাই সোভিয়েটের যুদ্ধপ্রয়াস যে রূপ লইল তাহা সহজেই বুঝা যায়:—তাহার যুদ্ধনীতি বা War Policy বাস্তব ও বিপ্লবী হইল—এ যুদ্ধ পৃথিবীতে সাম্যবাদ চাপাইবার পথ মাত্র নয়; ফ্যাশিস্ত অত্যাচার হইতে জনগণের মুক্তির যুদ্ধ ('War of Liberation'; দ্রষ্টব্য ষ্টালিনের বক্তৃতা, ৩রা জুলাই, ১৯৪১)। তাই সোভিয়েটও ফ্যাশিস্ত-বিরোধী (Anti fascist United Front of Peoples) জাতিদের ঐক্য ও জনগণের মুক্তিকে (War of Liberation) তাহার যুদ্ধনীতির বাস্তব ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিল। ষ্ট্র্যাটেজি হইল 'সার্বজনীন যুদ্ধের' এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের উপযোগী—শত্রুক্ষয়ের যুদ্ধ (War of Attrition)। তাহার একদিক লাল ফৌজ ও সোভিয়েট জনগণের একাত্ম সংযোজনা এবং অন্যান্য গণতন্ত্রের ও গণশক্তির সহযোগিতা (দ্রষ্টব্য কালিনিনের লেখা, ডিসেম্বর, ১৯৪১); আর নিজের যুদ্ধশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা ও শত্রুর যুদ্ধশক্তি ক্ষয় করা—পদে পদে তাহাকে আক্রমণ করা—ইহার অন্য দিক। কার্যত সোভিয়েটের যুদ্ধের লক্ষ্য দাঁড়াইল শত্রুদের ধ্বংস ও সোভিয়েট সৈন্যদের অক্ষুণ্ণ রাখা। উহার পদ্ধতি এই যে, (১) ব্লিৎসক্রীগ ব্যর্থ করা; (২) সর্বত্র প্রচণ্ড প্রতিরোধ দ্বারা শত্রুর বলক্ষয় ও কালক্ষয় করা;—অসম্ভব হইলে জায়গা ছাড়িয়া দিয়া

সময় লাভ করা ('sell space for time'); (৩) শিল্প ও যুদ্ধোপকরণ শত্রুর হস্ত হইতে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা—প্রথমত শিল্পকেন্দ্রে প্রতিরোধ করিয়া; না পারিলে, কুশলী শ্রমিক, শিল্পযন্ত্র ও উপকরণ যুদ্ধাঞ্চল হইতে দূর অভ্যন্তরে সরাইয়া লইয়া পুনঃস্থাপিত করিয়া; এবং সমস্ত স্থাবর সম্পদ শত্রুর হাতে পড়িবার পূর্বে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া ('scorched earth' policy); (৪) শত্রুর পিছনে সুচতুর গেরিলা ও জন-সৈনিকের প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া ও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—যাহাতে দেশ বিজিত হইলেও শত্রু তাহা কাজ লাগাইতে না পারে (দ্রষ্টব্য *With A Soviet Unit through The Nazi Lines*—A. Palyakov.)

এই সব স্মরণে রাখিলে ফ্যাশিস্ত ও সোভিয়েটশক্তির যুদ্ধের মোটামুটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা চলে। আজ ষোল মাস এই যুদ্ধে অজস্র ঘটনা ঘটিয়াছে। কোনো ঘটনারই স্বরূপ জানিবার উপায় নাই, জানা যায় কেবল 'রটনা'। তথাপি যুদ্ধের গতিধারা মোটের উপর বরাবরই লক্ষ্য করা সম্ভব (দ্রষ্টব্য লেখকের 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন সপ্তাহ', আঃ বাঃ পঃ, রবিবাসর, ৮ঠা শ্রা, ৪৮; 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস', সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি প্রকাশিত; 'সোভিয়েট যুদ্ধের প্রথম পর্ব', ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১, আঃ বাঃ পঃ, 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' এই সম্পর্কীয় সাম্পাদিক প্রবন্ধ)।

প্রথম পর্ব—ফ্যাশিস্ত অভিযান

যুদ্ধের প্রথম পর্ব জার্মান অভিযানের পর্ব। এই অভিযান অতর্কিত। জার্মানি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অতর্কিতে আক্রমণ করিল ২২শে জুন—ব্লিৎস্ক্রীগ শুরু হইল। লালফৌজ প্রস্তুত ছিল না, নবাগত দেশগুলিতে যে-সব রক্ষী-সেনাদল ও বিমান-সৈন্য ছিল তাঁহারা হয় বন্দী, না হয় বহু পরিমাণে নষ্ট হইল। বিয়ালাইষ্টকের (Bialystok) যুদ্ধ এই কয়দিনের একটি এক বড় ঘটনা। সম্ভবত নাৎসিদের একটা বড় রকমের ক্ষতি হয়। তাহাতেই ১লা জুলাই মিন্স্ক জার্মানদের হস্তগত হইল। ২রা জুলাই জার্মান ঘোষণায় বলা হইল—সে জয় চরম। ৩রা জুলাই ষ্টালিনের প্রথম বক্তৃতায় সহজ ভাষাতেই সোভিয়েটের ক্ষতি স্বীকৃত হয়। বুঝা গেল, রুশিয়া সমর-সজ্জা করিতেছে; অতর্কিত আক্রমণের ফলে উদ্যোগ সে নিজে করিতে পারে নাই, তাই সে প্রস্তুত হইতেছে শত্রুর বলক্ষয়কর যুদ্ধের জন্য। সোভিয়েটের যুদ্ধরীতি ও পদ্ধতিও ষ্টালিনের কথায় পরিষ্কার বুঝা গেল—প্রথমত সর্বাঙ্গীণ সমর-সজ্জা ও সর্ববলের প্রতিরোধ; পরিত্যক্ত অঞ্চলের সর্বসম্পদ ধ্বংস সাধন (scorched earth policy); অধিকৃত অঞ্চলে গেরিলা প্রতিরোধ; এবং সোভিয়েটের সার্বজনীন সংগ্রাম ('war of the entire Soviet People')। ব্লিৎস্ক্রীগের এই প্রথম তরঙ্গ,—মনে হয় সব যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু সব ভাসিয়া গেল না। ঠেকিল প্রথম ১০ জুলাই, দ্বিতীয় সপ্তাহে—উত্তরে

এষ্টোনিয়ার তালিন (Talinn) বন্দর হইতে পেইপুস (Peipus) হ্রদের কাছে, সেখান হইতে বেরিসিনা ও নীপার নদী ধরিয়া মধ্যস্থলের প্রিপেট জলাভূমি (Pripet Marshes) পর্যন্ত তখন রণক্ষেত্র; প্রিপেটের দক্ষিণে নিষ্টার ও বুগ নদী ধরিয়া কৃষ্ণ সমুদ্র পর্যন্ত ক্ষেত্রে তখনো রুমানিয়ার সেনা কিন্তু পৌঁছে নাই।

সোভিয়েট-দেশের সুরক্ষিত অঞ্চল এই রেখায়—ইহাই তথা-কথিত 'ষ্টালিন লাইন'। আসলে কোনো অনড় লাইনে প্রতিরোধ সোভিয়েটের যুদ্ধরীতি নয়। তবে এখানে শত্রুকে ঠেকানো সহজ—কারণ শত্রুর দেশ হইতে এই রণক্ষেত্র দূর, অথচ সোভিয়েটের সমস্ত প্রাণকেন্দ্রও এই রেখার অন্তর্বর্তী, যেমন লেলিনগ্রাদ, মস্কো ও কিয়েব-খারকব। প্রাকৃতিক সুবিধাও ছিল এখানে যথেষ্ট,—নদী, জলাভূমি ও বিপুল বন। তাই এই সুরক্ষিত অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব তাহারা মানিত। (দ্রষ্টব্য 'The War in Russia,' *Foreign Affairs*, July, 1942)

১২ই জুলাই আন্দাজ এখানে অভিযানে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইল—শুরু হইল নূতন ব্লিৎস্ক্রীগ। (দ্রষ্টব্য *Strategy and Tactics of the Soviet-German War*, pp. 71) নীপার নদীর তীরে এবং স্মোলেনস্কের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কয়েকদিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। লালফৌজও পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে জার্মানদের অগ্রগতি পূর্বাপেক্ষা মন্থর হইয়া পড়ে। জার্মানির চেষ্টা ছিল রুশ রণক্ষেত্র দ্বিখণ্ডিত করা। মোটামুটিভাবে রুশ সৈন্যদল সেই জার্মান প্রয়াস প্রতিহত করে।

কিন্তু মধ্যখানে স্মোলেনস্কের ঠিক সম্মুখভাগে জার্মান ট্যাংক-বাহিনী সোভিয়েট-ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়। দক্ষিণে ইউক্রেনেও জার্মানরা কিছুদূর অগ্রসর হয়। উত্তরদিকে তাহারা এস্টোনিয়ার ভিতরে প্রবেশ করে, আর দক্ষিণদিকে সম্মিলিত জার্মান ও রুমানিয়ান বাহিনী সীমান্তের প্রুথ নদী এবার অতিক্রম করে। রণক্ষেত্রের তিন প্রধান অঞ্চল প্রকটিত হয়।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জার্মানরা দাবী করে—উত্তর রণাঙ্গনে অষ্ট্রভ পরকভ ও পসকভ অধিকৃত হইয়াছে, লেনিন-গ্রাদের দিকে আক্রমণ চালাইবার সম্ভবনা দেখা দিয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে বেসারাবিয়া অধিকৃত হইয়াছে, কিয়েভের দিকেও জার্মান-বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। মধ্য রণাঙ্গনে স্মোলেনস্কের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। দেখা গেল, আক্রমণের প্রথম অধ্যায়ে জার্মানি যে পরিমাণে সোভিয়েট ভূভাগ অধিকার করিতে পারিয়াছিল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে সেই পরিমাণে সোভিয়েট এলাকা দখল করিতে পারে নাই। অথচ দ্বিতীয় বিদ্যুদাক্রমণের বিদ্যুৎ নিঃশেষ হইয়াছে—'ষ্টালিন লাইনের' মধ্যে জার্মানরা ঢুকিয়াছে বটে কিন্তু সোভিয়েট ফৌজ পরাহত হয় নাই। এ যুদ্ধ ফ্রান্সের যুদ্ধের অনুরূপ বা বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র নয়। ইহার স্বরূপ বুঝাইতে তখন যাহা লেখা হয় তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

নূতন যুদ্ধের রূপ

"কেন হিটলার এই প্রথম ব্যাহত হইতেছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরেই যুদ্ধের রূপ আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। ইহা ফ্রান্সের যুদ্ধ নয় ;—সোভিয়েট রণনীতি ও রণকৌশল এই নূতন রূপ দান করিয়াছে। সেই রণনীতি সচল (mobile) যুদ্ধের নীতি; উহার হিসাবে কোনো ভূমিখণ্ড হস্তচ্যুত হওয়া বড় কথা নয়—সৈন্যবাহিনী ও জনবাহিনীর সচলতানাশই বড় ক্ষতি। ফলে এই যুদ্ধের মোটামোটা রেখাগুলি আমরা চক্ষে এখন এইরূপ দেখিতেছি :—যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দেখি—এক, লাইন "ভেদ" করিলেও সচল (mobile) সোভিয়েট বাহিনী বিভক্ত হয় না—বরং শত্রুর ট্যাংক-বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। দুই, আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট বাহিনী চালায় প্রত্যাক্রমণ (counter-attack),—ফরাসী বাহিনী একবারও তাহা চালাইতে পারে নাই। তাই এই যুদ্ধে জার্মান আক্রমণ-"ফলা" ('wedge') যেমন পূর্বে অগ্রসর হয়, সোভিয়েট আক্রমণ "ফলা"ও তেমনি অগ্রসর হয় পশ্চিমে। ফলে—উহাই চতুর্থ কথা,—উভয় বাহিনীই পার্শ্বে আক্রান্ত হয়, পরিবেষ্টনের চেষ্টা করে, দুই এক ক্ষেত্রে উল্টা পরিবেষ্টিতও হয়। পাঁচ, খণ্ডে খণ্ডে জার্মান ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ীর বাহিনী তাই ধ্বংস হয়। (ইহার বিবরণ পরে প্রকাশিত হয়—*Strategy and Tactics of the Soviet German War*-এ Hutchinson); যুদ্ধক্ষেত্রের

বাহিরে দেখি, এক নূতন অভিজ্ঞতা—দেশ অধিকার করিয়াও জার্মান-বাহিনী দেখে দেশ নাই, আছে "পোড়া মাটি" আর গুপ্ত "গেরিলা বাহিনী"।—অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেছে শুধু লাল পল্টন নয়—সোভিয়েটের "জনবাহিনী", তাহার কৃষক ও শ্রমিক। (দ্রষ্টব্য *How the Soviet Poeple Fight*—by Soviet Writers People's Publishing House, Bombay.)

তিন সপ্তাহে যুদ্ধের এই নূতন রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—সোভিয়েটের যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ; আর সোভিয়েটের রণনীতি তাই রণক্ষেত্রে ও উহার বাহিরে বিস্তৃত; তাহা এক বৈপ্লবিক সমন্বয় নীতি, প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের সমন্বয়; জনবাহিনী ও লাল পল্টনের সমন্বয়; এবং সর্বোপরি সমন্বয় সোশ্যালিষ্ট মাতৃভূমি-রক্ষার ও সর্বমানবের মুক্তি-সংগ্রামের।" ('সোভিয়েট যুদ্ধের তিন সপ্তাহ', লেখক, আঃ বাঃ পঃ, ৪ শ্রা, ৪৮)

ফ্যাশিস্ত আক্রমণের গতি

"আগষ্ট মাসের প্রথমভাগেই আরম্ভ হইল জার্মান অভিযানের তৃতীয় অধ্যায়—এবার 'বিদ্যুদাক্রমণ' নয়, শুধু আক্রমণ। তখন উত্তরে উহার লক্ষ্য লেনিনগ্রাদ, দক্ষিণে উক্রেইনের নীষ্টার ও বুগ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত জার্মানদের এই তৃতীয় অধ্যায়ের আক্রমণ চলে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্মান-বাহিনী আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ওডেসার পাশ কাটাইয়া অগ্রসর

হয় এবং নিকোলায়েভ, খেরসন অধিকার করে। আগষ্ট মাসের শেষভাগে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নীপার নদীর বিখ্যাত বাঁধ উড়াইয়া দিল, জনসাধারণ শিল্প-প্রধান নিপ্রোপেট্রোভ্স্ক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সোভিয়েট ধ্বংসলীলার এই পরিচয়ে সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়। উত্তর দিকে জার্মান সৈন্যদল নভোগোরোড এবং টালিন অধিকার করিয়া লেনিনগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হয়। সমস্ত সেপ্টেম্বর মাস ধরিয়া কিয়েভ, লেনিনগ্রাদ এবং ওডেসের সম্মুখে চলিল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। লাল ফৌজের প্রচণ্ড বিক্রমে লেনিনগ্রাদ ও ওডেসা রক্ষা পায়। ২০শে সেপ্টেম্বর বা ঐ সময়ের কাছাকাছি জার্মান বাহিনী কিয়েভ দখল করে। এই কিয়েভের পতন প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েটের প্রথম দুর্ভাগ্য। মার্শাল বুদেনির সাহস তাঁহার সমাবেশের ক্রটী ও রণকৌশলের ক্রটী দূর করিতে পারিল না—উক্রেইনের এই দুয়ার ভাঙিয়া পড়িল, সোভিয়েটের সমস্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই তাহাতে কালক্রমে দুর্বল হইতে বাধ্য।

চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল অক্টোবরের ১লা আন্দাজ। ৩রা অক্টোবরের হিটলারের বক্তৃতায় তাহার গুরুত্ব ঘোষিত হয়—যুদ্ধের অবসান আসন্ন। উহার লক্ষ্য দেখা গেল মধ্যস্থলে মস্কো, দক্ষিণে নীষ্টারের পরপারে ডোনেৎস অঞ্চল ও খারকভ, আর কৃষ্ণসমুদ্রের তীরে ক্রাইমিয়া। মধ্যক্ষেত্রের প্রচণ্ড প্রয়াসের তুলনা নাই—মস্কো ছিল ১৫০ মাইল দূরে, দিন পনের মধ্যে জার্মানরা ৭৫ মাইল অতিক্রম করিল; ব্রিয়ানস্ক, ওরেল দখল করিল, তারপর মোজেইস্ক; উত্তরে কালিনিন গেল, দক্ষিণে টুলা যায়-যায়,

অর্ধচন্দ্রাকারে মস্কো ঘিরিয়া আসিতেছে ফ্যাশিস্তবাহিনী তরঙ্গের পর তরঙ্গে। অক্টোবর গেল, নবেম্বরও গেল,—তারপর আর সন্দেহ রহিল না লেনিনগ্রাদের মতই মস্কো অবি[illegible] রহিল।

কিন্তু দক্ষিণে ততক্ষণে জার্মানরা আ[illegible] অগ্রসর হইয়াছে। খারকভ গেল, অক্টোবরের শেষে জার্মানরা ডোনের তীরবর্তী রোষ্টবে পৌছিল। এদিকে ক্রাইমিয়ার দ্বারপথ পেরকোপ যোজক অনেক আঘাতে তাহারা ভেদ করিল, সেবাস্তোপোলের নৌঘাটি গিয়া অবরোধ করিল—তাহার পূর্বেই ওডেসার প্রতিরোধ নিঃশেষ হইয়াছে—সেখানকার সোভিয়েট নৌবহর আশ্রয় লইয়াছে সেবাস্তোপোলে।

দ্বিতীয় পর্ব—সোভিয়েট আক্রমণ

কিন্তু এইবার জার্মান অভিযান শেষ হইল। ২৯শে নবেম্বর রোষ্টব পুনরাধিকৃত হয়—এ যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। রুশ রণাঙ্গনের চিরবিজয়ী সেনাপতি 'শীত ও কাদা' রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সোভিয়েটের প্রত্যাক্রমণ শুরু হইল। ৮ই নবেম্বর হিটলার ঘোষণা করিয়াছিল,—'১ কোটি সোভিয়েট সৈন্য হতাহত হইয়াছে, ইহার পরে আর কোনো বাহিনীই টিকিতে পারে না'। ৯ই ডিসেম্বরের পূর্বেই তাহার পশ্চাদপসরণ শুরু হয়। অবশ্য ততক্ষণে তাহার এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল—জাপান ৭ই ডিসিম্বর যুদ্ধে নামিয়া তাহার অন্যান্য

রুদের এশিয়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু উত্তর রণাঙ্গনে টিকভিন তাহার হস্তচ্যুত হয়। হিটলার পশ্চাতে সরিয়া শীতের জন্য নূতন করিয়া রক্ষাবাস স্থির করিল, প্রধান সেনাপতি ব্রাউশিচকে বিদায় দিয়া নিজে প্রধান সেনাপতি হইল। ক্রমে মোজেইস্ক, কালুগা, মালো-ইয়ারোস্লোভেৎস্ সোভিয়েট পুনরুদ্ধার করিল। হিটলার বক্তৃতায় জানাইল, তাহার প্রতিরোধ পন্থাই আপাতত গ্রহণ করিতে হইতেছে। কালিনিনের পতন হইল—মস্কো-লেলিনগ্রাদের পথ মুক্ত হইল।

মনে রাখা দরকার, এই দ্বিতীয় পর্বে বারেবারে চেষ্টায় ও সোভিয়েট বাহিনী উক্রেইন বা ক্রাইমিয়ার শিল্প-সমৃদ্ধ কোনো অঞ্চলের উদ্ধার সাধন করিতে পারিল না, ফ্যাশিস্ত বাহিনীর শীত-ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না; সেবাস্তাপোল খারকভ টাগানরোগ কিংবা স্মলেনস্ক, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানও উদ্ধার করিতে পারিল না। শীতান্তে জার্মানির বসন্তাভিযানে এই পর্বান্ত সূচিত হইতেছিল—ক্রাইমিয়ার কের্চ প্রণালী হইতে নীপারপেট্রোভস্ক পর্যন্ত ২৫০ মাইল জুড়িয়া জার্মানি আক্রমণ শুরু করিয়াছিল; তাহারও পিছনে খারকভে গ্রীষ্মাভিযানের জন্য তখনি বিপুলতর আয়োজন চলিতেছে। মে মাসে এই খারকব দখলের জন্য সেনাপতি টিমেশেঙ্কো বিপুল প্রয়াস করিলেন—জার্মান ব্যূহ ভগ্ন হইল না, তবে তাহাদের ভাবী আক্রমণোদ্যোগ ব্যাহত হইল। কিন্তু ততক্ষণ কের্চ জার্মানদের হাতে পড়িয়াছে, মে'র তৃতীয় সপ্তাহে সেবাস্তোপোলের

অবরোধ দৃঢ়তর হইতেছে—জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেখানে প্রচণ্ড সংঘাত বাধিল। সোভিয়েটের হাত হইতে যুদ্ধোদ্যোগ (initiative) অপসৃত হইতে লাগিল—যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব শেষ হইল। তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হইল ফন বকের নূতন উদ্যোগে উত্তরে কুর্স্ক হইতে দক্ষিণে রোষ্টবের দিকে।

দুই পর্বের সাক্ষ্য

এই দ্বিতীয় পর্বে দুই যুদ্ধরত শক্তির শক্তি ও দুর্বলতার, তাহাদের রণনীতি, সমাবেশ ও কৌশলের কি পরিচয় পাওয়া যায়? দেখা গেল—সোভিয়েট সত্যই আক্রমণ-শক্তি রাখে, নূতন বল গঠন করিতে পারে, তাহার নৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ণ। অন্য দিকে দেখা গেল—বিদ্যুদাক্রমণে ব্যর্থ হইলেও জার্মানি প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধেও তেমনি দৃঢ়চিত্ত—রুশিয়ার এই শীতেও তাহাদের নৈতিক শক্তি ও সামরিক শক্তি ভগ্ন হয় নাই। মস্কো, লেনিনগ্রাদের রক্ষাপদ্ধতি হইতে বুঝা গেল—সোভিয়েট প্রতিরোধ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া দুর্জেয় হয়। ইহার কারণ হয়তো এই যে, অন্যত্র সোভিয়েট সৈন্যদের নির্ভর করিতে হয় দুষ্প্রাপ্য রসদ ও যানবাহনের উপর। এখানে কাগানোভিচের সোভিয়েট রেল-ব্যবস্থা অপেক্ষা হের টড্‌টের জার্মান সংগঠন বেশি কার্য-কুশলতার প্রমাণ দিয়াছে। জার্মান যানাবাস (logistics) সত্যই পৃথিবীর বিস্ময়। তেমনি বিস্ময়কর যোদ্ধাদের সহকর্মী

এঞ্জিনিয়াররা যাহারা এমন তাড়াতাড়ি এমন দুর্ভেদ্য রক্ষাব্যূহ গঠন করে—যে ব্যূহ সোভিয়েট বাহিনী ভেদ করিতে পারে নাই। অবশ্য অনেকটা কৃতিত্ব জার্মান সৈনিকেরও—যাহারা প্রতিরোধের জন্য সজারু পদ্ধতি ('hedgehog system') গ্রহণ করে। এ পদ্ধতি গত যুদ্ধেই ফলকেনহাইন-লুডেনডর্ফ উদ্ভাবন করেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সঙ্কট সময়ে বাছাই-করা সৈনিকদের বাছাই-করা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইত—তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত সেই ঘাটি রক্ষার জন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের। এই সৈন্যদলের প্রতিরোধ কিছুতেই ভাঙিত না। সোভিয়েট আক্রমণ-পদ্ধতিরও নূতন রীতি প্রকাশ পাইল। আক্রমণে বিমান ও ট্যাংকের প্রারম্ভিক প্রয়োগ জার্মানদের ব্লিৎস্‌ক্রীগ হইতে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; কামানের উপর কেহ আর জোর দিত না। সোভিয়েট দেখাইল আর্টিলারির নূতন শক্তি—বিমানে ও কামানে প্রধানত আক্রমণ-ক্ষেত্র পরিষ্কার করিত, পরে অগ্রসর হইত স্যাপার্স ও পদাতিক, এবং ইহাদের আগলাইয়া লইয়া চলিত সোভিয়েট ট্যাংক। হয়তো সোভিয়েট ট্যাংক ও বিমান সংখ্যা অনধিক বলিয়াই এই পদ্ধতি তাহারা গ্রহণ করে। কিন্তু মোটের উপর আর্টিলারির প্রতিষ্ঠা আবার ফিরিয়া আসে। এই-রূপই দেখা গেল বরফ-ঢাকা শীতের ক্ষেত্রে সোভিয়েট সওয়ারদের কার্যক্ষমতা—ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী তখন বরফে অচল। বুঝা গেল অশ্বারোহীর দিনও একেবারে ফুরায় নাই। আর যাহা

দেখা গেল তাহা সোভিয়েটের গেরিলা ও জনসেনার যুদ্ধ—বুঝা গেল দেশ হস্তগত করিলেও ফ্যাশিস্তরা সে দেশের শত্রুপুরীতেই বাস করিতেছে।

তৃতীয় পর্ব—ফ্যাশিস্ত পুনরভিযান

তৃতীয় পর্বের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে জার্মানির নূতন অভিযানে—আজ তাহা সমস্ত উক্রেইন, সমস্ত ক্রাইমিয়া, সমস্ত ডোনেৎস অববাহিকা, সমস্ত ডোন অঞ্চল গ্রাস করিয়াছে; শস্যবহুল কুবান উপত্যকা কুক্ষিগত করিয়াছে, ককেশিয়ার ক্রাস্নাডোর-মাইকোপের তেলের খনি হস্তগত করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্বে তাহারা চলিয়াছে গ্রোজনির তেলের খনির জন্য, চলিয়াছে বাকুর উদ্দেশ্যে; দক্ষিণ-পশ্চিমে নবোরসিস্ক হস্তগত করিয়া তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে তুয়াপ্‌সের নিকটে; আর পূর্বে তাহার রণক্ষেত্র ডোনের শিয়রে ভরোনেজ, ভল্গার বুকে ষ্টালিনগ্রাদ। একদিকে মধ্য রুশিয়ার প্রাণকেন্দ্র ভল্গার মুখ, অন্যদিকে দক্ষিণ রুশিয়ার ককেশাসের তৈলাঞ্চল—এই তৃতীয় পর্বের লক্ষ্য। ইহা আয়ত্ত হইলে যে সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা স্পষ্ট—মস্কো দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে ঘিরিয়া ধরা যায়, সোভিয়েট দশ আনা তেল হারায়, কাশপিয়ান সমুদ্রে পথ বন্ধ হয় ও ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়; রুশিয়ার প্রাণস্রোত মন্থর হয়। অন্যদিকে জার্মানির নিকট ইরানের পথ উন্মুক্ত

হয়, ভারতের পথ নিকটস্থ হয়; ভারত সমুদ্রের তীরে জাপানের সঙ্গে জার্মানির হাত মিলাইবার সুযোগ হয়। তাহা হইলে জাপানী-অধিকৃত মালয় ব্রহ্ম যবদ্বীপ প্রভৃতির কাঁচামালে ও ফ্যাশিস্ত ইউরোপের কারখানার সম্পদে চক্রশক্তির মহাসমাবেশ সম্পূর্ণ হয়—দীর্ঘতর যুদ্ধের পক্ষেও চক্রশক্তির বনিয়াদ দৃঢ়তর হইয়া উঠে।

পর্বের প্রমাণ

এই পর্বের এই বিপুল যুদ্ধে আবার দেখা গেল, (১) জার্মানির নূতন আক্রমণের আয়োজন ও পরিচালনা করিবার মত বিস্ময়কর শক্তি এখনো আছে; (২) ফন বক বিদ্যুদাক্রমণও পুনরারম্ভ করিয়াছিলেন, (৩) ডোনের বাঁকে তাহা শেষ হয়। আর মোটামুটি দেখা যায় (৪) এবার বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন সেবাস্তোপোলে, ষ্টালিনগ্রাদে) জার্মান বিমানের আধিপত্য; (৫) তাহার ট্যাংকের সংখ্যাধিক্য।—বুঝা যায়, এই দুই দিকে সোভিয়েট উৎপাদন-শক্তি পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। দেখা যায়—(৬) জার্মান সরবরাহ ও যানবাহনের সংগঠন উৎকর্ষ,—এদিকেও সোভিয়েটশক্তি জার্মানির সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সর্বোপরি দেখা যায় (৭) প্রত্যেকটি চরম স্থলে জার্মানির বলাধিক্য (superiority of numbers at decisive point)—সমর-সমাবেশের ও যুদ্ধ-কৌশলের যাহা পরম সম্পদ। জার্মানির এবারকার সার্থকতারও

ইহাই প্রধানতম কারণ। জার্মান সামরিক প্রতিভা বোধ হয় এই জন্য সর্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ জার্মান টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়র ও কারিগরদের নিকটে। বুঝা যায়, সোভিয়েট এদিকে অনেক উন্নতি করিলেও জার্মানদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই—দশ বৎসরের দক্ষতা একশো বৎসরের দক্ষতার সমতুল্য হয় না। অবশ্য জার্মান সামরিক শক্তির এই সর্বক্ষেত্রে বলাধিক্য হইয়াছে মিত্র-শক্তির জন্য—তাহারা আজও 'ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন' না খোলাতেই এই সুযোগ চক্রশক্তি লাভ করিয়াছে।

এই তৃতীয় পর্বে সোভিয়েট কৃতিত্বের প্রমাণ কি? (১) অপরাজেয় সংকল্প ও (২) ক্রমবর্ধিত জন-প্রতিরোধ,—ষ্টালিনগ্রাদ সেবাস্তোপোল যাহার প্রমাণ; (৩) সেনাদলের অক্লান্ত সংগ্রাম-শক্তি; (৪) সমস্ত জার্মান অভিযানকে মাত্র একটি রণক্ষেত্রে—দক্ষিণে—সীমাবদ্ধ করা, একই কালে (মধ্য ও উত্তর রণক্ষেত্রে) জার্মানির আর আক্রমণ চালাইবার মত শক্তি নাই; (৫) মস্কোর দক্ষিণদ্বার ভরোনেজে ফন বককে পরাস্ত করা; (৬) ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে মস্কো লেনিনগ্রাদের অপেক্ষাও দৃঢ়তর রণশক্তির, কৌশলের ও চাতুর্যের প্রমাণ দেওয়া। নগর-রক্ষার যুদ্ধে কারখানার শ্রমিকদের, জনগণের, রোডিনস্টেটে গার্ডদের ও ভলগার নৌ-তরীর এই কৌশল সামরিকদের নিকট এক নূতন শিক্ষা। (৭) *সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এই অভিযানেরও মোট লক্ষ্য এখনো অনায়ত্ত; ইহারও টাইম্-টেব্‌ল বেতাল*; এবং

যুদ্ধের মূল রাষ্ট্রীয় ও সামরিক উদ্দেশ্য এখনো ফ্যাশিস্তদের নিকটে দূরতর হইয়া উঠিতেছে।
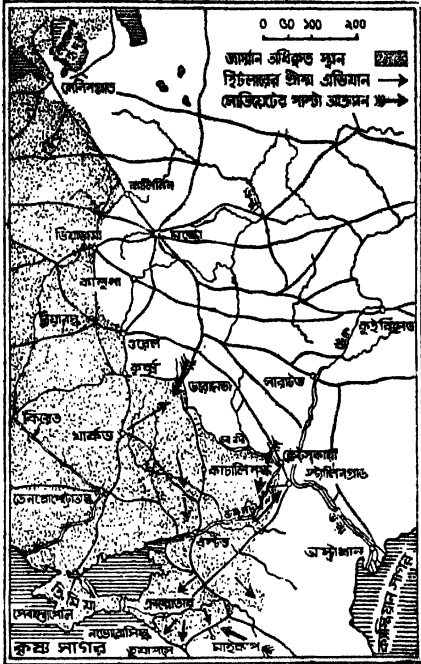
হিটলারের রুশ অভিযান

অবশ্য, উক্রেইন, ডোনেৎস হারাইবার পর সোভিয়েটের নিজ আক্রমণ-শক্তি কতটা অক্ষুন্ন রহিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে কাল-গতিতে—হয়তো এই শীতেই। সোভিয়েট তেল বা ক্ষেত বা

সোভিয়েটের শিল্প-সম্পদ
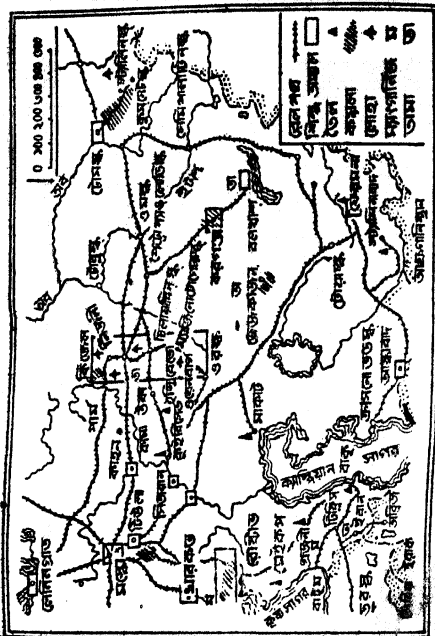
থামার বা কারথানা অবশ্য ফ্যাশিস্তদের হাতে পড়িলেই তাহাদের কাজে লাগিবে এমন নয়—তাহা পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই

সোভিয়েট ধ্বংস করিয়া যায়—কিন্তু সমুদায় উক্রেইন, কুবান অঞ্চল ও ডোনেৎস অঞ্চলের অভাবে, পশ্চিম ককেশিয়ার তেলের অভাবে, এবং বাকু ও গ্রোজনি অঞ্চলের তেল আমদানির পথ কঠিন হইয়া উঠায় সোভিয়েটের সামরিক-শক্তি কতকটা খর্ব হইবে। অবশ্য, ইহা ছাড়াও সোভিয়েটের শিল্প ও কৃষি-সমৃদ্ধ প্রধান অঞ্চল আছে —বাকু ও গোজনির তেল এখনও আছে, প্রধানতম শিল্পকেন্দ্র মস্কোর কলকারখানা আছে, লেলিনগ্রাদের কলকারখানা আছে; উরালের শিল্পাঞ্চলে আছে স্বেরডলোবস্ক, বেরেজনিকি, চেলিয়েবিনস্ক, পেরম্, জলাটোনষ্ট, টাজল্, মেগনিটোগোরস্ক প্রভৃতির প্রসিদ্ধ ধাতব কারখানা; মধ্য সাইবেরিয়ায় আছে কুজনোটস্কের কয়লা, মধ্য রুশিয়ায় তেল, মধ্য এশিয়ায় কারগাণ্ডায় কয়লা আর বলখাসের তীরে তামার খনি ও কারখানা; আফগানিস্তানের প্রায় উত্তরে ষ্টালিনাবাদে তেল, তাশ্‌খন্দে কার্পাসের আবাদ ও কারখানা, আর সমস্ত মধ্য-এশিয়া ও মধ্য-রুশিয়ায় নানা স্থানে কৃষি-অঞ্চল। সোভিয়েট শক্তিকে এই সব অঞ্চল মাল যথেষ্ট যোগাইতে পারিবে, (দ্রষ্টব্য—*USSR Builds for Itself*. Vol. i, 'Industries'; 'New Centres of Soviet Industries.' S. Upadhayaay, *Modern Review*, April 1942. *Soviet Economy And the War*, Maurice Dobb), অক্লান্ত নরনারী এই সব ক্ষেতে ও কারখানায় উর্দ্ধশ্বাসে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিয়াছে (দ্রষ্টব্য 'মস্কো নিউজ' যে-কোন সংখ্যা), আজ লাল ফৌজের

সমর-শক্তি ইহাদের উপর নির্ভর করিবে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েটের সেই সামর্থ্য নির্ভর করিবে ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে সে কতটা যুদ্ধোপকরণ পায় তাহার উপর। এ পর্যন্ত যাহা সে পাইয়াছে, ষ্টালিনের মতে, তাহার কাজের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নয়। বিমান, তেল ও ট্যাংকের প্রয়োজন সোভিয়েটের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তৃতীয়ত এবং সর্বপ্রধান কথা—ইউরোপে অবিলম্বে সত্যকারের 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' না খুলিলে সোভিয়েটের পক্ষে ক্রমশই এই সঙ্কট কঠিনতর হইবে।

এ যুদ্ধের সাক্ষ্য

কিন্তু ভবিষ্যতের ও অতীতের ঘটনাবলীর কথা ছাড়িয়া দিয়া এই যুদ্ধে যে সামরিক বিশেষত্ব দেখা গেল তাহাই আমরা লক্ষ্য করিতে চাই। (১) যোদ্ধার লক্ষ্য (পৃ. ১৭ দ্রষ্টব্য) মনে রাখিতে দেখিব, প্রথমত, সোভিয়েট সৈন্য ধ্বংস হয় নাই, তাহার কিছুমাত্র সংগ্রাম-শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; লাল ফৌজ, নৌবাহিনী ও বিমান-বহর অবিজিত। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েটের জনচিত্ত জয় করিবার সম্ভাবনাও নাই,—সেখানে নাৎসিদের প্রত্যাশিত জাতিগত, শ্রেণীগত বা উপদলগত কোনো প্রভেদই দেখা দিল না। কিন্তু জার্মানি সোভিয়েটের বহু প্রয়োজনীয় অঞ্চল দখল করিয়াছে,—উহার গুরুত্ব পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। তবে লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ষ্টালিনগ্রাদ, এমন কি ভরোনেজ তাহাদের

করায়ত্ত হয় নাই; এশিয়ার পথ তাহার বন্ধ; মিত্রশক্তির পক্ষে মুরমানস্কের পথও মুক্ত; এবং বিপুল সোভিয়েট দেশকে সম্পূর্ণ দখল করিবার আশাও তাহার নাই—সে অপেক্ষা করিতেছে সোভিয়েট শক্তিকে ক্রমশ ক্ষয় করিতে। (২) সামরিক সমাবেশ ও কৌশলের বিচারের দিক হইতে দেখি (ক) প্রথমত জার্মানি অল্প সময়ে যুদ্ধ শেষ করিতে পারে নাই, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে; অর্থাৎ সোভিয়েটরই সমাবেশ-গত সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহার অর্থ, (খ) ব্লিৎস্‌ক্রীগ বারেবারে নিষ্ফল হইয়াছে, টাইম্‌-টেবল যুদ্ধ খাটিতেছে না, এমন কি, সাঁড়াশী-গতি বা সেই চিরদিনকার ক্যান্নির (Cannae) কৌশল আর ফলপ্রদ হইতেছে না। পান্‌ৎসারের পশ্চাদস্থ পদাতিকদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা, পার্শ্বাক্রমণে ট্যাংক-কীলককে ভোঁতা করা, আর্টিলারির তৎপরতা, নৌ-সৈনিকদের (marine) কর্মকুশলতা, গোরিলাবাহিনীর উৎকর্ষ, এবং রাষ্ট্রীয়চেতনা ও আদর্শে সৈনিকদের নূতন প্রেরণাদান—রুশ-যুদ্ধের কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিদিত সত্য ও রীতি, প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। (গ) ডিফেন্সের নূতন পদ্ধতিও উল্লেখযোগ্য—ইহা লাইন-ধরা, অনড় (linear, rigid) প্রতিরোধ নয়,—ফরাসী প্রতিরোধের রীতিতে প্রণীত নয়,—ইহা সচল ও ক্রমবিবর্তিত প্রতিরোধ, ব্যূহ ভাঙিলেও আবার গড়িয়া উঠে (জার্মানরাও এইরূপ রীতিই গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা উহার নাম দিয়াছে 'elastic defence')। রুশ প্রতিরোধ বা ডিফেন্সের প্রধান উপায়

প্রত্যাক্রমণ (counter-attack), আর সেই প্রত্যাক্রমণ হওয়া চাই সর্বাঙ্গীণ (জলে, স্থলে আকাশে, শত্রুর সম্মুখে, পার্শ্বে, বিশেষত পশ্চাতে) ও সার্বজনীন—সৈনিকের, গোরিলাবাহিনীর ও বে-সামরিক জনগণের; (ঘ) এ যুগের যুদ্ধ যন্ত্রযুদ্ধ, যন্ত্রসজ্জিত বাহিনীর সার্থকতা ইঞ্জিনিয়ার কোর ও টেক্‌নিশিয়ানদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে, বলের সদ্ব্যয় (economy of forces) চরম স্থলে বলাধিক্য (superiority of numbers at decisive points) সৈনিকের সচলতা (mobility), একত্রীকরণ (concentation) আকস্মিকতা (Surprise) প্রভৃতি যুদ্ধনীতি এই টেক্‌নিশিয়ান্‌দের কুশলতায় লাভ করা যায়। এবং এইরূপ টেক্‌নিশিয়ান্‌-সৃষ্টি দেশের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক (industrial and technogical) প্রয়াস, উন্নতি, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে—এইটিই জার্মানির এ যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত সুবিধার প্রধান কারণ। (ঙ) যুদ্ধ শুধু যন্ত্রযুদ্ধ নয়, শুধু যন্ত্রসজ্জিত সৈনিকের কাজ নয়,—যুদ্ধ টোটেল যুদ্ধ ও দেশের সর্বলোকের ব্যাপার। সেনা-বাহিনীর মতই যুদ্ধে লাগে জনসেনা। তাই যেদেশে যুদ্ধ সার্বজনীন সেদেশ যন্ত্রবলেও জয় করা যায় না—বিজিত ভূমিতে গেরিলারা বাধা দেয়, দেশ জ্বালাইয়া শত্রুর জন্য রাখিয়া যায় ছাই, আর দেশের সৈনিকের সঙ্গে শ্রমিক (যেমন, লেনিনগ্রাদে, ষ্টালি-গ্রাদে) কারখানা হইতে লড়িতে আসিয়া দাঁড়ায়।

এই জনশক্তির ও সৈন্যশক্তির সংযোজনার উপর দীর্ঘযুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করিবে। স্বল্প কালের যুদ্ধ যন্ত্রচালিত সৈনিকেও

জয় করিতে পারে, তাহাতে স্বদেশের জনগণকে নানাভাবে প্রতারিত করিয়া স্বপক্ষে রাখা যায়। কিন্তু দীর্ঘযুদ্ধে জনগণের মোহভঙ্গ অনিবার্য। এই সার্বজনীন প্রতিরোধই এই যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে পরিমাণে এই সত্য মিলিত-শক্তিদের দেশেও রূপ গ্রহণ করিবে—অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্য দিয়া ব্রিটেন আমেরিকার জনগণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে—সেই পরিমাণেই চক্রশক্তির অধিকৃত অঞ্চলেও জনচেতনা কার্যকরী হইবে—এবং জনযুদ্ধের বিপ্লব-প্রেরণা সফল হইবে।

'জন-রাষ্ট্র' না হইলে এ যুগের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ক্রমশই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, ইহাই কি সোভিয়েট 'সার্বজনীন যুদ্ধের' ইঙ্গিত? আর, জনগণের চেতনা প্রবুদ্ধ না হইলে এ যুগের যুদ্ধে 'সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের' পরাজয় সুদূর—ইহাই কি ফ্যাশিস্ত সর্বগ্রাসী যুদ্ধেরও ইঙ্গিত?

তিন

পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধ

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১-এ জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ব্রিটেন ও আমেরিকাকে একই কালে আক্রমণ করিল। চক্রশক্তির তৃতীয় নেতাও যুদ্ধে যোগদান করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের প্রধান প্রতিভূও যুদ্ধে নামিয়া পড়িল। ইউরোপ উত্তর-আফ্রিকা ছাড়াইয়া যুদ্ধ এশিয়ায় প্রবেশ করিল, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত শক্তিকে তাহার কবলে টানিয়া লইল। চরম প্রশ্ন এবার উঠিয়া পড়িল—ধনিকশক্তি না গণশক্তি, প্রতিক্রিয়া না প্রগতি, কে লাভ করিবে পৃথিবীর অধিকার, গড়িবে মানুষের ভবিষ্যৎ?

জাপান যুদ্ধে নামিল অবশ্য নিজের স্বার্থেই। কারণ, সে পূর্বেই চীনে ইন্দোচীনে শ্যামে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে তাহার থামিবার উপায় নাই; মিত্রশক্তিরা (৮ই অক্টোবর ১৮৪১) তাহার লোহা ও তেল বন্ধ করিয়াছে, তাহার টাকা-কড়ি আটকাইয়াছে (freezing order); ইউরোপে চক্রশক্তির পরাজয় ঘটিলে জাপানীদিগকে তাহারা আর রেহাই দিবে না। চক্রশক্তির জয়েই জাপানের জয়; চক্রশক্তির যুদ্ধে যতদিন এই পাশ্চাত্য শক্তিরা ব্যাপৃত, ততদিনই তাহার প্রশান্ত মহাসাগরে সুযোগ। এদিকে আর তাহার অপেক্ষা করাও চলে না—চক্রশক্তিও বিপন্ন হইতেছিল। কারণ ইউরোপে যখন ফ্যাশিস্তশক্তি সোভিয়েট

দেশে বানচাল হইয়া পড়িল তখন দেখিল যুদ্ধ দীর্ঘতর হইল; দেখিল এই সুযোগে বৃটেন ও আমেরিকা অপরিমিত যুদ্ধযন্ত্র সংগ্রহ করিতেছে; সোভিয়েট যদি বা দুর্বল হয়, যুদ্ধে চক্রশক্তি দুর্বলতর হইতেছে, আসলে ব্রিটেন ও আমেরিকার হাতেই ইউরোপের ভাগ্য চলিয়া যাইতেছে, এশিয়ার ভাগ্যও যাইবে। অতএব পুরানো সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়ার যুদ্ধ বাধাইয়া দুর্বল করিয়া ফেলা ইউরোপীয় ফ্যাশিজ্‌মের প্রয়োজন; আর ব্রিটেনের আমেরিকার শক্তি প্রবল না হইতেই তাহাদের প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়ায় আঘাত করা হইল জাপানের প্রয়োজন। জাপানের যুদ্ধে নামা হিটলারেরও গোড়ার ব্যর্থতার প্রমাণ ঃ—ইউরোপের যুদ্ধ হিটলার শেষ করিতে পারিল না, সোভিয়েট শক্তিকে পরাভূত করিতে পারিল না; অধিকন্তু মিত্রশক্তিই প্রবলতর হইবার সুযোগ লাভ করিল—ফ্যাশিজ্‌মের চরম সংকট নিকটতর হইতে লাগিল।

ইউরোপে যে যুদ্ধ ২২শে জুন রূপান্তরিত হইল, এশিয়ার 'উপনিবেশিক জাতিদের' চক্ষে যুদ্ধের সে রূপ পরিষ্কার হইয়া ফুটিতে পারিল ৭ই ডিসেম্বরের পরে—যেমনি জাপানী সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য 'অগ্রসর হইয়া আসিল—এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধেও এ যুদ্ধ এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধরূপে (War of Liberation) দেখা দিল। উপনিবেশিক জগতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনযুদ্ধ যতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আবার পরিষ্কার হইল সামরিক হিসাবে সার্বজনীন যুদ্ধের মূল্যও।

এশিয়ার দ্বন্দ্বের রূপ

প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্যা যেন পৃথিবীর মূল রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে এই যুগের সাম্রাজ্যবাদ প্রথম তাহার লোভের ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে, আফ্রিকায় পরে তাহারই আর এক অঙ্ক উদ্‌ঘাটিত হয়। জাপানও প্রশান্ত মহাসাগরের সন্তান—সে মনে করে এ জগতের উত্তরাধিকার তাহারই। এশিয়া তাহারই সাম্রাজ্য। (দ্রষ্টব্য 'তানাকা মেমোরিয়েল')

এক দিকে এই সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্বিরোধ এই সাগরের তীরে জলে স্থলে প্রখর হয়, অন্য দিকে দেখা দেয় সমস্ত সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী এশিয়ার জনশক্তি। চীন ও ভারতবর্ষে তাহাই মাথা তুলিতে থাকে, আর তাহাদেরই নেতৃ-স্বরূপ দেখা দেয় মধ্য-এশিয়ার পিছিয়ে-পড়া জাতিদের মুক্তিদাতা সোভিয়েট শক্তি—পৃথিবীর জনশক্তির অগ্রদূত। সে-ও এশিয়ার শক্তি, সে-ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবাসী। এশিয়ার সমস্ত উত্তর ছাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বোত্তরে রহিয়াছে সাম্যবাদী সোভিয়েটের সাইবেরিয়া ও সুদূর প্রাচ্য প্রদেশ।

পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও পরাধীন জাতিদের সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়ার তীরে এই যুগের এই দুই দ্বন্দ্বই খরতর হইয়া উঠিতে-ছিল। জাপানী-সাম্রাজ্যবাদের তাই প্রধান শত্রু হয় সাম্যবাদী সোভিয়েট ; দ্বিতীয়ত, জাপানী ও চীনা কম্যুনিষ্টরা ; তৃতীয়ত,

জাপানী-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চীনা জাতীয়তাবাদ। এই সব প্রয়াসে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের (সাইমন এমেরি প্রভৃতিদের) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহানুভূতিও লাভ করে। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদীরাই এশিয়ায় চীনে সাইবেরিয়ায় জাপানের পথ করিয়া দিয়া আপনাদের লাভ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। তবু এশিয়া দখল করিয়া আছে এই সাম্রাজ্যবাদীরা, তাহারাই জাপানের পথের কাঁটা। ইহাদেরই প্রতিদ্বন্দী হিসাবে জাপান প্রথমত দুর্বার শিল্পশক্তি গড়ে। তারপর গড়িতে থাকে সামরিক শক্তি,—নাকচ করিয়া দেয় ওয়াশিংটনের নৌচুক্তি। ব্রিটেন-আমেরিকার অনুপাতে সে ৫।৫।৩ এই ক্ষুদ্রতর নৌশক্তি থাকিতে অস্বীকার করে, পরিত্যাগ করে জাতি সংঘ, চক্রশক্তিতে যোগদান করে, আর শেষে পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধের মধ্যে তাহার এশিয়ার বখরা আদায় করিয়া লইতে অগ্রসর হয়।

'চীনের ঘটনা'

জাপান অবশ্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল অনেক পূর্বেই ১৯৩১এ। তাহার মাঞ্চুরিয়া আক্রমণেই এ যুগের যুদ্ধের রাষ্ট্রীয় সূচনা। তারপরেও জাপান জেহোল-চাহার প্রভৃতি উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশ দখল করিয়া বসে, অন্তর্মঙ্গোলিয়া আয়ত্ত করে; চীনের উপরে ক্রমেই তাহার ছায়া দীর্ঘতর ও ঘনায়িত হইতে থাকে। মার্শাল চিয়াংকাই-শেক তখনো চীনা কম্যুনিষ্টদের নিপাতেই

নিযুক্ত; কম্যুনিষ্টদের প্রার্থনানুযায়ী জাপানী-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করিতে প্রস্তুত নন। সৈন্য-শিক্ষকদের সাহায্যে চীন-বাহিনী গড়িবার, কম্যুনিষ্টদের উচ্ছেদ করিবার এবং চীনকে নূতন করিয়া সংগঠন করিবার জন্য সময়
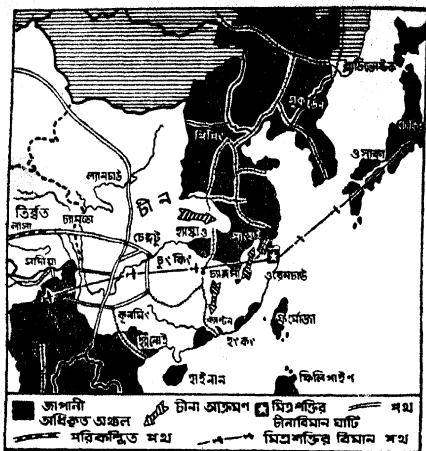
চাই। তাই তাঁহার চেষ্টা ছিল 'জাপানী-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ফ্রন্ট নয়,—জাপান, এবং কতকাংশে ব্রিটেনের ও আমেরিকার ধনিকবর্গের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা। জাপানও চাহিতেছিল এক দিকে মধ্যউত্তর-চীনের কম্যুনিষ্টদের শেষ করিতে,

আর চিয়াংকাই-শেকের সংগঠন পাকা না হইতেই সে তাড়াতাড়ি চীন কবলিত করিয়া বসিতেছিল। চিয়াংকাই-শেকের শীঘ্রই পথ রহিল না। তাঁহার সৈন্যাধাক্ষরাও তাঁহাকে তাড়া দিতেছিল। চ্যাং সো লিয়াংতো একবার তাঁহাকে গ্রেফ্তারই করিল, এমনি সময়ে ৭ই জুলাই ১৯৩৭, জাপান ও চীনের এক দল সৈন্যের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষ ঘটে পাইপিংএর উপকণ্ঠে মার্কোপলো পোলের নিকটে। সেই ওজুহাতে জাপান দখল করিল পাইপিং ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চল, চিয়াংকাই-শেক আপত্তি করিলেন, প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—আরম্ভ হইল চীনের 'ঘটনা', আজ পাঁচ বছরেও যাহা মিটে নাই, যাহার জের টানিতে টানিতে জাপান মহাযুদ্ধের মধ্যে গিয়া পড়িল—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ঝড় বহিতেছিল, তাহা সমস্ত সাগর মথিয়া বেড়াইতে লাগিল।

চীন যুদ্ধের ঘটনাবলী পাঁচ বৎসরের আলোচনা না করিয়া তাহার মূল সাক্ষ্যগুলি নির্দেশই যথেষ্ট। প্রথম অঙ্কে চিয়াংকাই-শেক তাঁহার জার্মান-শিক্ষিত নূতন বাহিনী লইয়া নানকিং সাংহাই প্রভৃতি রক্ষায় প্রবৃত্ত হন। সৈন্য হিসাবে তাহারা কর্মঠ; কিন্তু জাপানী সেনাদের মত তাহাদের যন্ত্রবল কোথায়? ফলে সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া এই চীনা বাহিনী প্রায় লাখে লাখে নির্মূল হয়—সাংহাই, নানকিং, হ্যাংকাউ রক্ষা পাইল না—দুই বৎসরে প্রায় সমৃদ্ধ ও উপকূলস্থ চীন জাপানের করায়ত্ত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় বর্ষের শেষ হইতে চীন সেনাপতি তাঁহার সমাবেশ ও

কৌশল দুইই পরিবর্তন করেন। সেই নূতন যুদ্ধ পরিকল্পনা এই সোভিয়েট যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মণীষী মাও-ৎসে-তুং-এর। মধ্যউত্তর চীনের প্রদেশদ্বয়ের তিনি নায়ক, উহাদের [illegible]ট আর্মি ও ৪র্থ আর্মি এই নীতিতেই চলে—মার্শাল চু-তের নেতৃত্বে। এই নীতির মূল কথা হইল এই যে, (১) জাপানকে প্রথমত যুদ্ধ শেষ করিতে না দেওয়া—দরকার মত শহর ছাড়িয়া দেওয়া ('Sell space for time'), যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করিয়া তোলা (ক) যাহাতে চীনের বুকে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা আছে তাহারা ইউরোপে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে, (খ) আপন স্বার্থ রক্ষার জন্যই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও চীনকে সাহায্য করিতে আসে ; (২) অবিলম্বে সমগ্র চীনে 'জাপানী-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট' গঠন করা (১৯৩৭এর ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ইহা সফল হইয়াছে) ; (৩) সম্মুখ-সমরে বেশি অগ্রসর না হইয়া আপনার শক্তি বাঁচানো [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আক্রমণে শত্রুর শক্তি ক্ষয় করা অর্থাৎ গোরিলা-[illegible]নীর সৃষ্টি ও গেরিলা যুদ্ধ ; জন-প্রতিরোধ সৃষ্টি ও শত্রু-অধিকৃত [illegible]ল জনযুদ্ধ চালনা ও অধিকৃত অঞ্চল জ্বালাইয়া দেওয়া ('scor[illegible]d earth policy') ; (৪) তদবসরে আবার চীনের অভ্যন্তরে [illegible]ী প্রভৃতি লইয়া গিয়া (ক) নূতন বাহিনী গঠন, (খ) নূতন [illegible]াদি গঠন, (গ) বাহির হইতে, বিশেষত সোভিয়েট ভূমি হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ।

মোটামুটি এই নীতি চিয়াংকাই-শেকও গ্রহণ করেন—জনযুদ্ধই আজ প্রধান কথা। সম্মুখ-যুদ্ধে চীন এখনো অগ্রসর

হয় বটে, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দেশ জনপদে প্রতিরোধ চালায়—কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার শত্রুক্ষয়, তাহার কৌশল চুম্বকাকর্ষণে শত্রুকে তাহার দিকে টানিয়া আনিয়া ধ্বংস করা—শত্রুর সৈন্যরেখা ক্রমেই এই টানে দীর্ঘ হইয়া পড়ে—এই বৎসর চ্যাংসার দুই যুদ্ধেও চীন এই 'চুম্বক-যুদ্ধ পদ্ধতিতে' (magnetic warfare) জাপানীদের ধ্বংস করে।

মোট কথা, প্রথমত চীনে ঐক্য স্থাপিত হয়। ফলে চীনে এক অভূতপূর্ব সংকল্প দেখা দেয়—চীনের যুদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ ও জনযুদ্ধে পরিণত হয়—তাই জাপান পাঁচ বছরেও চীন জয় করিতে পারিল না।

ফ্যাশিস্ত মহাযুদ্ধের মুখে

১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাপানী রাষ্ট্রনীতি একটু তালকানা হইয়া পড়ে, হিটলার সোভিয়েটের সঙ্গে মিলিত হইল! তারপর, মাৎসুওকা ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১-এ করিয়া আসেন সোভিয়েটের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি। বুঝা গেল জাপানের আপাতত লক্ষ্য হয়তো সোভিয়েট দেশ নয়—দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ার অফুরন্ত কাঁচা মাল। হিটলার তাঁহার চুক্তি ভাঙিলেন দুই মাস পরেই, কিন্তু জাপান তাহার চুক্তি এখনো ভাঙে নাই—নিশ্চয়ই সুবিধা বুঝিলে সে-ও তাহা ভাঙিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অতুলনীয়

সম্পদের দিকে, অভাবনীয় সুযোগের প্রতি, পূর্ব-পৃথিবীর অসাপত্ন্য অধিকারের উপর।

জাপানের সুযোগ আসে ফ্রান্সের পতনের পরেই। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে মোটামুটি জাপানী সাম্রাজ্য ছাড়াও সাতটি এলেকা—পাঁচটি মহাশক্তি—প্রতিষ্ঠিত। (১) উত্তরে সোভিয়েট দেশ ও তাহার প্রভাবান্বিত বহির্মঙ্গোলীয়া, সেদিকেই ১৯৩৯ পর্যন্ত জাপানের সঙ্গে সাত হাজার বার সংঘর্ষ ঘটে। ব্লাডিভোষ্টকের বিমান-ঘাটি হইতে জাপানের বরাবর বিমান-আক্রমণের ভয়। (২) তারপর চীন। (৩) ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশ। অকস্মাৎ এখানে ফরাসীরা যেন শূন্যে ভাসিতে লাগিল—জাপানের হুমকীতে হাইফং, সাইগন, হানোই প্রভৃতি স্থানে জাপানের ছাউনি ও ক্যাম্‌রান উপসাগরে জাপানী নৌঘাটি ও বিমান-ঘাটি গড়িতে দিল (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) ;—জাপানী সৈন্যদের জন্য দক্ষিণ চীনের ও দ্বীপময় ভারতের পথ খুলিয়া দিল, জাপানকে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিল। (৪) ইহারই পশ্চিমে পূর্বেকার শ্যাম দেশে, এখনকার তা'ইদেশ। ক্রমশই এই দেশ জাপানের কবলে পড়িতেছিল। রুমানিয়া-হাঙ্গেরী যেমন হিটলার-তন্ত্রে ঢুকিয়া পড়ে তেমনি তা'ইরাও জাপানী-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছিল (১৯৪১ এর ৫ই আগষ্টের চুক্তি)। তা'ইদের মনে-মনে ভয় ছিল—হয়তো বা ব্রিটেন ও সোভিয়েট শক্তি ইরানে যেমন চক্রশক্তির প্রভাব সহে নাই, বেশি বাড়াবাড়ি করিলে তা'ইদেশেও তাহারা জাপানী

প্রতিষ্ঠা সহিবে না। কাজেই তা'ইদেশ নিজেদের বলিতেছিল নিরপেক্ষ (৯ই আগষ্ট, ১৯৪১)। (৫) ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য 'ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ'—যবদ্বীপ, সুমাত্রা, নিউ গিনির কতকাংশ ও সমুদ্রের এদিকে ছোট বড় দ্বীপ। প্রায় ছয় কোটি লোকের দেশ যবদ্বীপ, অপূর্ব তাহার সম্পদ, তেল রবার চিনি প্রচুর। সুরাবায়াতে তাহাদের নৌঘাটি—যুদ্ধ-যোগ্যতা ওলন্দাজদের সামান্য, কিন্তু যুদ্ধোপযোগী উপকরণ আছে প্রচুর। হল্যাণ্ডের মত পতনের পরে এই সাম্রাজ্য যেন জাপানের হাতে পরিপক্ক ফলের মত পড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—উহার রক্ষার একমাত্র ভরসা দিতেছিল আমেরিকা। (৬) মার্কিন-অধিকৃত এলেকা,—প্রধানত (ক) ফিলিপাইন, উহার উপর জাপানের চিরদিনের লোভ, তাহার সমুদ্র-পথের কাঁটা মানিলা কাভিটা প্রভৃতি মার্কিন ঘাটি ; (খ) তাহার পর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এক-একটি ঘাটি—মার্কিন ১৬২৫ মাইল দূরে গুয়াম,—গুয়ামের নিকটেই সাইপান দ্বীপপুঞ্জে জাপানী ঘাটি—গুয়াম হইতে ১৫০০ মাইল দূরে ওয়াকে আর ওয়াক হইতে ১২৫০ মাইল দূরে মিডওয়ে, সর্বশেষে হাওয়াই দ্বীপে পার্ল হারবার—মিডওয়ে হইতে ১৩১২ মাইল আর সানফ্রানশিস্কো হইতে ২৪১০ মাইল—মার্কিন প্যাসিফিক ফ্লিটের আসল আড্ডা। অবশ্য (গ) একেবারে উত্তরে এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জেও 'ডাচ হারবার' আছে ; আর আছে দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে পেগো-পেগো দ্বীপ। (৭) ব্রিটিশ এলেকা প্রায় সমস্ত দক্ষিণ জুড়িয়া—মালয়-ব্রহ্ম হইতে হংকং ও অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড,

ফিজি পর্যন্ত। প্রধান ঘাটি তাহার জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব পথের উপর হংকং-এ, তারপর সিংগাপুরে; উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইনে, পূর্ব অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে, এবং নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে। জাপান যেমন ইন্দোচীন ও তা'ইল্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়াইল, যে প্রধান চার শক্তি তার বিরুদ্ধে একত্রিত হইল তাহা আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন ও ডাচ। ইহারই সংক্ষেপে নাম—'এ. বি. সি. ডি. ফ্রণ্ট' (A. B. C. D. Front)।

প্রশান্ত মহাসাগরে রাষ্ট্রীয় সমাবেশ এইরূপ। ইহার ফলে সামরিক ব্যবস্থাটা হইল এইরূপ—পূর্বে সিংগাপুর হইতে স্বরাবায়া ধরিয়া পোর্ট ডারুইন, সিডনি দিয়া ফিজি হইতে ২৭৩২ মাইল দূরে হাওয়াইর পার্ল হারবার, কিংবা সিডনি হইতে একেবারে ৭,৭০০ মাইল দূরে কিংবা অকলাণ্ডের পথে পানামা; ইহাই 'এ বি সি ডির' দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত লাইনের রেখা। উত্তরে হংকং তাহার একটি স্বরক্ষিত বহির্দ্বার,—যদিও হংকং-এর এক দিকে জাপানের ফর্মোসা দ্বীপের ঘাটি তাইওয়ান আর দক্ষিণ দিকে জাপানী অধিকৃত হাইনান দ্বীপ। হংকং-এর পর কাভিটা হইতে পার্ল হারবার পর্যন্ত গুয়াম-ওয়াকে মিডওয়ে দিয়া পশ্চিম মধ্য পথ—যাহার উপর জাপান ছোঁ মারিতে পারে বেশি। জাপানের নিজ দেশে তাহার ঘাটি আছে পূর্ব তটে ও পশ্চিম তটে; তাহা ছাড়া রাশিন হইতে উত্তর চীনের তটে পীত সমুদ্র জাপান পাহারা দেয়, উপকূলে তাইনান ও হাইনান হইতে চীনের হ্যাংকাউ পর্যন্ত নৌ-অভিযানে প্রস্তুত করে, আর ব্রিটেনের হংকং-এর উপর চোখ

রাখে ; পশ্চিম মধ্য প্রশান্ত সাগরে বোনিন, সাইপান ও পেল্যু দ্বীপের ঘাটিগুলি হইতে ফিলিপাইনকে ঘিরিয়া থাকে, আমেরিকার মধ্য প্রশান্তের পথ সঙ্কটপূর্ণ করিয়া রাখে।

যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ ও পথ

এই রাষ্ট্রীয় ও সামরিক পরিমণ্ডলে যে কয়টি মূলগত সামরিক সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা মনে না রাখিয়া উপায় নাই— প্রথমত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্নতা। উত্তরে এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যে-সময়ে কুয়াসা ও ঝড় চলিতেছে, দক্ষিণের উষ্ণমণ্ডলের ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয়, ব্রহ্মে বিশেষ করিয়া, যবদ্বীপ সুমাত্রা, রুশিয়াতে তখন গ্রীষ্ম ও তাহার পরেই মৈসুমী বর্ষা ; শীতে যখন উত্তর চীনে ও জাপানে বরফ জমিতেছে তখনো এই দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত সাগরের দ্বীপে প্রায় মন্দমলয়। আবার মধ্য উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় যেমন বিরাট বৃষ্টিশূন্য মরুভূমি, কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে সমুদ্রতট নাতিশীতোষ্ণ, নিউজিল্যাণ্ডে তেমনি শীত ; আর মালয়, ব্রহ্মে সুমাত্রায় নদীনালা, জঙ্গল,—আধুনিক স্থলযুদ্ধের সমরোপকরণ বড় ট্যাংক, বড় সাঁজোয়া গাড়ি, বড় ফিল্ড গান, প্রশস্ত প্রান্তর ও বিপুল বাহিনীর সমাবেশের এখানে সুযোগ কম। চাই জঙ্গল-যুদ্ধে শিক্ষিত, নদীনালা পার হইতে অভ্যস্ত সৈনিক, আর আকাশচারী বোমারু বিমান ও কর্মিষ্ঠ প্যারাশুট। অর্থাৎ এখানে ইউরোপীয় ব্লিৎস্‌ক্রীগের উপযোগী ক্ষেত্র নাই। দ্বিতীয়ত, এক একটা

ঘাটি হইতে অন্য ঘাটির দূরত্ব। ইউরোপের সামরিক ক্ষেত্র যেন এই প্রকাণ্ড জগতের তুলনায় ছেলেদের পড়াঘরের মানচিত্র। সিংগাপুরে পোর্ট ডারুইনে দূরত্ব ১৯০২ মাইল, সিংগাপুরে হং-কং-এ ১৪৪০ মাইল, হং-কং-এ পোর্ট ডারুইনের ২৫১২ মাইল, আমেরিকার ঘাটিগুলির এক একটির দূরত্বও প্রায় দেড় হাজার মাইল। আবার এসব প্রায় ঘাটিরই কাছে জাপানের ছোট খাটো আস্তানা আছে। তবু প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বড় পাল্লার বিমানের ও বিশেষ করিয়া বিমানবাহী যুদ্ধ-জাহাজেরই উপযোগিতা বেশি হইতে বাধ্য। এই কথা হইতেই তৃতীয় সত্যটিও পরিষ্কার—এই জগতের যাতায়াত পথ মাটি নয়, সমুদ্র ও আকাশ; অবশ্য সেই পথ বন্ধ হওয়ায় চীন 'ব্রহ্ম পথ" তৈয়ারী করিয়াছে,—কিন্তু 'সে আপদ্ধর্ম'। না হইলে আমরাই চীনে যাই সমুদ্র পথে। হ্যাংকউ মধ্য-চীনে অবস্থিত, প্রশান্ত উপকূল হইতেও ১,০০০ মাইল দূরে; সমুদ্র-পথে আমাদের ৫,২০০ মাইল, স্থলপথে প্রায় ২,৪০০ মাইল,—তবু হ্যাংকউ-এ আমাদের গন্তব্য পথ সমুদ্র। এমন কি ব্রহ্মেও আমাদের গতায়াতের পথ বঙ্গোপসাগর, আর ফটক একমাত্র রেঙ্গুন; মালয়ের ফটক পিনাং, সিংগাপুর। আর তা'ইদেশ ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির তো কথাই নাই। জাপান আবার দ্বীপ, ব্রিটেনের মতই তাহার প্রাণ সমুদ্রে, তাহার ভাগ্যেতিহাস সমুদ্রে, তাহার বিধিলিপি প্রধানত নৌ-শক্তির বিধিলিপি। জাপানের যুদ্ধ তাই পূর্বাপর প্রধানত নির্ভর করিবে সমুদ্রাধিপত্যের উপর ও বিমানাধিপত্যের উপর।

জাপানের অভিযান-পথও তাই প্রায় পূর্ব-নির্ণীত হইয়াই ছিল :—প্রথমত, দক্ষিণ উপকূলের পথ। তাহার ইন্দোচীনে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; সেখান হইতে তা'ইদেশে বিনা যুদ্ধে বা নামমাত্র যুদ্ধে সে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করিবে, ভারত মহাসাগরের তটে মালয়, সিংগাপুরে, ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম-প্রশান্ত সমুদ্রের জলপথ :—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে নিজ ঘাটিগুলি হইতে ঘিরিয়া ধরিবে ; পার্ল হারবার হইতে ফিলিপাইন পর্যন্ত আমেরিকার মধ্য সমুদ্রপথ বন্ধ করিবে। তৃতীয়ত, ঈষ্ট ইণ্ডিজ বা দ্বীপময় ভারতের পথ, আমেরিকার পথ বন্ধ করিয়া ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ অধিকৃত বোর্ণিও সারাওয়াক্-এ নামিলে সমুদ্র-পথে সিংগাপুর প্রায় পরিবৃত হইবে, ব্রিটেনের পথও বন্ধ হইবে।

আশ্চর্য এই যে, এই সুবিদিত অভিযান-পথ, জাপানের সুপরিস্ফুট মনোভাব, জাপানী রাষ্ট্রীয় ও সামরিক সংগঠনের অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ—এই সব জানিয়াও এ-বি-সি-ডি শক্তিপুঞ্জ এক আকস্মিক আক্রমণেই একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল।

জাপানের এই অভিযান এমনি তড়িৎ-গতিতে অগ্রসর হইয়া গেল যে, উহার নিকট যেন জার্মানির ব্লিৎস্ক্রীগ-ও আর চমকপ্রদ রহিল না। এই ইতিহাস এতটা সুবিদিত যে, তাহার সামান্য উল্লেখই যথেষ্ট ; প্রয়োজন শুধু বুঝিয়া দেখা যে, সামরিক দৃষ্টিতে উহাতে কোন নূতন বা কার্যকরী পদ্ধতির আভাস পাওয়া গেল, পূর্ণযুদ্ধের কি সম্ভাবনা দেখা দিল।

যুদ্ধের গতি—প্রথম পর্ব

(১) **পার্ল হারবার**—৭ই এপ্রিল রাত্রিতে অকস্মাৎ আমেরিকার পার্ল হারবার নৌঘাটি আক্রান্ত হইল। জাপান হাওয়াই'র বিমান-ঘাটিতে হানা দিল, ফিলিপাইনে বিমান-আক্রমণ করিল; সিংগাপুরেও জাপানী বিমান বোমা বর্ষণ করিল, হংকংএও বোমা ফেলিল। পার্ল হারবার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরক্ষিত নৌঘাটি; আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবহরের আড্ডা এখানে। আমেরিকার এই নৌবহর প্রবল শক্তিসম্পন্ন; নৌকর্তারাও পূর্বেই আক্রমণ সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অবহিত হন নাই। ফলে এই অতর্কিত আক্রমণে আমেরিকার ১ খানা ব্যাটলশিপ, ৫ খানা ভালো যুদ্ধ-জাহাজ ও অন্যান্য অনেক সহকারী যুদ্ধ-জাহাজ একেবারে নিমজ্জিত হইল, এবং ২ হাজারের মত নৌ-নায়ক ও সেনানী হত হইল, আর তেমনি বিনষ্ট হইল সেখানকার অনেক বিমান ও বিমান-সেনানী। জাপান হারায় ৩ খানা ডুবোজাহাজ, ৪১ খানা বিমান। কিন্তু এক আঘাতেই প্রায় প্রশান্ত মহাসাগরের প্রথম পর্বের জয়-পরাজয় স্থির হইয়া যায়—আমেরিকার মুখ চাহিয়াই এ-বি-সি-ডি দল বসিয়া ছিল, সেই আমেরিকার বিশাল 'প্রশান্ত নৌবহর' হতবল হইয়া পড়িল, আক্রমণ-শক্তি আর তাহার রহিল না, রুজভেল্ট বহু ক্ষোভে কহিলেন—আক্রান্ত ফিলিপাইনেও আমেরিকা আর সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছে না,

সেখানে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ ও অন্য জাহাজ সৈন্য নামাইতে লাগিল। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমার্ধে এই আঘাতেই জাপানের নৌ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, গুয়াম (১২ই ডিসেম্বর), ওয়াকে (২৩শে ডিসেম্বর) তাহার হস্তগত হইল—আমেরিকার অধিকার বজায় রহিল মিডওয়েতে ও হাওয়াইতে।

(২) **ব্রিটিশ নৌবলের দুর্ভাগ্য**—পার্ল হারবারে যে দুর্ভাগ্য ঘটে তাহা সম্পূর্ণ হয় শ্যাম উপসাগরে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ও 'রিপাল্‌সের' নিমজ্জনে (৯ই ডিসেম্বর)। সিংগাপুরে এই মহাতরীদ্বয় আসিয়াছে, সবাই জানে। তা'ইদেশ হইতে মালয়ের কোটাবারুতে জাপানী সৈন্য নামিতেছে জানিয়া ব্রিটিশ 'সুদূর প্রাচ্য বহরের' সেনাপতি সার্ টম ফিলিপ এই দুই মহাতরী লইয়া তাহাতে বাধা দিতে গেলেন। সাইগন হইতে জাপানী বোমারুরা খবর পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ইহাদের উপরে আসিয়া পড়িল—এই রণতরীদ্বয়ের সঙ্গে কোনো বিমান-আচ্ছাদনই ছিল না। ইহাদের ডুবাইয়া জাপান সমুদ্রাধিপত্য বিস্তৃত করিল।

(৩) **তা'ইদেশ**—৮ই ডিসেম্বর তা'ইদেশ প্রত্যূষে আক্রান্ত হয় ; ৫ ঘণ্টার নামমাত্র যুদ্ধের পরে তা'ইদেশ জাপানের নিকটে আত্মসমর্পণ করে। জোয়ারের মত তাহার উপর দিয়া জাপানী অভিযান মালয় ব্রহ্মের দিকে বহিয়া চলিল। ২১শে ডিসেম্বর হইতে তা'ইরা 'এশিয়ার সহ-সম্পদ গোষ্ঠী' (Asiatic Copros-perity Plan) বা জাপানী নব-বিধানে যোগ দেয়। ততক্ষণে

তাহারই ঘাটি হইতে জাপানীরা বিমানবলে ব্রিটিশ ব্যাট্‌ল্‌শিপ, 'প্রিন্‌স অব ওয়েল্‌স' ও 'রিপাল্‌স' ডুবাইয়াছে, মালয় সিংগাপুর ছাইয়া ফেলিতেছে—আর উত্তরেও হংকং প্রায় যাইতে বসিয়াছে।

(৪) **হংকং-এর পতন**—কিছুদিন পূর্বেও হংকং-এ কানাডার ও ভারতের নূতন সৈন্য যায়—এই সুদৃঢ় দুর্গের দুর্জেয়তার কথা আবার ঘোষিত হয়। কিন্তু রক্ষার যোগ্য বিমানবলের কোনো ব্যবস্থাই হংকং-এ হইল না। মাত্র ৭ দিনের (১৮ই-২৫শে) বিমান ও সেনার আক্রমণেই এখন হংকং ভাঙিয়া পড়িল; ব্রিটিশ সৈন্যদের তখন জলাভাব ঘটিয়াছে, গোলাবারুদও নাই। প্রধানত বিমানবলের একান্ত অভাবে ব্রিটিশ সৈন্য (২৫শে ডিসেম্বর) আত্মসমর্পণ করিল।

(৫) **মালয় ও সিংগাপুরের পতন**—ততক্ষণে মালয়ও বিজিত হইতেছে। 'প্রিন্‌স অব ওয়েল্‌স' ও 'রিপাল্‌স' ডুবির পর জাপানীরা মালয়ের জঙ্গল ও নদী-নালা পার হইয়া আসিতে লাগিল—কেদা বিভাগ গেল, পেনাং ইউরোপীয়রা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া পলাইল (১৮ই ডিসেম্বর); টিন-খনির দেশ ইপো ছাড়িয়া ব্রিটিশ সৈন্য পেরেকে আসিল—কিন্তু বনে জঙ্গলে কোথা দিয়া কি ভাবে জাপানী সৈন্য উত্তীর্ণ হইল, ব্রিটিশ সেনাদের পার্শ্বে পিছনে অনুপ্রবেশ করিল, তাহা যেন তাহারা বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না। উত্তর হইতে সিংগাপুরের দুয়ারে যখন এই অভিযান পৌছিল তখন সিংগাপুরের অবস্থা কঠিন। সিংগাপুর সমুদ্রাক্রমণের জন্যই বিশেষ ভাবে অস্ত্র-সজ্জিত ছিল—উত্তরে

তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ক্রমান্বয়ে জাপানী বিমানের আক্রমণে তাহার রক্ষা-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই দুর্বল হইয়াছিল—বিমানবলের অভাবে তাহার রক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। মালয়ের পরাজিত ব্রিটিশ বাহিনীও এখানে আসিয়া ঠাঁই লয়। লড়াই অনেক হইয়াছিল,—পনের দিনের দিবারাত্র জাপানী বিমান ও বড় কামানের আক্রমণের ফলে হংকং-এর মতই সিংগাপুরের মহাদুর্গ আত্মসমর্পণ করিল—প্রায় ৭০ হাজার বন্দী জাপানের হাতে পড়িল। এ যুদ্ধের ইতিহাসে তখন পর্যন্ত এমন দুর্ভাগ্য ব্রিটিশের আর ঘটে নাই—ডানকার্কে নয়, গ্রীসে নয়, মিশরে নয়। বুঝা গেল, পূর্ব-এশিয়া রক্ষার যাহা কিছু ব্যবস্থা ব্রিটেনের ছিল তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

(৬) **জাভা ও দ্বীপপুঞ্জ**—দেখিতে-না-দেখিতে একটির পর একটি দ্বীপ জাপানীরা অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল—বোর্নিওর তৈল-প্রদেশ আগেই গেল, সুমাত্রা গেল, টিমোর, আমবোনিয়া গেল, নিউগিনি অনেকাংশে গেল, অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ প্রায় সবই জাপানের হাতে পড়িল। ভরসা ছিল যবদ্বীপ কেন্দ্র করিয়া প্রতিরোধ জীয়াইয়া রাখা চলিবে; 'বিলম্বসাধক সংঘর্ষে' (delaying action) আমেরিকা ও ব্রিটেন তাহা হইলে সামলাইয়া লইবার সুযোগ পাইবে। এই উদ্দেশ্যে চার্চিল-রুজভেল্ট যে সমাবেশ (Grand Strategy) এই পূর্ব-এশিয়ার জন্য কল্পনা করেন জাভার যুদ্ধে তাহা বেচাল হইল। প্রথমত, জাভার পথে আমেরিকার নৌ-বল বাধা দিতে

গিয়া জিবার সমুদ্রে বিশেষরূপে আহত হইল, প্রায় সব কয়খানা যুদ্ধজাহাজ খোয়াইল; তখন সব প্ল্যান ব্যর্থ হইল, মাত্র ৭ দিনে জাপানের বিমান-বাহিত সেনানী ও জাহাজ-বাহিত সেনানীর নিকট যবদ্বীপের ওলন্দাজ প্রতিরোধ উড়িয়া গেল। এমন করিয়া ছয় কোটি লোকের দেশ হাত বদল হইল—অত তেল লইয়া, রবার লইয়া, চিনি লইয়া, চা লইয়া—এ যুগে বোধ হয় এমন দৃষ্টান্ত আর মিলে নাই।

(৭) **ব্রহ্মদেশ**—ততক্ষণে ব্রহ্মদেশেও জাপান অগ্রসর হইয়া যায়। দক্ষিণে ভিক্‌টোরিয়া পয়েণ্ট ও টেনাসেরিম বিভাগ দখল করিয়া মৌলমিনে তাহারা উপস্থিত হয়। ২৩শে ও ২৫শে ডিসেম্বরের বোমা বর্ষণে রেঙ্গুনের জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল হয়। তবু কর্তৃপক্ষ রেঙ্গুন রক্ষার সংকল্প করে। জেনারেল ষ্টিলওয়েলের নেতৃত্বে চীন সেনানীরা 'ব্রহ্মপথ' রক্ষার জন্য পূর্ব-উত্তরে আসিয়া পৌছে। পূর্ব-দক্ষিণে সালুইন নদীর তীরে প্রথম ব্রিটেনের প্রতিরোধক্ষেত্র ছিল, তাহা টিকিল না। ত'াইদেশ হইতে শানরাজ্যে এক জাপানী আক্রমণ তিন ফলকে চীনাদের বিরুদ্ধে দেখা দেয়। সিত্তাং নদীর ধারে বেশ যুদ্ধ বাধে, কিন্তু সেই বাধাও গেল। জাপানীরা টোঙ্গুতে আসিয়া পৌছিয়াছিল (২৯শে মার্চ)। দশ দিন পর্যন্ত চীনারা টোঙ্গু রক্ষা করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিয়া পূর্বে ও উত্তরে সরিতে লাগিল। তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না রেঙ্গুন বন্দরের অভাবে ব্রহ্মে আর রসদ বা সৈন্য আমদানীর পথও তাহাদের

নাই। ইরাবতীর তীরে তেলের খনিগুলি রক্ষার চেষ্টা চলিল। শেষে তাহা নষ্ট করিয়া আরও পিছু হটিতে হইল—একবার লাসো হইতে চীনারা আসিয়া য়িনাংগয়াংগ প্রতি-আক্রমণ (১লা এপ্রিল) করিয়া হস্তগত করে—জেনারেল আলেকজেণ্ডারের সাত হাজার ব্রিটিশ বাহিনী পিছনে হটিবার অবসর পায়। ইহার পরে শান সীমান্ত হইতে সিপ দিয়া লাসো-মান্দালয়ের দিকে জাপানীরা উপস্থিত হয়, মান্দালয় মায়মো হস্তগত করে, আকিয়াব, ভামো মিচকিনা অধিকার করে; ব্রিটিশ সৈন্য মণিপুরের পথে ভারতে ফিরিতে থাকে। অন্য দিকে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মপথে য়ুন্নানের দিকে ধাবিত হয়—চীনা বাহিনীর এক বৃহদংশ ইহাদের পিছনে বিদেশে পড়িয়া ক্রমশ বিনষ্ট হইল। বর্মীরা ইহাদের যদি আত্মীয় হিসাবে গ্রহণ করিত তাহা হইলে চীনারা গেরিলা যোদ্ধারূপে টিকিয়া থাকিতে পারিত। বিশাল ব্রহ্মদেশ দুই বা আড়াই মাসে বিজিত হইল।

(৮) **ফিলিপাইন**—শুধু ফিলিপাইনেই জাপানী বিজয় এক সুদৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখে ঠেকিয়া গিয়াছিল। প্রথম নৌ ও বিমান আক্রমণে (৭ই ডিসেম্বর) সেখানকার বাসিন্দারা জাপানী আক্রমণকারীদের সহায়তা করে। পার্ল হারবারের পরে বুঝা গেল ফিলিপাইনের ভাগ্য মন্দ; শুধু মন্দ ভাগ্যকে যতদিন সম্ভব ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে (delaying action); তবু ফিলিপাইনের মার্কিন বিমানের আক্রমণে জাপানী ব্যাট্‌লশিপ 'হারুনা' প্রথম সপ্তাহেই ডুবিল। ম্যানিলা জাপানীরা সহজেই পাইল, মিন্দানোতে

অবতরণ করিল, কিন্তু জেনারেল ম্যাক আর্থার দুর্জয় পার্বত্য দুর্গে অপরাজিত রহিলেন অনেক দিন—ফিলিপাইনের অধিবাসীরা বাধা দিল বরাবর। শেষ পর্যন্ত করেজ্জিও বাটনের পতন হইল। তখন ২০ হাজার মার্কিন সেনানী ও মূল্যবান্ যুদ্ধাস্ত্র জাপানের হাতে পড়িল বটে, কিন্তু সেনাপতি ম্যাক আর্থার বিমানে অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন, সেখানকার যুদ্ধের ভার লইয়াছেন। আর মোটামুটি জাপানী সংগ্রামশক্তির একটা পরিমাণ তিনি করিয়া ফেলিয়াছেন।

মে মাসের শেষাশেষি জাপানের এই আক্রমণ-পর্ব শেষ হয়। জাপান যাহা চাহিয়াছিল প্রায় সম্পূর্ণ হস্তগত করে—পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ধানের দেশ, পৃথিবীর পনের আনা রবার, তাহা ছাড়া তেল, টিন, চা, কফি, মসলা, সোনা, তামা—আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সকল সামরিক ঘাটি। ইহার উপর এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিস্কায়ও সে ঘাটি করিয়া বন্ধ করিল ভবিষ্যতের আমেরিকা ও রুশিয়ার মিলন পথ—এবং পাহারা বসাইল ডাচ হারবারের উপর। কিন্তু জাপান পাইল না কি? অষ্ট্রেলিয়া ও তন্নিকটস্থ নিউগিনিয়ার পোর্ট মোর্সবি বন্দর; এদিকে সিংহল। ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার পথ মুক্ত রহিল, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ভারতের মধ্যবর্তী পথও মুক্ত রহিল।

দ্বিতীয় পর্ব

এই সব যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তে সৈন্য ও সমরোপকরণ আনিবার মত সময় ও সুযোগ এবার ব্রিটেন ও আমেরিকা পাইল। যুদ্ধের তখন এই দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়—সামলানোর পালা, সমরোদ্যোগ, অধিকারের পর্ব। ইহারই প্রথম সূচনা হয় ১৮ই এপ্রিল মার্কিনের নূতন উদ্যোগে—তাহাদের বিমান বহরের টোকিও, ওসাকার উপর বোমার আক্রমণে। জাপানের মাথায় টনক নড়িল, মধ্যচীনের কিয়াংসি ও চেকিয়াং প্রদেশের মার্কিন বিমানের সমস্ত আড্ডা শেষ করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তিন কলামে তাহারা কিন্‌হোয়া জংশনের দিকে গেল (২৮শে মে); সাঁড়াশী গতিতে চেকিয়াং ও কিয়াংসির চীন সৈন্যদের পিষিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে অগ্রসর হইল; কোয়াণ্টুং হইতে উপকূলের সমস্ত চীনা পথ বন্ধ করিল, আবার য়ুন্নানেও চাপ দিল। কিন্তু জুনের শেষ হইতে এই তীব্র চীন-অভিযানও আবার মন্থর হইল—সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর) চেকিয়াংএও তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছে।

এদিকে এই দ্বিতীয় পর্বে ক্রমশই শক্তির একটা নূতন পরিচয় মিলিতেছে। প্রথম আসিল প্রবালদ্বীপের নিকটে জাপান ও মার্কিন নৌ-যুদ্ধ (১০ই মার্চ)। জাপান ইহাতে প্রথম ঘা খাইল। এই সমুদ্রের যুদ্ধের গুরুত্বও, কারণ অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া আর আমেরিকার অব্যাহত গতায়াত পথের জন্য। তারপর মিডওয়ে দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ

করিতে গিয়া জাপান আরও কঠিন আঘাত খাইল। মার্কিন মহল দাবি করিল এই দুই যুদ্ধের ফলে যেখানে আর নিকট-তীরে জাপানী বিমানের ঘাটি নাই সেখানে জাপানী নৌবহরের আধিপত্য শেষ হইয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিয়াছে।* ইহার পরে সত্যই মার্কিন-শক্তি এদিককার যুদ্ধের উদ্যোগ জাপানের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে গেল। এই

---

* ১২ই জুন ওয়াশিংটন হইতেই এই দুই যুদ্ধের হিসাব বাহির হয়, সঙ্গে সঙ্গে জাপানের তখন পর্যন্ত সমস্ত ক্ষতির পরিমাণ বলা হয়। তাহা এইরূপ— ব্যাট্‌ল্‌শিপ ঘায়েল—৪খানা; বিমানবাহী জাহাজ ৪খানা ডুবিয়াছে, আরও ২ খানাও সম্ভবত ডুবিয়াছে, ৪খানা ঘায়েল হইয়াছে; ক্রুজার ১১খানা ডুবিয়াছে, ৪খানা সম্ভবত ডুবিয়াছে; ১খানা ডুবিয়াছে বলিয়া মনে হয়, ১৯খানা ঘায়েল হইয়াছে; মোট নানাজাতীয় ১১০খানা যুদ্ধ-জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে আর বে-সামরিক (Non-combatant ship) ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে আরও ১২২খানা।

ইহার পরে অক্টোবরে জাপান গুয়াদালকানার দখল করিবার জন্য বহু সৈন্য ও নৌবল লইয়া অগ্রসর হয়। জাপান সৈন্যও নামায়, কিন্তু গুয়াদালকানার জয় করিতে পারে নাই—সলোমনের নৌযুদ্ধে বোধ হয় সেবার আমেরিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সে যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

১৭ই নবেম্বরের ওয়াশিংটনের খবরে দেখা গেল—নবেম্বরের ১৩-১৫ই পুনরায় নৌযুদ্ধে জাপানে নির্জিত হইয়াছে—ডুবিয়াছে ১খানা ব্যাট্‌ল্‌শিপ, [illegible]খানা ভারী ও ২খানা হাল্কা ক্রুজার, ৫খানা ডেষ্ট্রয়র, ১২খানা মালবাহী জা[illegible], আর ঘায়েল হইয়াছে ১খানা ব্যাট্‌ল্‌শিপ, ৬খানা ডেষ্ট্রয়র। আমেরিকার নষ্ট হইয়াছে ২খানা হাল্কা ক্রুজার, ৫খানা ডেষ্ট্রয়র। হয়তো সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংঘর্ষ হইয়াছে এই তিন দিনের যুদ্ধে।

যুদ্ধ চলিতেছে নিউ গিনিয়ার পোর্ট মোর্সবি লইয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে সলোমন দ্বীপে। সেখানে গুয়াদালকানারে মার্কিন নৌবহর মার্কিন সৈন্যদের নামাইয়া দিয়াছে। ওদিকে পোর্ট মোর্সবি হইতে জাপানী অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া ওয়েন ষ্টান্‌লি পর্বতের উপর দিয়া অষ্ট্রেলিয়ার সেনানী জাপানী ঘাটি বুনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সলোমন দ্বীপের সন্নিকটে এই অষ্ট্রেলিয়া-আমেরিকার মিলিত যুদ্ধে পশ্চিম-দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের ও পূর্ব এশিয়ার ভাগ্য নির্ণীত হইবে। এই যুদ্ধ প্রধানত হইবে নৌবল ও বিমান বলের যুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। ত্রিনকোমালি ও মাডাগাস্কার ব্রিটিশ হস্তে থাকায় জাপানীরা আর সহজে সমুদ্রপথে ভারত অবরোধ করিতে পারিবে না। স্থলে ও আকাশে প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পারে ব্রহ্ম ভারত সীমান্তে ;—অবশ্য রেঙ্গুন, আন্দামান ও সিংগাপুরস্থ জাপানী নৌবল তাহাতে জাপানের সহায়ক হইবে। এই সীমান্তে মিত্রপক্ষের চেষ্টা হইবে চীনের পথ পুনর্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তিকে সংগঠন করা, আর জাপানের উদ্দেশ্য—ভারতের স্থলপথে ও জলপথে পশ্চিমে পৌছিয়া ইউরোপীয় চক্রশক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন।

জলপথে অবশ্য এই সংযোগের সম্ভাবনা এই দ্বিতীয় পর্বে দূরতর হইয়াছে। সিংগাপুরের পরে ভারত মহাসাগরে জাপানের প্রবেশের পক্ষে বাধা ছিল না। রেঙ্গুনে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইল, আকিয়াবে তাহাদের বিমান ঘাটি হইল, আন্দামানে তাহারা ঘাটি করিয়া বসিল ;—ত্রিন্‌কোমালি ও কলম্বোর পথে তাহারা

একেবারে মাডাগাস্কারে পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু ত্রিন্‌কোমালির দিকে প্রথম অভিযানে ব্রিটিশ নৌবলের ও বিমানবলের বাধা দুস্তর হইল কি না কে জানে,—ব্রিটিশ ক্রুজার ও বিমানবাহী জাহাজ ও বিমান বিনষ্ট হইল অনেক—জাপান কিন্তু আর সেদিকে অগ্রসর হইল না। ব্রিটেনই ৮ই মে মাডাগাস্কারের নৌঘাটি দিগো-স্যুয়ারেজ (Diegosuarez) অধিকার করিয়া বসিল। জাপানী ডুবোজাহাজ সেখানেও ছুটিল বটে, সম্ভবত ব্রিটিশ নৌতরীর একখানা ব্যাট্‌ল্‌শিপের ক্ষতিও করিল, কিন্তু সেপ্টেম্বরে সমস্ত মাডাগাস্কার অধিকার করিয়া ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে—সিংহল হইতে আফ্রিকার তীর পর্যন্ত—ব্রিটেন নিজের আধিপত্য দৃঢ় করিয়া ফেলিল। অথচ চক্রশক্তির মহাসমাবেশের পক্ষে ইরানের উপকূলে বা এডেনের উপকূলে জাপানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু স্থলপথে চক্রশক্তির এই সংযোগ-সাধন এখনো অসম্ভব নয়—জাপান যেমন আজ জলে স্থলে বাংলার সীমায়, নৌবলের জোরে মাদ্রাজ উপকূলে কর্তা, জার্মানিও তেমনি আজ ককেশাসের দুয়ার ভাঙিতে উদ্যত।

পৃথিবীর যুদ্ধে ভারতবর্ষ পূর্বার্ধে ও পশ্চিমার্ধের মাঝখানে এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা।

সামরিক বৈশিষ্ট্য

পূর্বার্ধের এই জাপানী সংঘর্ষের দুই পর্বে যে সামরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইল এইবার তাহা সংক্ষেপে মনে রাখা দরকার। প্রথমত দেখিতেছি—জাপানের দিক হইতে দেখা গেল চমকপ্রদ কৃতিত্ব। জাপানী সামুরাই ও সাধারণ-অসাধারণ সমস্ত সৈনিকের মরণ-পণের কথা নূতন করিয়া না উল্লেখ করিলেও চলে। একই সময়ে দূরে দূরে এমন সুনিয়ন্ত্রিত এতগুলি অভিযান চালানো, এমন জলে স্থলে আকাশে বল-সংযোজন (co-ordination), যে কোনো শক্তির পক্ষে গর্বের কথা। এ যুগের যুদ্ধের দ্বিতীয় এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই পূর্বার্ধেও দেখা গেল—প্রথমত, সেই 'আভ্যন্তরীণ আক্রমণ-পদ্ধতি' বা 'Attack in Depth' (পৃ. ১৪৪), অর্থাৎ দেখা গেল ফিলিপাইনে, হাওয়াইতে, জাভায়, মালয়ে এমন কি তা'ইদেশে ও ব্রহ্মে পর্যন্ত জাপানী প্রবাসী নরনারীর তৎপরতা ও তত্তৎ দেশীয় 'পঞ্চম বাহিনী'র কার্যকারিতা। তৃতীয়ত, জাপানী যন্ত্রসজ্জা। ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল নৌযুদ্ধে, জাপানী ডুবোজাহাজ ও নৌ-বাহিত বিমানের উৎকর্ষে, ইহারই দৃষ্টান্ত মিলে সিংগাপুর ও হংকংএ, সর্বশেষে ফিলিপাইনে বাটানের দুর্গ ধ্বংসে। পূর্বার্ধের এই যুদ্ধে অবশ্য নৌ-শক্তিরই প্রধান কার্যকারিতা দেখিবার কথা। সেই হিসাবে জাপান যাহা দেখাইল তাহা আর কেহ দেখাইতে পারে নাই—আমরা ইহাকে বলিতে পারি—naval blitzkrieg বা নৌ-বলের বিদ্যুদাক্রমণ—

মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌ-শক্তি যাহাতে প্রথম হইতেই অসহায় হইয়া পড়িল। এই দিকে জাপান স্থলঘাটির (shore based) বিমানের যে অসম্ভব সার্থকতা দেখাইল তাহাতে নাভিকের ভরসা মিথ্যা হইয়া গেল—আজ তাহাই জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেন প্রমাণ করিতেছে। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য স্থলযুদ্ধে এবং স্থলে জাপানী বিমানের প্রয়োগে, তাহা এই যে, সত্যসত্যই এখানে টোটেল যুদ্ধের বিশাল সেনাবলের (mass army) প্রয়োগ হয় নাই,—তাহার উপযোগী ক্ষেত্রও ছিল না—একমাত্র জাভায় ব্রহ্মে খানিকটা বড় যুদ্ধের (pitched battle-এর) অবকাশ ছিল, কিন্তু সেখানেও তেমন যান্ত্রিক বাহিনীর ব্যূহভেদ (break-through), পার্শ্ববেষ্টন (envelopment) প্রভৃতির প্রয়োজন হয় নাই—ব্রহ্মে চীনাবাহিনীকে পরিবেষ্টন, চিন্দোয়িনে ব্রিটিশ বাহিনীকে পার্শ্বাক্রমণ করা তেমন নূতন সমাবেশ বা রণকৌশলের প্রমাণ নয়। *স্থলপথে জাপান যে পদ্ধতির সার্থকতা দেখাইল, তাহা* 'অনুপ্রবেশ পদ্ধতির' বা 'infiltration'-কৌশলের। *এ কৌশল নূতন নয় (দ্রষ্টব্য New Ways of War,* Wintringham), *ইহার উপাদান ছিল জাপানী সৈনিকদলের এই জঙ্গল ও জলাভূমির যুদ্ধে অদ্ভুত* শিক্ষা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের উদ্যোগ (initiative), আত্মচালনার নৈপুণ্য, শত্রু-ছলনার (feint) ও শত্রু-শিবিরের পার্শ্বে (flank) অনুপ্রবেশের ও পশ্চাতে (rear) সক্রিয়তার সার্থক রীতি। কিন্তু এই রীতির সার্থকতারও মূল কি? প্রথমত, জাপানী সৈন্য লটবহর ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র পরিহার করিয়া গেঞ্জি গায়ে রবারের

জুতা পায়ে টমি গান আর বেতার যন্ত্র লইয়া ছোট ছোট দলে নানা দিকে ঢুকিয়া পড়ে—গতিই (mobility) হয় প্রধান কথা, যন্ত্রবল (armour) এই ক্ষেত্রে হয় গৌণ (জঙ্গলের যুদ্ধে ও অনুপ্রবেশে ইহাই প্রয়োজন)। দ্বিতীয়ত, এই কারণেই তাহারা রসদের কথাও ভাবে নাই—অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের ঘরে 'দু মুঠো ভাত' সংগ্রহ করিয়া আবার অগ্রসর হইয়াছে—এইখানেই এশিয়ার যোদ্ধা হিসাবে এশিয়ার যুদ্ধে জাপানী সৈনিকের জন্মগত সুবিধা রহিয়াছে—ব্রিটিশ বা জার্মান কোনো পাশ্চাত্য বাহিনীই এই সুবিধা পূর্ব-এশিয়ায় লাভ করিতে পারিত না। ইহাই তৃতীয় ও প্রধান কারণ—প্রায় কোনো দেশেই অধিবাসীদের নিকট জাপানীরা পর বা শত্রু বলিয়া গণ্য হয় নাই। তাই তাহাদের এই দিকে এত সুবিধা হইল। জাপানী 'পঞ্চম বাহিনী' ছাড়াও দেশের সাধারণ লোক জাপানীদের ভাত দিয়াছে, পথ দেখাইয়া দিয়াছে—বিরোধিতা করে নাই। অর্থাৎ জাপানী টোটেল যুদ্ধ এই সব দেশে 'সার্বজনীন যুদ্ধের' সম্মুখীন হয় নাই—যেখানে তেমন জনপ্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানেই জাপানী যুদ্ধপদ্ধতি আর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই—ইহার প্রমাণ কতকটা ফিলিপাইনে আর চীনে দেখা গিয়াছে।

এ, বি, সি, ডি, পক্ষের দিক হইতেও এই পূর্বার্ধের যুদ্ধের কথা বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রথমত তাঁহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সম্পূর্ণ ও সার্থক যুদ্ধসজ্জা হয়তো এই পূর্বার্ধে তখনো তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল; কিন্তু একেবারে প্রথম আক্রমণেই

বেচাল হইবার মত যুক্তিযুক্ত কারণই বা তাহাদের কি ছিল? সত্য বটে ৭ইয়ের জাপানী আক্রমণ আকস্মিক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ—তখনো জাপানী প্রতিনিধি কুরুশু ওয়াশিংটনে মিটমাটের কথা চালাইতেছিলেন;—ইহাই এ, বি, সি, ডি, পক্ষের দ্বিতীয় ওজুহাত, আর ইহা খুবই সত্য। কিন্তু এ যুগের যুদ্ধে চক্রশক্তি, বিশেষত জাপান, অন্য যুদ্ধোপায় অবলম্বন করিবে ইহা ভাবিয়া থাকিলে মিত্রশক্তিদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। এই দ্বিতীয় কারণ মানিলেও পাল হারবারের নৌ-কর্তাদের অকর্মণ্যতার, বা হতভাগ্য এডমিরাল টম ফিলিপ্‌সের দুঃসাহসিক হঠকারিতার সমর্থন করিবে কে? চতুর্থত, ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদ-সংগ্রাহক সামরিক কর্তাদের (intelligence service) চরম অকর্মণ্যতাকে ক্ষালন করিবে? জাপানী জল-স্থল-বিমান বাহিনীর এত বড় সন্নিবেশ (concentration) ও অভিযান (movement) তাহারা জানিতেই পারে নাই; জাপানের বিমান-বলের যোগ্যতার সম্বন্ধে উল্টা ধারণাই তাহারা পোষণ করিয়াছে; জাপানী নৌ-বলের খাঁটি খবরও পায় নাই; এবং জাপানী স্থলসেনাদের জলায় জঙ্গলে যুদ্ধ-দক্ষতার কথা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই। পঞ্চমত, অনারেবল ডাফ কুপার ও সিংগাপুরে ব্রুক-পপ্‌হাম প্রভৃতি ও আমেরিকায় কর্ণেল নক্‌স যে বহ্বাড়ম্বর করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা নিজ পক্ষীয়দেরই প্রতারণা করিতে পারিয়াছিলেন, শত্রুদের কিছুমাত্র প্রতারণা করিতে পারেন নাই। ষষ্ঠত, সসৈন্য সিংগাপুরের পতন (শেষ অবস্থায় অনিবার্য হইলেও)

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীদের চরম গ্লানির কথা। মালয়, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশেও এই সাম্রাজ্যবাদী বে-সামরিক শাসকবর্গের যে সব গুণ প্রকাশ পাইল তাহা আর কেহ বিস্মৃত হইবে না। সপ্তমত, জাভা, মালয়, ব্রহ্মের মত জনবহুল দেশে ইহাদের কোনো রূপ জনবিরোধ সৃষ্টি করিবার অক্ষমতা,—এমন কি সেদিকে ঔদাসীন্য,—ও সামরিক সাধারণ সাম্রাজ্যবাদীদের মূলগত বিকৃত বুদ্ধির নিদর্শন,—এ যুগের যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতার পরিচায়ক।

এক কথায়—পূর্বার্ধের যুদ্ধে মিত্রশক্তি না করিয়াছিলেন এ যুগের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় যন্ত্রসজ্জা ও শিল্পসজ্জা, না উহার প্রয়োজনীয় জনসজ্জা। সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে জনসজ্জা করা সহজ নয়, কারণ শিল্পসজ্জা ও জনসজ্জা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-বিরোধী। তাই সাম্রাজ্যবাদীর রণসজ্জাও হয় অসম্পূর্ণ। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বেও আজ ব্রিটেন অর্ধ-প্রস্তুত হইতেছে আমেরিকার অস্ত্রবলে, পূর্বার্ধের জনসজ্জায় নয়, এশিয়ার শিল্পসজ্জায়ও নয়।

এখানকার কথা

যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে আমরা পৌঁছিয়াছি। এই চার বৎসরে পৃথিবীর মানচিত্রই শুধু বদলায় নাই, পৃথিবীর মনশ্চিত্রও বদলাইয়াছে। সিংগাপুর, রেঙ্গুন, তব্রুকের পরে কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর আস্থা রাখিবে? 'ব্রিটেনের যুদ্ধের' পরেই বা কে ব্রিটিশ জনশক্তিকে অশ্রদ্ধা করিবে? লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ষ্টালিনগ্রাদের পরে কে অবজ্ঞা করিবে সোভিয়েট-জনরাষ্ট্রকে? ফ্রান্স, গ্রীস, ব্রহ্ম, মালয়ের কথা স্মরণ করিয়া মানুষ স্যাণ্ডাহার্ষ্ট-উলুইচের দিকে তাকাইয়া থাকিবে? না, তাকাইবে মজুর-কিসানের বংশধর লালফৌজের নায়কদেব দিকে—টিমোশেংকো, ভোরিশিলভ, জুকব, রোড্‌মিট্‌সেভের দিকে? চু তে, মাও, চিয়াংকাইশেকের দিকে? সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শ্রেণীর দম্ভ ও সেনাপত্যের শিক্ষা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ একটা Process

এ যুগের এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি এ যুদ্ধের মধ্য দিয়াও ক্রমশই রূপ গ্রহণ করিতেছে। ক্রমশই মানুষের চেতনায় নূতন সত্য রেখাপাত করিতেছে, কারণ ক্রমশই যুদ্ধও রূপান্তরিত

হইতেছে, তাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার পদ্ধতিও নূতনতর হইতেছে। যুদ্ধের এই পরিবর্ত্তমান প্রকৃতি—তাহার ক্রম-পরিণতি—এই কথাটিই প্রথম স্মরণীয়। স্মরণীয় এই যে ইহাও এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া (historic process)—সচল ঘটনাধারা। এই ঘটনাধারা বিকাশে বা বিলোপে এ যুগের ধনিকবাদের বিকাশ, না জনশক্তির বিকাশ, ঘটিবে, তাহা নির্ভর করে ঐতিহাসিক শক্তি সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর—জনশক্তি নিজ কর্তব্য পালন করিলে যুদ্ধের একরূপ পরিণতি হইবে, না করিলে হইবে অন্যরূপ। ইতিহাস তাহাদের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—যুদ্ধের আঙিনায় নিজের স্থান করিতে হইবে নিজ শক্তিতে।

যুদ্ধ এইরূপ বেগবান ঘটনা-স্রোত বলিয়াই তাহার পদ্ধতিও নূতনতর হইয়া উঠিতেছে। *এই তিন বৎসর তাহার যে মূল-পদ্ধতি স্থির হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট :—(১) এ যুগের যুদ্ধ সর্বব্যাপী —ইহার যোদ্ধাও সকলে, যুদ্ধক্ষেত্রও সর্বত্র,—গৃহে-প্রান্তরে, কারখানায় ; আবার জলে-স্থলে, আকাশে। যুদ্ধ করে জনসমাজ—বিকৃত আদর্শেই হোক বা সচেতন প্রেরণায়ই হোক ; আর প্রধান সমরশক্তি এই গণশক্তি*—শুধু professional soldier-রাই যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষম নরনারী দেশের অভ্যন্তরে militiaরূপে—শ্রমিক শ্রমক্ষেত্রে, কৃষক কৃষিক্ষেত্রে। (২) দ্বিতীয়ত, এ যুগের যুদ্ধ—যন্ত্র-যুদ্ধ, (War of Material) কারণ, এ যুগই যন্ত্র-যুগ। যন্ত্রের উন্নয়ন ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে

তাই যুদ্ধের পদ্ধতি, সমাবেশ, রণকৌশল, সবই এই তিন বৎসরে পরিবর্তিত হইয়াছে।

মনে রাখা উচিত, এই দুই উপকরণের একটিকে বাদ দিলেও চলে না, কোনটিই খাটো নয়। তবে একটার অভাব কতকাংশে অন্যটার দ্বারা পূরণ করা চলে; কিন্তু ইহারও সীমা আছে। আবার কোনো বলে শত্রুর তুলনায় (Quantity) খাটো হইলে কতকাংশে বিশেষ বলে বা অস্ত্রে গুণের উৎকর্ষ (Quality) দ্বারা তাহা পূরণ করা চলে, কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে।

এই দুই মূল কথা মনে রাখিয়া লক্ষ্য করিতে পারি যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে আজ যে-যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে : (১) যুদ্ধ এখন শত্রুক্ষয়ের যুদ্ধ, War of Attrition. অর্থাৎ ফ্যাশিস্ত কল্পিত War of Quick Decisions ব্যর্থ হইয়াছে, এমন কি যুদ্ধ শেষ করিবার শক্তিও হিটলারের আর নাই। তাই *Frankfurt Zeitueng* নূতন সুর তুলিতেছে—'ইউরোপে যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়া থাকিলেই তো আমাদের জয় হইল। (২) এ যুগের যুদ্ধ 'সচল যুদ্ধ' war of movements, স্থাণু যুদ্ধ বা static যুদ্ধ নয়। (৩) কিন্তু ব্লিৎস্‌ক্রীগের পদ্ধতিতে আর চরম ফল লাভের আশা কম; কি নৌযুদ্ধে, কি আকাশযুদ্ধে, কি স্থলযুদ্ধে—ব্লিৎস এখন বিদ্যুৎ হারাইয়াছে; (৪) 'Attack in Depth'—আভ্যন্তরীণ আক্রমণ এ যুদ্ধের একটা বড় কৌশল—'সার্বজনীন যুদ্ধ', বিশেষ করিয়া জন-প্রতিরোধ বা Defence in Depth তেমনি ইহার পাল্টা উত্তর। (৫) যুদ্ধ আজ বিশাল

বাহিনীর (mass army) যুদ্ধ বটে, কিন্তু যন্ত্রযুদ্ধ দিনে দিনে হইয়াছে কারিগরের যুদ্ধ, ইঞ্জিনিয়ারের যুদ্ধ, টেক্‌নিশিয়ানের যুদ্ধ। (৬) ঠিক এই কারণেই অর্থাৎ war of material বলিয়াই এই যুদ্ধ বিশেষ করিয়া যন্ত্রোৎপাদক শ্রমিকের যুদ্ধ; খাদ্যোৎপাদক কৃষকের যুদ্ধ—শুধু সামরিক বিশেষজ্ঞের যুদ্ধ নয়, শুধু শাসক-শ্রেণী ও যন্ত্রসৈনিকের নৈতিক শক্তিই যথেষ্ট নয়; অন্তত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে নৈতিক প্রেরণা সার্বজনীন হওয়া চাই, সুদৃঢ় সামাজিক চেতনা ও সার্বজনীন আদর্শের উপর তাহার বনিয়াদ গড়া দরকার। (৭) শিক্ষাপ্রণালী বা training-এও নূতনত্ব সূচিত হইতেছে: যন্ত্রযুদ্ধের দায়ে এই যুদ্ধে যেমন সৈন্যদের শিক্ষাপ্রণালীও 'যান্ত্রিক' হইয়া উঠিয়াছে, চলা-ফেরা, নিয়ম-বাধা যন্ত্রবৎ (mechanical) হইয়া উঠিতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার এ যুদ্ধে সৈন্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ (initiative), বুদ্ধি (intelligence) ও নৈতিক গুণের (morale) মর্যাদা পদে পদে স্বীকৃত হইতেছে—জাপানী অনুপ্রবেশ (infiltration) কৌশলে, ব্রিটিশ Commando বা উপকূলে আকস্মিক হানায়, সোভিয়েট গেরিলা কৌশলে ইহারই প্রমাণ মিলে। এই দিক হইতে ব্রিটিশ যুদ্ধ-পদ্ধতির ও যুদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতির, পুরানো দিনের ড্রিল প্যারেডের প্যাটার্ন বোনা যেন 'দ্বাদশবর্ষ ব্যাকরণ পড়ার' মত হাস্যকর হইয়া গিয়াছে। *এখন হইতে সামরিক শিক্ষা-প্রণালীর দুই বিরোধী সূত্রের সমন্বয় করিতে হইবে। সোভিয়েট শিল্প সংগঠনের দৃষ্টান্তানুযায়ী এই সমন্বয়কে বলিতে পারি*

collectivist co-ordination ও Stakhanovist Group Initiative, অর্থাৎ সংযোজন ও স্বয়ংযোজনের সমন্বয়।

(৬) যুদ্ধাস্ত্রের ও বল প্রয়োগের দিক হইতেও এ যুদ্ধে যাহা পরিষ্কার তাহা এই যে—অস্ত্রের সংযোজনেই (co-ordination) প্রত্যেক অস্ত্রের যথার্থ কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়—স্বতন্ত্র প্রয়োগে তাহা লাভ করা যায় না। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে প্রত্যেক অস্ত্রই অন্য অস্ত্রের তুলনায় বেশি কার্যকরী। ব্লিৎস্ক্রীগে অস্ত্র-বাহুল্য যেমন সর্বমান্য, মালয়ের অনুপ্রবেশ-কৌশলে হাল্কা টমি গানের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি আশ্চর্যজনক। (১) এই কথা মনে রাখিয়াই বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের যেরূপ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা এখন দেখা যাইতেছে তাহা বলা যাইতে পারে: (ক) বিমানাস্ত্রের স্বতন্ত্র শক্তি চরম—দুহের এই কথা ঠিক নয়। কিন্তু যে-কোনো বলের পক্ষে জলে স্থলে আকাশে বিমানাস্ত্রের পরিমাণগত বা গুণগত অভাবে বা আধিক্যে যুদ্ধশক্তির তারতম্য ঘটে, তাহাও সত্য। ফলে, স্থলে বিমানঘাটী ও জলে বিমানবাহী যুদ্ধ-জাহাজও ক্রমশই এ যুগের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বলকেন্দ্র হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যেও আবার রণতরীর বিরুদ্ধে স্থলঘাটির (land based) বিমানের কার্যক্ষমতা এ মুহূর্তে প্রমাণিত হইয়াছে প্রায় সর্বত্র। (খ) স্থলযুদ্ধে ট্যাংকের দুর্জেয়তা এখন সর্ববাদীসম্মত; কিন্তু ট্যাংকের অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনতাও শহরের যুদ্ধে ও জনযুদ্ধে স্মরণীয়। ট্যাংক কোরের দুর্ধর্ষতা এখন আর তেমন বিভীষিকা নয়। (দ্রষ্টব্য—'Swing from Panzer'

Nirad C. Chaudhuri, *Bengal Weekly*, Aug. 3, 1942).
(গ) আর্টিলারির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সোভিয়েটের নূতন কীর্তি। (ঘ) অশ্বারোহীর পুনরাবির্ভাবও তাহার কৃতিত্ব—কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষেই ও ঋতু-বিশেষেই অশ্বারোহী কার্যকরী, তাহাও উহা হইতেই বুঝা যায়। (১০) বিমানে ও ডুবোজাহাজে নৌবলের কতটা উপযোগিতা কমাইয়াছে তাহা এখনো দ্রষ্টব্য। তবে নৌশক্তির প্রাধান্য যে এখনো শেষ হয় নাই তাহার প্রমাণ ব্রিটেন ও জাপান দুইই দিতেছে (এই যুদ্ধে খাঁটি নৌযুদ্ধের কেন্দ্র হয়তো প্রধানত প্রশান্ত সাগর)। নৌশক্তি হিসাবেই ব্রিটেন মিত্রপক্ষের নেতৃত্ব পুনরধিকার করিতেছে। এখনো তাঁহারা নৌবলে প্রবল; তাই এ্যাংগ্লো-মার্কিন সহযোগিতায় জাপানের সাময়িক সমুদ্র-আধিপত্য চূর্ণ করিলে সমুদ্রে ব্রিটিশ-মার্কিন ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকিবে। এদিকে বিমানবলেও এখন তাঁহারা অগ্রগণ্য। এমন কি, বর্তমান সময়ে তাঁহারা বিমানকে প্রধানতম অস্ত্ররূপে প্রয়োগের এক নূতন নীতিও গ্রহণ করিয়াছে। ইহা যেন ডুহের (Douhet) মতবাদকে ঝাড়িয়া পুছিয়া লওয়া। প্রশান্ত মহাসাগরের জলযুদ্ধে ও মিশরের স্থলযুদ্ধে তাহারা বিমানকে নূতন করিয়া প্রাধান্য দান করিতেছে; এমন কি 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' না খুলিয়া নৌ-ও-বিমানের সংযুক্ত অবরোধ বা ব্লকেড্ দ্বারা এবারও জার্মান শক্তিকে ক্ষয় করা সম্ভব বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে (দ্রষ্টব্য লেখকের 'Air Offensive', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড,' ২৬শে অক্টোবর, ৪২; Desert War, ঐ, ৭ই নবেম্বর,

'৪২ ; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'Swing from Panzer'. *Bengal Weekly*, Aug. 3, 1942)। সম্ভবত নৌ ও বিমানের আয়োজন সুসম্পূর্ণ হইলে তাহারা ট্যাংক ও যন্ত্রবলেও এইরূপ বলীয়ান হইয়া জার্মানির সম্মুখীন হইতে চান, গ্র্যাণ্ড টাক্‌টিক্‌সের বলে যুদ্ধ জয় করিতে চান।

কিন্তু মিলিত শক্তির গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি এখনো দুর্নিরীক্ষ্য। প্রশান্ত সাগর ও 'ব্রহ্মপথের' উদ্ধার, ভূমধ্য-মণ্ডলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি, উহার সামরিক প্রোগ্রামে এই মুহূর্তে প্রয়োজন। আর প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় আদর্শকে, নৈতিক প্রেরণাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলা—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভার অধিবাসীদের জাতীয় প্রেরণাকে জ্বলন্ত করিয়া তোলা, মুক্তিযুদ্ধ ও জনযুদ্ধের রূপকে এশিয়ার ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে স্পষ্ট করিয়া তোলা—এ যুদ্ধের মধ্য দিয়া গণতন্ত্রের বিপ্লবী প্রেরণাকে মূর্ত করিয়া তোলা।

বলা বাহুল্য, ইহা সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা চাহিবে, এই নৈতিক শক্তির অভাবকে যন্ত্রশক্তির প্রাচুর্যের দ্বারা পোষাইয়া লইতে, ফ্যাশিস্ত যন্ত্রবলের বিরুদ্ধে মার্কিন-ব্রিটিশ যন্ত্রবলেই জয়ী হইতে। এ যুগের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীর সামরিক দৃষ্টিতে শুধুই যন্ত্রযুদ্ধ ; ষ্ট্যুকা ও 'ডাইব বোম্বার' যদি ইউরোপীয় জাতিদের ও ইউরোপীয় জনশক্তিকে ঠাণ্ডা করিতে পারে, তাহা হইলে মেসিন গান্‌ ও বিমান কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন জনগণকে ঠাণ্ডা রাখিতে পারিবে না?—ইহাই তাহাদের এই গণনা।

ইহাতে দুইটি ভুল আছে। প্রথমত, একমাত্র যন্ত্রযুদ্ধের উপরও যদি আস্থা রাখিতে হয় তাহা হইলে ফ্যাশিস্তদের পথ প্রথমত স্বগৃহে গ্রহণ করিতে হইবে—ব্রিটেনেই ফ্যাশিস্ত পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে, ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে দাবাইয়া দিতে হইবে। তবেই সাম্রাজ্যে চালানো সম্ভব এই 'টোটেল দণ্ডনীতি'। দ্বিতীয় কথা আরও মৌলিক: আসলে এ যুগ শুধু যন্ত্রযুগ নয়, এ যুদ্ধও শুধু যন্ত্রযুদ্ধ নয়—তাহারই প্রমাণ চীনের এই পাঁচ বৎসরের যুদ্ধ, সোভিয়েট-দেশের যুদ্ধ, এমন কি সুপরিচিত 'ব্রিটেনের যুদ্ধ'। চীন ছিল প্রায় নিরস্ত্র, তাহার দেশ ছিল বড় আর জনবহুল। তাই পাঁচ বৎসর তাহার জনশক্তি টিকিয়া আছে। সোভিয়েট দেশও বিশাল ও জনবহুল; আর তাহার যন্ত্রসজ্জাও সামান্য নয়; সমস্ত ইউরোপীয় ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধের মূলশক্তি কোথায়? শুধু কি উক্রেইন্ ডোনেৎসের শিল্প কারখানা? ব্রিটেনের বিমান ছিল সংখ্যায় খন অল্প, লুফ্‌ৎভাফে পরাজিত হইল কাহার হাতে? াজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর হাতে নয়। এ যুদ্ধে সিংগাপুর হ তব্রুক পর্যন্ত প্রতিপদে বরং এই শাসকশ্রেণীর ও ামরিক-নেতৃবৃন্দের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক অকর্মণ্যতাই প্রমাণিত হইয়াছে। যন্ত্রযুদ্ধই প্রমাণ করিয়াছে যুদ্ধ একদিকে যেমন টেক্‌নিশিয়ানের যুদ্ধ, কারিগরের যুদ্ধ, অন্যদিকে উহা দেশের শত সহস্র সৈনিকের যুদ্ধ (Mass Army), বিশেষ করিয়া বিরাট উৎপাদন-পদ্ধতির (Mass Production) যুদ্ধ। শিল্পে সামাজিক সেই সংহতি চাই;

তাই যন্ত্রযুদ্ধও শিল্পোৎপাদক জনশক্তির যুদ্ধ না হইয়াই পারে না। 'গোষ্ঠীর যুদ্ধ' 'যোদ্ধশ্রেণীর যুদ্ধ,' 'সামন্ত-নেতৃত্বের যুদ্ধ,' 'বৃত্তিধারী পদাতিকের যুদ্ধ,' 'রাজার যুদ্ধ,' 'রাষ্ট্রের যুদ্ধ,'—এইরূপে যেমন এক-একটা যুগের সঙ্গে সেই সেই যুগের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, তেমনি এ যুগের যুদ্ধে ধনিকতন্ত্রের—শাসকশ্রেণীর ও সামরিকশ্রেণীর—যুদ্ধও শেষ হইতেছে, আসিয়াছে যুগ-বিপ্লব। সেই যুগ-বিপ্লবে একদিকের শক্তি ফ্যাশিজ্‌ম্, অন্যদিকে জনশক্তির; উহাদের দ্বন্দ্বে একদিকে আছে ফ্যাশিস্ত যুদ্ধপদ্ধতি, যন্ত্রসজ্জা ও মানুষের যান্ত্রিকতা-সাধন; অন্যদিকে সার্বজনীন যুদ্ধপদ্ধতি—যন্ত্র-সহায়ে মানবশক্তির চিরপ্রসার।

ইহাই এ যুগের যুদ্ধের মূল সত্য। যে পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় তাহা অস্বীকার করিবে সেই পরিমাণে হইবে ফ্যাশিস্তদেরই সফলতা, জনশক্তি হইবে ব্যাহত—সেই পরিমাণে ইতিহাসের ইঙ্গিত হইবে নিষ্ফল, সেই পরিমাণে তাই এ যুগের যুদ্ধের সেই সত্যকে স্বীকার করা হইবে পৃথিবীর জনশক্তির দায়িত্ব, ঔপনিবেশিক দেশের জনশক্তির দায়িত্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনশক্তিরও দায়িত্ব।

ইহাই এ যুগের যুদ্ধের দাবী।

ভারতবাসীর দায়

পৃথিবীর যুদ্ধ আজ দুই দিক হইতে ভারতবর্ষের দিকে আসিয়াছে। ভারতবর্ষ এ যুগের যুদ্ধের হয়তো বা প্রধান রণক্ষেত্রে

পরিণত হইতে পারে, এমন কি উহার চরম রণক্ষেত্রেও পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। এ যুগে পৃথিবীতে ও এই দেশে জন্মিয়া আমাদের দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হইবার উপায় নাই। অবশ্য এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্য-নির্দেশ, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিক্ষেত্র নির্ধারণ প্রয়োজন।—কারণ সামরিক লক্ষ্য নির্ধারিত হইবে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের অনুরূপে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৫) কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিকৃত শাসনে অস্বাভাবিক ভাবে আমাদের দৃষ্টি-বিকৃতি ঘটিবে ইহাও খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া এই মুহূর্তে তাহাই প্রায় আমাদের বিধিলিপি হইয়া পড়িতেছে। কারণ পৃথিবীর যুদ্ধেও পৃথিবীর এই পূর্বার্ধে—ঔপনিবেশিক জগতে—সাম্রাজ্যবাদীরা এ যুগের যুদ্ধের 'আধখানা সত্য' লইয়া আপন স্বার্থ বাঁচাইতে চায়—শুধু যন্ত্রসজ্জায় ও সৈন্যসজ্জায় চায় নিজেদের সর্বনাশ ঠেকাইতে,—পৃথিবীর সর্বনাশ ঠেকাইতে চায় না, মানুষের সর্বনাশ ঠেকাইতে চায় না,—অর্ধ-ত্যাগ দ্বারাও আত্মরক্ষা করিতে চায় না, চায় শুধু স্বার্থরক্ষা করিতে। ইহার প্রতিক্রিয়ায় আমাদেরও তাই আত্মনাশের বুদ্ধিতেই পাইয়া বসিতে পারে—আত্মমুক্তির বুদ্ধিকে আমরা অবহেলা করিতে পারি। এই রাষ্ট্রীয় তথ্য আমার এখানে আলোচ্য নয়। আমি ধরিয়াই লইয়াছি—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অন্তত তাহার রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি হারায় নাই। সগৌরবে স্মরণ করিতে পারি—পৃথিবীর 'বিচক্ষণ' জাতিরা কত অন্ধতার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস মোটামুটি তাহার দৃষ্টি-শক্তি খোয়ায় নাই। সংক্ষেপে তাহার প্রমাণ এই যে—কংগ্রেস

(১) আদি-অন্ত ফ্যাশিস্ত শক্তিদের বিরোধী, চক্রশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কংগ্রেস ভুল করে নাই। (২) চক্রশক্তি বিজয়ী হইলে—যে-পৃথিবীতে সোভিয়েট-শক্তি নির্জিত, মহাচীন পদানত—সেখানে ভারতবর্ষেরও এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধীনতার স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে। (৩) এই পৃথিবীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্থান চীনের পার্শ্বে, সোভিয়েটের পার্শ্বে, জনশক্তির সঙ্গে। (৪) এ যুগের যুদ্ধে ভারতবর্ষের সেই জনশক্তির উদ্বোধন না হইলে—জনরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা না হইলে—ভারতীয় জনসজ্জা ও যন্ত্রসজ্জা সংযুক্ত না হইলে, পৃথিবীর জনশক্তির ক্ষতি, ফ্যাশিস্ত শক্তির লাভ,—ভারতবর্ষের মুক্তিও দূরদূরান্তরে ভাসিয়া যাইবে।

এই মূল রাষ্ট্রীয় দৃষ্টির ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় এই—ফ্যাশিস্ত বিরোধী জনযুদ্ধেরই দায়ে ভারতবর্ষে জাতীয় রাষ্ট্রের অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা; তাহার প্রয়োজনীয় ভিত্তি—ভারতীয় জনশক্তির ঐক্য-প্রতিষ্ঠা; আর তাহার চাই এমন কার্যক্রম যাহাতে একই কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই রাষ্ট্রাধিকার আমাদের অর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং ফ্যাশিস্ত প্রতিরোধের সমস্ত উপায় অক্ষুণ্ণ থাকে, বরং আরো দৃঢ়তর হয়।

কথাটা খুব সরল শোনাইল না। কিন্তু দুনিয়ার অবস্থাই সরল নয়। তেমন অবস্থায় সরল কার্যক্রম কাহারও হইতে পারে না—সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনও বাধ্য হইয়া সোভিয়েটের সঙ্গে হাত মিলায়; 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' না খুলিলেও ষ্টালিন ব্রিটেনের বন্ধুতা অস্বীকার করে না; ব্রিটিশ জনগণও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীকে

চাপ দেয়, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে না। আমাদেরও তাই পথটা সূক্ষ্ম, এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরফলার উপর দিয়া।

এইরূপে মূল রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্থির হইলে প্রশ্ন উঠে—এই যুদ্ধে এই মুহূর্তে আমাদের সর্বদলীয় ঐক্য কেন চাই; আর আমাদের যুদ্ধপদ্ধতি কি হইতে পারে। এ যুগের যুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার সামরিক পদ্ধতিও নির্ভর করে আমাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর।

জাতীয় ঐক্যই যে আমাদের এই যুদ্ধ, দেশরক্ষা প্রচেষ্টার ও জাতীয় সংগ্রামের প্রারম্ভিক রূপ তাহা এইখানে মনে রাখা দরকার। চীনের মাওৎসে-তুং প্রমুখ নেতাদের কথা ও যুদ্ধ-পদ্ধতি স্মরণে রাখিলেই ইহা বুঝিতে দেরি হয় না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চাই জাতীয় ঐক্য—সাম্রাজ্যবাদের প্রথম নীতিই হইল—Dividè and rule, ভেদ সৃষ্টি করা। চীন সেই নীতি ব্যর্থ করিতে পারিতেছে বলিয়াই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই চীনে আসন গাড়িতে পারিতেছে না; ঠিক এই কারণেই জাপানীরা মাঞ্চুকুতে এক 'সম্রাট্' খাড়া করিয়াছে, নানকিং-এ ওয়াংকে দাঁড় করাইয়া চীনাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। চীনাদের হাতেও প্রধান অস্ত্র তাহাদের ঐক্য। আবার আমার মনে রাখা দরকার—এই যুদ্ধের মূলরূপ হইল জনশক্তির ও ধনিক শক্তির লড়াই। ধনিক শক্তির আসল [illegible] ফ্যাশিস্তরা। সেই ফ্যাশিজ্‌ম অবশ্য প্রচণ্ড বলের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু সেই বল প্রত্যেক দেশে আয়ত্ত করে সর্বাগ্রে কিরূপে?—অস্ত্রধারীদের জোরে নয়। **সর্বাগ্রে তাহার দরকার**

হয় জনশক্তির দুর্জয় বলকে খর্ব করা। ইহা সে করে জনশক্তির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া—জনগণের পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়া, দ্বন্দ্ব বাঁচাইয়া রাখিয়া। **এই ভাবেই ফ্যাশিস্তরা প্রত্যেক দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে**—কি জার্মানিতে, কি ইতালিতে, কি ফ্রান্সে। প্রত্যেক দেশের জন-শক্তির তাই **ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে প্রারম্ভিক সংগ্রাম হইল নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।** তাই আমাদেরও আত্মরক্ষার স্বাধীনতার জন্য চাই সর্বদলীয় ঐক্য।

এ যুগের যুদ্ধের যে রূপ এখন পর্যন্ত আমরা দেখিলাম—দুইটি মোটা কথায় তাহার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে,—যন্ত্রসজ্জা (Machanization) অর্থাৎ শিল্পসজ্জা ও সৈন্যসজ্জা, এবং জনসজ্জা (Mobilisation of Masses)। মাত্র কোনো একটিতে এ যুগের যুদ্ধ সম্ভব নয়। জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দিক হইতেও নিজের সংগ্রাম-পদ্ধতি নিশ্চয়ই স্থির করিতে হয়। রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে আসিলে আমরা অবশ্য শিল্প-সজ্জা, সৈন্যসজ্জা ও জনসজ্জা সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিতে পারি—কি করিতে পারি, চীনের ও সোভিয়েট দেশের জনপ্রতিরোধেই সেই আভাস মিলে। রাষ্ট্রশক্তি হাতে না আসিতে আমাদের প্রয়াস আংশিক হইতে বাধ্য, আর সেই প্রয়াসও বহুলাংশ সাম্রাজ্য-বাদীদের দ্বারা ব্যাহত হইবে। আপাতত আমরা অস্ত্রশস্ত্র পাইবার আশাও করিতে পারি না। কিন্তু চিরদিন অস্ত্র হইতে ব্রিটিশ শাসকেরাও আমাদের বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আর

নিরস্ত্র জনগণও যে প্রতিরোধ কোনো কোনো দিকে করিতে পারে তাহাও আমরা জানি। এই সব কথা মনে রাখিয়াই আমাদের যুদ্ধ-প্রয়াস আমাদের দিক হইতে আমাদেরই গঠন করিতে হইবে—সাম্রাজ্যবাদীদের দায়ে নয়, ভারতীয় স্বাধীনতার দায়ে।

আমাদের সুবিধা এক্ষেত্রে এই যে, সোভিয়েট বা চীনের মতই আমাদের দেশ বিশাল ;—আমরাও দুই এক প্রদেশ হারাইতে' পারি, প্রস্তুত হইবার মত তথাপি সময় থাকে। দ্বিতীয়ত চীনের অপেক্ষা বেশি,—সোভিয়েটের অপেক্ষা অনেক কম,—আমরা শিল্প-সমৃদ্ধ ; তাই শত্রুর আক্রমণ আমরা খানিকটা সামলাইতে পারি। তৃতীয়ত আমাদের জনসংখ্যা অতুলনীয়—যান্ত্রিক সৈন্যে পরিণত না করিতে পারিলেও তাহাদের রাষ্ট্রীয় সেনায় (Partisan Force বা Militia) পরিণত করা সম্ভব। তাহার জন্য কি প্রয়োজন, চীনের অভিজ্ঞতায় তাহা জানিতে পারি,—কংগ্রেসই একদিন তাহাও নির্দেশ করিয়াছে। প্রধানত স্ব-সম্পূর্ণ পল্লীগঠন,—অর্থাৎ পল্লীরক্ষা সমিতি গঠন ও পল্লীরক্ষিদল গঠন, এক কথায়, 'পঞ্চায়েতি রাজ' বা 'গ্রাম্য-সোভিয়েটের' গোড়াপত্তন করা। ইহার ভিত্তি হইবে পল্লীর হিন্দুমুসলমান সকলকার ঐক্য এবং মোটামুটি একটা সমবায়ে জীবন গঠন—সমবায় নীতির উপর পল্লীর জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠা, শহরে শ্রমিকের সহযোগিতার উপর শিল্পায়োজন প্রতিষ্ঠা, (দ্রষ্টব্য *Scorched Earth*, Edgar Snow, ও Chinese Coops-এর কার্যক্রম)। এই জনগণের ঐক্য

ও সমবায় মূলক সামাজিক বনিয়াদ স্থির হইল ফ্যাশিস্ত বিরোধী সংগ্রামের জন্য দরকার পল্লীর জনসেনা ও ভাবী গেরিলা সেনাকে শিক্ষিত করা। জনরাষ্ট্র হইলে এই জনসেনা (People's Militia) বা গৃহরক্ষিদল (যেমন ব্রিটেনের Home Guard) অস্ত্রশস্ত্রের সহায়ে কিরূপভাবে সংগঠিত হইতে পারে, তাহা চীনে, সোভিয়েট দেশে ও ব্রিটেনে আমরা দেখিয়াছি (বিশেষ দ্রষ্টব্য শিবশঙ্কর মিত্রের 'বাংলার মাটিতে গেরিলা যুদ্ধ', *New Ways of War* by Tom Wintringham ; *Home Guard for Britain* ও *War in Europe* by Slater ; চীনের *People's War* by Epstein, *Red Star over China* by Edgar Snow ; সোভিয়েট দেশে *In the Rear of the Enemy* by Pyalakov) ; তাহা না হইলেও আমরা এ যুদ্ধে দেখিয়াছি—(১) শত্রুর "Attack in Depth," 'পঞ্চমবাহিনী' সৃষ্টি, ও (২) অনুপ্রবেশের (infiltration, যেমন মালয়, ব্রহ্মে দেখা গেল) বিরুদ্ধে জনসেনাই একমাত্র পাল্টা জবাব ; ট্যাংক প্রভৃতি যন্ত্রাস্ত্রের বিরুদ্ধেও জন-প্রতিরোধ নিতান্ত তুচ্ছ নয় (দ্রষ্টব্য, Illustrated London News ও Hugh Slater-এর বই) ; ইহাকেই Slater বলেন—"Defence in Depth."* 'সার্বত্রিক'

* সামরিক লেখকবৃন্দ সাধারণত এই কথাটির দ্বারা বুঝান "প্রশস্ত প্রতিরোধ-ক্ষেত্র," যেমন সিগফ্রিড্ ক্ষেত্র বা বর্তমানে রুশদেশে জার্মান প্রতিরোধ-ব্যূহ। সেই হিসাবে স্লেটারের কল্পিত ব্যবস্থাকে Defence Depth না বলিয়া অন্য কিছু বলা উচিত, যেমন Defence force interior বা Defence People.

বা 'সার্বজনীন' প্রতিরোধের দ্রষ্টব্য এই :—দেশের কোনো স্থানই শত্রু যেন অরক্ষিত না পায়, আর দেশাধিকৃত হইলেও কোনো স্থানেই যেন শত্রু চাপিয়া বসিতে না পারে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে—এই গেরিলার যুদ্ধ-সমাবেশ 'সম্মুখ যুদ্ধের' সমাবেশ নয়,—সে প্রশ্নও উঠে না; আর তাহার রণকৌশল battleএর নয়,—'tip and run'এর কৌশল। সমাবেশের দিক হইতে গেরিলা যুদ্ধ—(১) আক্রমণ-(attack)মূলক ;—এক নিমেষের জন্যও গেরিলা প্রতিরোধ (defence) করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে না। (২) এই কৌশল তাই আঘাত করিয়াই সরিয়া পড়া ('tip and run'), শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে চড়াও হওয়া। তাহার সমাবেশের লক্ষ্য—(৩) শত্রুর উপকরণ ক্ষয় করা (wearing out), সম্মুখ যুদ্ধে (battle) শত্রুসৈন্যকে ধ্বংস (annihilation) বা জয় করা নয়; অর্থাৎ লক্ষ্য শত্রুর materials, not men। (৪) ইহার সমস্ত কৌশল নির্ভর করে প্রায়ই ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর ও সাময়িক সুযোগের উপর। যুদ্ধের যে কয়টি গোড়াকার নীতি বা Principle-এর (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩২) উপর এই গেরিলা রণ-নীতির ভিত্তি তাহা এই :—(১) hitting বা 'আঘাত হানা', (২) তাহার পরেই সরিয়া পড়া অর্থাৎ নির্বিঘ্নতা (guarding); (৩) অতর্কিতে আক্রমণ (surprise); (৪) তাই সচলতা (mobility); (৫) অবস্থাধীনে গেরিলার লক্ষ্য ও কৌশল পরিবর্তন (fexibility),—কখনো লক্ষ্য শত্রুর পাহারা সৈনিক,

তাহার বন্দুক বা অস্ত্র ; কখনো শত্রুর রসদের ভাণ্ডার, কখনো তাহার যানবাহন ; আবার কখনো গেরিলা শুধু গুপ্তবেশে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে, তাহাকে ভুল পথে চালায়, ভুল সংবাদ দেয়; কখনো বহু রূপে ও বহু উপায়ে সে শত্রুকে ক্ষয় করে। সাধারণ সৈনিকের অপেক্ষা এই সব দিকে গেরিলাদের উপযোগিতা বেশি। (৬) এইজন্যই বলা যাইতে পারে ইহাতে যথার্থ বল-সুব্যয়ও (economy of force) হয়। সশস্ত্রবাহিনী যাহার দুর্বল বা নির্জিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার পক্ষে ইহাতেই সত্যকার 'বল-সদ্ব্যয়'। (৭) কিন্তু গেরিলা দলের সংগঠনে চাই সুদৃঢ় ঐক্য—কমরেডরি—শুধু পরস্পরের মধ্যে নয়, জনগণের সঙ্গেও একাত্মতাবোধ। এইজন্যই সমবায়িক জীবনযাত্রা ইহার ভিত্তি করা দরকার। ইহার ফলে পূর্ণ সহযোগিতা ('unity of the men', এবং 'unity of the guerrilas and the people') জনগণে ও গেরিলা দলে (co-operation) সম্ভব। (৮) আর চাই রাষ্ট্রীয় চেতনা—না হইলে গেরিলা গঠিতও হইতে পারে না, টকিতেও পারে না। এই দুই দিকেই সাধারণবাহিনী অপেক্ষাও গেরিলাদের কার্যক্ষমতা বেশি।

অবশ্য গেরিলা দলের স্থান ও কালোচিত শিক্ষা প্রয়োজন, ট্যাঙ্ক নষ্টের, ট্রেন নষ্টের উপায়, পথঘাটের সব খোঁজ রাখিতে হয়, আর অস্ত্রশস্ত্রও যত লাভ হয় (যদি দুর্বহ না হয়) ততই সুবিধা (বাঙালী জনসাধারণের পক্ষে দ্রষ্টব্য—'বাংলার-মাটিতে গরিলা যুদ্ধ,' শিবশঙ্কর মিত্র ; *New Ways of War* p. 90 ff)। এই

গেরিলারা জনসেনারও একাংশ হইতে পারে—যেমন চীনা গেরিলারা ৮ম রুট আর্মির সহিত অনেকেই সংযুক্ত; আবার দল ছাড়া সৈনিকও হইতে পারে—যেমন রুশ গেরিলাদের মধ্যে আছে অধিকৃত অঞ্চলের পূর্বতন লালফৌজের লোক। কিন্তু জনসেনা বাহিনীরও অন্য দরকার আছে—প্রয়োজনমত শত্রুকে সম্মুখেও বাধা দিতে হয়। এইরূপ বাহিনীই চীনের ৮ম রুট বাহিনী, ব্রিটেনের হোমগার্ড। তাহাদেরও সমাবেশ ও রণকৌশল মোটামুটি গেরিলাদের মতই হয়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মনস্বী মাও-ৎসে-তুংর কথা হইতে তাহার ইঙ্গিত পাইতে পারি :

"আমাদের লড়াই চলে শত্রুর পিছনে ও পার্শ্বে। ৮ম রুট আর্মির লড়াইয়ের কৌশলকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উদ্যোগে সচল গেরিলা যুদ্ধ (mobile guerrilla warfare of independent *initiative*) বলা যাইতে পারে" উহারও প্রধান বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম পদ্ধতি, unity of the officers and men and unity of the army and the people, তাহার জন্য প্রথমত চাই যথার্থ সম্মিলিত ফ্রন্টের গবর্ণমেণ্ট; দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের জীবনপ্রণালীকে উন্নত করা—জমির খাজনা, সুদের বোঝা, ভারী ট্যাক্স মকুব করা—একটা সামাজিক সংস্কারের পরিকল্পনানুযায়ী দেশ সংগঠন (*North China Front*, James Bertram; *New Age V 12, Ed.* S. V. Ghate).

এরূপ সংগঠনের বৈপ্লবিক ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই ঐক্যের বনিয়াদ এই জনবাহিনী, এই সামরিক সংগঠন,—ইহার মধ্য দিয়াই

ভারতবর্ষেও আমরা এই যুগের যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে পারি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উজান ঠেলিয়া সেই সম্মুখে আমাদের যাহাই আসুক, জাপানের লঘুচারী অনুপ্রবেশকারী দল কিংবা জার্মানির যন্ত্রসজ্জিত মহাবাহিনী—আর ইহারই মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদী বাধা ছিন্ন করিয়া। আমরা এদেশে পূর্ণ করিতে পারি সার্বজনীন যুদ্ধ, মুক্ত করিতে পারি যুদ্ধের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা।

ইহাই জনযুদ্ধ; আর "A 'People's War', blazing up all over the country, will eventually prevent the victor from reaping the full fruits of his victory."

কথাটা ষ্টালিনের নয়, মাও-ৎসে-তুং-এরও নয়;—কথাটি এ যুগের জার্মান যুদ্ধ-পদ্ধতির গুরু লুডেনডর্ফের।
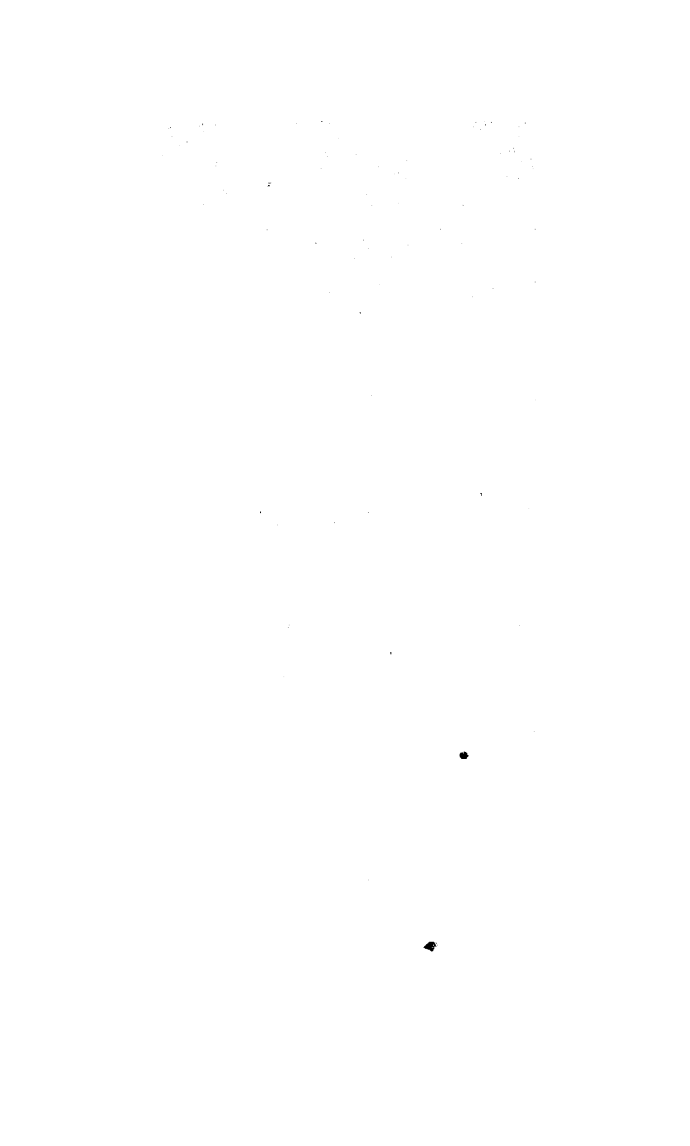
সংযোজনী ও সংশোধনী

(১) যুদ্ধের দ্বিতীয় অঙ্ক

যুদ্ধ চলিতেছে—আজ তাহার যে অবস্থা কাল সে অবস্থা থাকে না। তাহার রূপ পরিবর্তিত হয়, পদ্ধতি বদ্‌লায়, প্রত্যেকটি সামরিক নীতি ও কৌশলেরও মূল্য কমে-বাড়ে। এইজন্যই যুদ্ধ লক্ষ্য করিবার মত—উহা একটা চলন্ত ঘটনাস্রোত, একটা Process, যুদ্ধ 'স্থা' ধাতুর যুগে একেবারে নিষ্পন্ন জিনিস নয়। ব্যাকরণের ভাষায় উহা 'নিত্য বর্তমান' নয়, 'ঘটমান বর্তমান'—'ঘট'-ধাতুর পরিণতি; আর সেই পরিণতিও নির্ভর করে 'কৃ'-ধাতুর নিত্য-নূতন সংযোগের উপর। প্রতি নিমেষে সেই 'কৃ'-ধাতুর যোগ ঘটিতেছে—রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, সামরিক ক্ষেত্রে,—যুদ্ধরত জাতিদের চেষ্টায়, এমন কি, যুদ্ধের বহিঃস্থ জাতিদেরও চেষ্টায় বা নিশ্চেষ্টতায়।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ যখন শেষ হইতেছে তখন কয়েকটি বড় বড় ঘটনা ঘটিতেছে—সমগ্র যুদ্ধের সামরিক অবস্থা তাহাতে পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই ঘটনাগুলি এই—

(১) উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় এ্যাংগ্লো-আমেরিকান অভিযান—বিজার্টা ও টুনিসের যুদ্ধে শীঘ্রই ইহার পরিণতি ঘটিবার কথা।

সমস্ত ইউরোপীয় যুদ্ধের উপর ইহার সামরিক ফল কি, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন ষ্টালিন। উত্তর আফ্রিকার

অভিযান সম্পর্কে মস্কোর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমরেড ষ্টালিন নিম্নলিখিত জবাব দেন :—

"প্রশ্ন :—আফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই নূতন অভিযানকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কি দৃষ্টিতে বিচার করিতেছেন ?
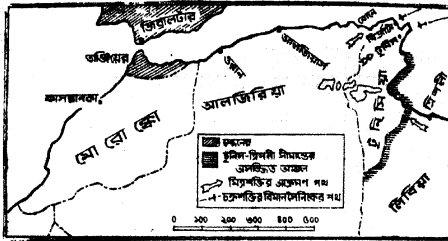
উত্তর :—এই অভিযানকে সোভিয়েট খুবই গুরুত্বরপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করে। মিত্রশক্তির ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিরই ইহা পরিচায়ক। ইহার ফলে ইউরোপে মিত্রশক্তির অনুকূলে রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা যুক্ত জার্মাণ-ইতালিয়ান শক্তিকে তাড়াতাড়ি ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। মিত্রশক্তি যে সফলভাবে সামরিক অভিযান চালাইতে পারে ইহা হইতে তাহাই ভালভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সফলতার সহিত স্থল ও জলপথে এই [illegible] আক্রমণ এবং এইরূপভাবে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া শহরের পর শহর দখল করা কেবল প্রথম শ্রেণীর সংগঠনকারীদের পক্ষেই সম্ভব।

প্রশ্ন :—এই অভিযান সোভিয়েটের উপর হইতে চাপ কমাইবার পক্ষে কতটা কার্যকরী হইবে? সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে নূতন আর কি সাহায্য দরকার হইতে পারে?

উত্তর :—এই অভিযানের ফলে সোভিয়েটের উপর হইতে চাপ কতটা কমিবে এত শীঘ্র তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে যে, ইহার প্রভাব কম হইবে না; শীঘ্রই সোভিয়েটের উপর চাপ অনেকটা কম হইবে এবং নিকট ভবিষ্যতে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। সব চাইতে বড় কথা এই যে, ইহা দ্বারা লড়াইয়ের আক্রমণোদ্যোগ আজ আমাদের মিত্রশক্তির হাতে আসিয়া পড়িল এবং সামরিক অবস্থা ইঙ্গ-সোভিয়েট-মার্কিন যুক্তশক্তির অনুকূলে বদলাইয়া গেল। ইহার ফলে ইউরোপে হিটলারী জার্মানীর শক্তি খর্ব হইল এবং বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশে হিটলারবিরোধী শক্তি-গুলির কাজ শুরু করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আর একদিক হইতেও ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—ইহার ফলে ইতালি যুদ্ধের শক্তি হিসাবে অকেজো হইয়া পড়িবে এবং জার্মানি একা পড়িয়া যাইবে।

ইহা দ্বারা ইউরোপে জার্মানির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘাটিগুলির নিকটেই **দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করার প্রাথমিক ব্যবস্থার পত্তন হইল** এবং জার্মানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইবার পক্ষেও ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট।

প্রশ্ন :—সোভিয়েট সৈন্যদের উপর ইহার প্রভাব কি?

যুদ্ধ-জয়কে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আনিবার জন্য তাহারা কি মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিবে ?

উত্তর :—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে **লালফৌজ তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবে।**"

(২) সলোমন দ্বীপপুঞ্জে জাপানী নৌবাহিনীর পরাজয় (১৩-১৫ নবেম্বর) :—ইহাতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরেও মার্কিন নৌবল আবার জাপানীদের সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

(৩) মধ্য ককেশিয়ায় অর্ডজনিকিড্জেতে সোভিয়েট-বাহিনীর জয়লাভ (এবং ১৯শে নবেম্বর হইতে সমগ্র সোভিয়েট রণাঙ্গনে সোভিয়েট শক্তির প্রত্যভিযান—সোভিয়েট-যুদ্ধের চতুর্থ পর্ব ইহাতে শুরু হইল।)
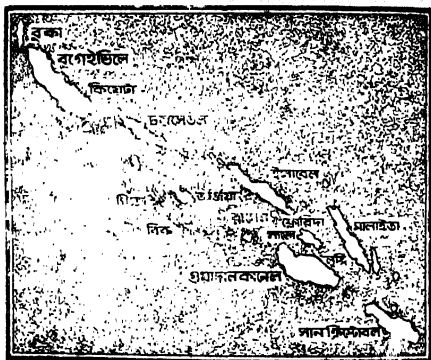
(৪) তুরিনে, জিনোয়ায় ও ইউরোপে মিত্রশক্তির ক্রমাগত বোমাবর্ষণ।

এই সবে মিলিয়া মনে করা যাইতে পারে সমগ্র যুদ্ধেরই দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হইল। চার্চিল মিত্রশক্তির যুদ্ধের তিনটি সামরিক অঙ্ক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪১এ, কেনাডার পার্লিয়েমেণ্টের বক্তৃতায়)—প্রথম অঙ্ক সংগঠন ও প্রস্তুতির ('of consolidation, of combination and of final preparation'); দ্বিতীয় অঙ্ক পুনরুদ্ধারের ('of liberation'); তৃতীয় অঙ্ক চক্রশক্তির স্বগৃহাক্রমণ ('an assault upon the citadels of humiliation of the guilty parties')। প্রথম অঙ্কের ও দ্বিতীয় অঙ্কের ইহা সন্ধিক্ষণ—এখন মিত্রশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন সমরোদ্যোগ স্বহস্তে গ্রহণের জন্য (Battle for Intiative)—ইহারই পরিণতি মুক্তিযুদ্ধে ও পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে।

এই নবেম্বর বিপ্লবের শেষদিনে এই যুদ্ধাঙ্কের রাষ্ট্রীয় অর্থ তবু বুঝিবার মত। এই অঙ্কের নেতৃত্ব এখনো এ্যাংলো-আমেরিকান শাসক-শ্রেণীর হাতে রহিয়াছে—ঐসব দেশের জনশক্তির বা পৃথিবীর জনশক্তির হাতে আসে নাই। তাহারা দারলাঁর সহিত হাত মিলায়, মরোক্কো টুনিসিয়ার জনগণের মুক্তির কথা ভাবে না, এই অঙ্ক যদি 'মুক্তিযুদ্ধে' শেষ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সূচনাকে ভিত্তি করিয়া সর্বদেশীয় জনশক্তিরও এই নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্যোগী হইতে হইবে; না হইলে জনশক্তির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হইবে না। অর্থাৎ এক বৎসর পূর্বে মিত্রশক্তির যুদ্ধোগুমে প্রগতির ধারা প্রবল হইতেছিল, আজ আবার সেই শিবিরেই রক্ষণশীলতার ধারা মাথা তুলিতেছে। এমনি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই ইতিহাসের গতি—ইহার জন্যই যুদ্ধও process, প্রগতিকামীদের তাই দেখা প্রয়োজন—ব্রিটেনে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র জনশক্তি যেন উদ্যোগ আয়ত্ত করিতে পারে, 'সার্বজনীন যুদ্ধের' সুযোগ,—এ যুগের যুদ্ধের বিপ্লবী সম্ভাবনা,—খোয়াইয়া না ফেলে। এই জন্যই এ যুদ্ধ বুঝিবার মত—এবং যুঝিবার মত।

২। পরিভাষা

পরিভাষার প্রশ্ন বরাবরই কঠিন, যথাসম্ভব তাই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শব্দও দেওয়া হইয়াছে। সামরিক পরিভাষা গঠনে আমাদের দেখা দরকার (ক) তাহা যেন সর্বভারতীয় হয়,—উর্দু জঙ্গী বিভাগের নামকরণ যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে পারিলে ভালো হয়। (খ) সেই উর্দু নাম যেন বাঙালী পাঠকের কাছে ইংরেজির মতই একেবারে 'বিদেশী' না হয়। (গ) হয়তো কোনো কোনো শব্দ ইংরেজি হইতেই গ্রহণ করা ভালো—যেমন ষ্ট্র্যাটেজি, ট্যাক্‌টিক্‌স্। ভাষান্তর করিতে হইলে আমি ষ্ট্র্যাটেজির বাংলা 'সমর-সমাবেশ' ও ট্যাক্‌টিক্‌সের বাংলা 'যুদ্ধ-পদ্ধতি' (এই বইতে 'রণকৌশল' করিয়াছি) করিবার পক্ষপাতী। কোনো সর্বভারতীয় হিন্দুস্থানী কথা কি আছে?

৩। বিদেশী নামের বাংলা করা

এই দিকে এই বইতে ত্রুটী রহিল। কোনো কোনো নাম ইংরেজি লেখা দেখিয়া যথাসম্ভব বাংলায় লিপ্যন্তর করিয়াছি, কোনো কোনো নাম তদ্দেশীয় উচ্চারণানুযায়ী বাংলা বর্ণে দিতে গিয়াছি, আবার কোনোটিতে তাহা করি নাই, কোনোটি এমন হইয়াছে যাহা কোনো দেশেরই উচ্চারণানুযায়ী নয়। এইরূপ গ্রন্থে জায়গার নাম ও মানুষের নাম যে কত বিচিত্র তাহা বলা বাহুল্য। মনে হয় ভবিষ্যতে এইরূপ একটা নিয়ম গ্রহণ করাই সমীচীন হইবে—(১) জায়গার বা মানুষের বা যুদ্ধজাহাজের যে নামগুলি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বাঙালী শিক্ষিত পাঠক সহজে চিনিতে পারে তাহা না বদ্‌লানো—যেমন, সিপিও (Scipio), স্কিপিও (?) নয়। মিশর, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ, রুশ ইত্যাদি। (২) যদি বাংলায় অত সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ সব নামের হিন্দুস্থানীতে কোনো সুপ্রচলিত রূপ থাকিলে তাহা গ্রহণ। (৩) ইংরেজি বানান-পদ্ধতি হইতে যেখানে আমাদের নিকট কোনো নাম পরিচিত হইয়া হইয়া গিয়াছে সেখানে তাহাই গ্রহণ—যেমন ভিয়েনা (Wien), ফ্রেডারিক দি গ্রেট, সিডান (Sedan), সোভিয়েট (Soviet), ষ্টালিন, ইত্যাদি। তত্তদ্দেশীয় উচ্চারণ ঠিক না জানা পর্যন্ত এইরূপই ভাল। (৪) যেখানে নাম প্রথম লিপ্যন্তর করিতে হয় শুধু সেখানেই উচ্চারণ ঠিক জানা থাকিলে তত্তদ্দেশীয়

উচ্চারণানুযায়ী লিপ্যন্তর করা—যেমন নাৎসি, লুফৎভাফে, রাইষ্টাগ (Reichstag), ক্লউসেভিৎস্, ফন্ হিণ্ডেন্‌বুর্গ, রেনো, স্থগল, চ্যানো (Ciano) ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চারণ ঠিক না জানিলে ইংরেজি উচ্চারণ নীতি অনুযায়ী নাজি, লুফ্‌টুওয়াফ প্রভৃতি লেখা অপরাধের বিষয় নয়।

৪। গ্রন্থোক্ত বিষয়ে মন্তব্য

ছাপার সাধারণ ভুল উল্লেখ করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিব-না, শুধু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথাগুলিই সংক্ষেপে (স্থানাভাব-বশত) বলা হইল।

পৃঃ ৩। ব্লিৎস্‌ক্রীগ্ ও টোটেল যুদ্ধে মূলগত সম্পর্ক আছে কিনা সন্দেহস্থল। ব্লিৎস্‌ক্রীগ গত যুদ্ধের strategical ও tactical অভিজ্ঞতার ফল; টোটেল যুদ্ধ সে যুদ্ধের সংগঠন বা জাতীয় রণসজ্জার দোষত্রুটি আবিষ্কারের ফল।

পৃঃ ৭। যুদ্ধের কর্তৃত্বের তর্ক সব দেশেই আছে, শুধু জার্মানির বৈশিষ্ট্য নয়। 'জার্মান সেনাপতি মণ্ডলের' নাম Grosse General Stab; Reichswehr = জার্মান্ বাহিনী।

পৃঃ ৮। নির্বিচারে জাহাজ ডুবানো কে চাহিয়াছিলেন? লুডেনডর্ফ তাঁহার War Memoirs-এ এই দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছেন। ইহার জন্য তাহা হইলে দায়িত্ব জার্মান নৌকর্তাদের Holtzenduft ও Tirpitz-এর। লুডেনডর্ফ 'ফন্' ছিলেন না।

পৃঃ ৯। হিটলারের যুদ্ধ-নেতৃত্ব অবশ্য রাষ্ট্রনায়কের যুদ্ধ-নেতৃত্ব লাভ জার্মান সেনাপতি মণ্ডলেরই পরাভব-স্বীকার। নেপোলিয়নের সম্বন্ধে প্রধান কথা—তিনি সেনানায়ক বলিয়াই রাষ্ট্রনায়ক হন।

পৃঃ ২৪। সমুদ্রশক্তির শক্তিবিচারে এথেন্সের যুক্তি ভুল। কারণ শেষ পর্যন্ত স্পার্টার হাতে তাহার শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

পৃঃ ২৭। বিমান বহরের কাজ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে বোধ হয় বুঝা সহজ হয়: (ক) বিমানের স্বতন্ত্র সমাবেশ, (খ) স্থল-বাহিনীর সহিত সহকারিতা; (গ) নৌ-বলের সহিত সহকারিতা। ইহার পরে বিভিন্ন অনুবিভাগ করা যায়।

পৃঃ ৩০। ফস্‌-কে 'ফো' বলা একটি হাস্যকর ভুল।

পৃঃ ৩৭। **'যুদ্ধবিদ্যা', 'সেনাপত্য', 'ষ্ট্র্যাটেজি', 'ট্যাক্‌টিক্‌স্‌' ইত্যাদি**; ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইল তাহা এই গ্রন্থের পক্ষে দীর্ঘ, কিন্তু উক্ত বিষয় দুইটির আলোচনা হিসাবে অসম্পূর্ণ। তাই, কষ্ট স্বীকার না করিলে পাঠক ভুল বুঝিবেন, কষ্ট স্বীকার করিলে পাঠক উহাতে ভুল পাইবেন। তথাপি এদিকে সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহল আছে, তাই বাংলায় আমি উহার একটা আলোচনার সূত্রপাত করিলাম।

এই দুই বিষয়ে জেনারেল ওয়াভেলের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ও নিম্নে তাহা যোগ করা হইল (What is Military Genius? *Statesman*, Oct. 23, 1942)। লিডেল হার্ট মনে করেন সৈন্যবাহিনী ও রণক্ষেত্র ক্রমশই বিশাল হইয়া পড়ায় আজকাল

ট্যাক্‌টিক্‌সের অপেক্ষা ষ্ট্র্যাটেজির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। জেনারেল ওয়াভেল তাহা মানেন না। তিনি বলেন, "আমার বিবেচনায় ট্যাক্‌টিক্‌স্ অর্থাৎ রণক্ষেত্রে সৈন্য চালনার বিদ্যা, ষ্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ রণক্ষেত্রে সৈন্যদের সুযোগপূর্ণ স্থলে আনয়ন বা সমাবেশ করার অপেক্ষা বরাবরই সেনাপতির পক্ষে বেশি কঠিন ও বেশি গুরুতর কাজ ছিল, তাহাই থাকিবেও। ("I hold tactics, the art of handling troops on the battlefield, is and always will be a more important and more difficult part of the General's task than strategy.")

ষ্ট্র্যাটেজির মূলসূত্রগুলি জেনারেল ওয়াভেল সহজবোধ্য বলিয়াই মনে করেন। ট্যাক্‌টিক্‌সের মূল ভিত্তি তাঁহার মতে এইরূপ: সচলতা (mobility), রক্ষাবর্ম (armour) ও আক্রমণ-শক্তি ('hitting power')—এই তিন জিনিসের ঠিক সমতা-সাধন। নূতন নূতন আবিষ্কারে ইহাদের অনুপাতে তারতম্য ঘটিতেছে, যিনি যখন ঠিক অনুপাত ধরেন ঠিক ট্যাক্‌টিক্‌স্ তিনি তখন প্রয়োগ করিতে পারেন। তাহাই কিছু দিন চলে—কিন্তু নূতনতর আবিষ্কারে আবার তারতম্য ঘটে, নূতনতর সমাধান তখন আবার দরকার হয়।

জেনারেল ওয়াভেল সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার কথা বলিয়াছেন "সেনাপত্য" বিষয়ে। সেনাপতিদের ছোট বড় বিচারে দেখা দরকার—প্রত্যেক সেনাপতির ষ্ট্র্যাটেজিষ্ট হিসাবে মূল্য, ট্যাক্‌-টিসিয়ান্ হিসাবে দক্ষতা, নিজের সরকার ও মিত্রপক্ষীয় সরকারদের

সঙ্গে আদান-প্রদানের নিপুণতা, সৈন্যদের শিক্ষা দিবার বা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষমতা এবং সংগ্রাম ও সংগ্রামের ব্যবস্থাকার্যে তাঁহার উদ্যম (energy) ও সংকল্পে দার্ঢ্য (driving power)। সেনাপতি ও সেনাপত্য সম্বন্ধে তাঁহার ১৯৩৯ সনের Lees Knowles বক্তৃতাই প্রসিদ্ধ (Penguin Series-এ প্রকাশিত *General and Generalship*, *Statesman*এ 1941-এর April 15, 16, 17-তে উদ্ধৃত)। তিনি প্রথমত সেনাপতির গুণগ্রামের উল্লেখ করেন—উহার প্রধান কথা দার্ঢ্য, ইহাকেই বলা হয় 'চরিত্র'। তারপর যুদ্ধের প্রক্রিয়া বা "mechanism of war" সম্বন্ধে চাই সেনাপতির জ্ঞান (কার্যস্থল, গতি ও সরবরাহ,—'topography', 'movement', 'supply',—এই তিনের সংযোগে যুদ্ধের যন্ত্র চালিত হয়), ইহাকেই বলা চলে 'logistics' বা 'জঙ্গের ইন্তিজাম',—সৈন্যদের প্রেরণ, রসদাদির বন্দোবস্ত প্রভৃতি কাজ—ইহার উপর ওয়াভেল খুবই জোর দেন। (এ যুগে অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন অজস্র বাড়ায় এদিকে সেনাপতিদের মানসিক গুণগ্রামের অপরিমিত প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে)। দ্বিতীয় গুণ, ওয়াভেলের মতে, সহযোগী মণ্ডলের (staff) সঙ্গে সেনাপতির কাজ চালাইবার দক্ষতা, ও সৈনিকদের আস্থা-অর্জনের ক্ষমতা। তৃতীয় গুণ—নিজ দেশের ও মিত্র-দেশের রাজনীতিকদের বিশ্বাস অর্জনের শক্তি।—এই সব গুণের তুলনায় ষ্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকৃটিক্‌সের সূত্র আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য—ইহাই জেনারেল ওয়াভেলের অভিমত।

পৃঃ ৪২। এইরূপ ছক্‌এর মধ্যে Strategy ও Tactics সাজাইতে গেলে অনেক সময়ে ভুল হইবে। যেমন, Army Group আজ শুধু মাত্র Battle-এও প্রযুক্ত হয়।

পৃঃ ৬৪। 'যুদ্ধের বিবর্তন' শুধু ইউরোপে যুদ্ধের বিবর্তন রূপেই এখানে দেখা হইয়াছে। এশিয়ার ইহাতে সামান্যই দান আছে। কিন্তু ব্রিটেনের ক্রমওয়েল্, মার্ল্‌বরো বা ওয়েলিংটনের দান সামান্য নয়; আমেরিকার 'লী'র দানও বিশেষ স্মরণীয়। স্থানাভাবে উহা বাদ পড়িয়াছে। তবে এ যুগের যুদ্ধ বুঝিবার জন্য আমি বিবর্তনের ধারাটিই শুধু লক্ষ্য করিতে বলি।

পৃঃ ৬৭, ১৫ পংক্তি, Cyril Falls নামটি ভুলক্রমে "Cocil Falls" হইয়াছে।

পৃঃ ১০১, ১৬ পংক্তি, 'বল' (force) নহে, 'বলে' (called)।

পৃঃ ১০২। পদাতিকের অস্ত্রের মধ্যে 'বেয়নেট' আমি ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করি নাই, কিন্তু উহাও ব্যবহৃত হয়।

পৃঃ ১১২। পাঁচ হাজার মাইল পাল্লার বোমারু বিমানের কথাও শোনা যায়। কিন্তু জঙ্গী বিমান অতদূর যাইতে পারে না। তথাপি দূর পাল্লার বোমারুর effective range দুই হাজার মাইলের বেশি। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে জিনোয়া, তুরিন প্রভৃতিতে বোমাবর্ষণ ও জঙ্গী-সঙ্গী ছাড়া বোমারু বিমানের একা অভিযান, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা যুদ্ধের এক নূতন পদ্ধতির আভাস দেয়।

পৃঃ ১২২, ১২ পংক্তি, ফন 'সেক্ট' (Seect) নাম, 'সীকৃট' নয়।

পৃঃ ১২৩, ১১ পংক্তিতে, '১ম সংখ্যা' নয়, '২য় সংখ্যা'।

পৃঃ ১২৫, শেষ পংক্তিতে রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা বা Political Commissar-এর পদ এখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, লাল ফৌজের রাষ্ট্রীয় চেতনা আজ তীক্ষ্ণ ও সুগভীর।

পৃঃ ১৩৬, ১৭ পংক্তি, পান্‌ৎসার বাহিনীর অগ্রগতির বা আক্রমণের ধারণা লাভ করিবার জন্য দ্রষ্টব্য—*Illustrated London News*, April 26, 1941.

পৃঃ ১৭৯, ১৬ পংক্তিতে, 'গ্রেসেনাউ' নয়, সুপরিচিত 'গ্নেইসেনাউ' (Gneisenau)।

পৃঃ ১৮২-৮৩, মাতাপানের যুদ্ধ সম্পর্কে একটি কথা ভাবিবার আছে। হয়তো চক্রশক্তির এই যুদ্ধ-জাহাজগুলি মিত্রশক্তিদের ভুলাইয়া দূরে লইয়া আসিতে চাহিতেছিল। কারণ তখন লিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গোপনে চক্রশক্তি মালপত্র পারাপার করিতেছিল,—পরে রোমেল তাই আক্রমণ করিতে পারে। ইহা সত্য হইলে চক্রশক্তির ছলনা (feint) মোটের উপর সার্থকই হইয়াছিল বলিতে হইবে।

পৃঃ ১৮৯, লিবিয়ায় ইতালির সৈন্যবল বেশি থাকিলেও কাহারও কাহারও মতে এত বেশি ছিল না।

পৃঃ ১৯৪, পাদটীকায় 'পরিবর্তিত করিতে' নয়, 'পরিবর্তিত হইতে' হইবে।

পৃঃ ১৯৯, সমর্থনে উল্লিখিত গ্রন্থ ও লেখকের লিখিত প্রবন্ধাদি

একই সঙ্গে দ্রষ্টব্যরূপে উল্লেখিত হইবে, স্বতন্ত্র নয়। ৮ম পংক্তিতে 'বিমানবাহী ট্যাংক' নয়, 'ট্যাংকবাহী বিমান' হইবে।

পৃঃ ২০৬-৭, এই সময়কার নানা ক[illegible]বাদিক Ralph Ingersoll-এর *Covering All Fronts* নামক সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। উহাতে তথ্য কম, কিন্তু বেশ একটি জীবন্ত চিত্র আছে।

পৃঃ ২১২, 'যানাবাস' নয়, "যানাবাস-পদ্ধতি" হইবে।

পৃঃ ২১৬, ২১ পংক্তি, 'রোডিনষ্টেদ' নয়, 'রোডিম্‌ট্‌সেভ্‌'।

পৃঃ ২১৯, ৬ পংক্তিতে 'গোজনি' নয়, 'গ্রোজনি' হইবে।

পৃঃ ২১৯, ১৬ পংক্তিতে 'Builds for' নয়, 'Speaks for'।

পৃঃ ২২৫, ১ পংক্তিতে 'তখন দেখিল' স্থলে 'তখন তাহারা দেখিল' হইবে।

পৃঃ ২২৫, ৬ পংক্তিতে 'এশিয়ার' নয়, 'এশিয়ায়'।

পৃঃ ২২৬, ১১ পংক্তিতে 'পিছিয়ে-পড়া' নয়, 'পিছাইয়া-পড়া'।

পৃঃ ২২৭, ৯ পংক্তিতে 'শক্তি,—' স্থলে 'শক্তি', ; 'নৌচুক্তি।' স্থলে 'নৌচুক্তি,—' হইবে।

পৃঃ ২২৮, ২ পংক্তিতে ' সৈন্য-শিক্ষকদের' স্থলে 'জার্মান সৈন্য-শিক্ষকদের' হইবে।

পৃঃ ২২৯, ৫ পংক্তিতে 'করিল' স্থলে 'করিল।' হইবে।

পৃঃ ২২৯, ১৭ পংক্তিতে 'তাহারা' স্থলে 'চীনা সৈন্য' হইবে।

পৃঃ ২২৯, ২০ পংক্তিতে 'প্রায়' স্থলে 'শিল্প' হইবে।

ঃ২৩০, ২ পংক্তিতে 'সোভিয়েট' বাদ যাইবে; ঐ শব্দটি ৩ পংক্তিতে 'চীনের' অগ্রে বসিবে।

পৃঃ ২৩১, ৪র্থ পংক্তিতে 'পড়ে—' নয়, 'পড়ে।' হইবে।

পৃঃ ২৩২, শেষ পংক্তি, 'তাহারা' স্থলে 'ব্রিটেন ও আমেরিকা' হইবে।

পৃঃ ২৩৩, ৭ পংক্তিতে 'হল্যাণ্ডের মত' নয়, 'মত' বাদ যাইবে।

পৃঃ ২৩৩, ১৪ পংক্তিতে 'মার্কিন' স্থলে 'মানিলা' হইবে।

পৃঃ ২৩৫, ৮ পংক্তিতে 'রুশিয়াতে' নহে, 'বর্ণিয়োতে' হইবে।

পৃঃ ২৩৮, ১ম পংক্তিতে 'এপ্রিল' নহে, 'ডিসেম্বর', তাহা বলা বাহুল্য।

পৃঃ ২৩৯, 'স্যর টম ফিলিপ্' নয়, 'ফিলিপ্স'। পার্ল হার্বাবের ক্ষতির যথার্থ হিসাব ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪২এ বাহির হয়। ১২ পংক্তিতে 'সাইগন হইতে' কথাটি বাদ যাইবে। বলা বাহুল্য 'সাইগন' তা'ইদেশে নয়, ফরাসী ইন্দোচীনে।

পৃঃ ২৪১, ১ম পংক্তিতে 'তাহা অপেক্ষাকৃত' স্থলে 'তাহার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত' হইবে।

পৃঃ ২৪৩, ১২ পংক্তিতে 'বর্মীরা ইহাদের' নহে, 'বর্মীরা চীনাদের' হইবে।

পৃঃ ২৪৩, ১৭ পংক্তিতে 'সেথানকার বাসিন্দারা জাপানী' স্থলে 'সেথানকার জাপানী বাসিন্দারা' হইবে।

পৃঃ ২৪৪, ৩য় পংক্তিতে 'করেজ্জিও' নয়, 'করেজ্জিডোর' হইবে।

পৃঃ ২৪৫, ১৯ পংক্তিতে 'গুরুত্বও, কারণ' স্থলে শুধু 'গুরুত্ব' পড়িতে হইবে।

পৃঃ ২৪৬, ২য় পংক্তিতে 'দাবি করিল' এর পরে '—' হইবে।

পৃঃ ২৪৭, ১৭ পংক্তি 'স্থাপন' নয়, 'স্থাপন করা [illegible]বে।

পৃঃ ২৪৮, ৮ পংক্তিতে 'নৌতরীর' নহে, 'নৌব[illegible]' হইবে।

পৃঃ ২৫০, ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'প্রয়োগে' র স্থলে 'প্র[illegible]।'

পৃঃ ২৫১, ১০ পংক্তিতে 'ইহাই' নহে, 'অনু[illegible]শ রীতির সফলতার' পড়িতে হইবে।

পৃঃ ২৫২, ৩য় পংক্তিতে 'কুরগু' নহে, 'কুরুগু'।

পৃঃ ২৫৩, ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'ও সামরিক' স্থলে 'সামরিক ও' হইবে।

পৃঃ ২৫৯, শেষ পংক্তি 'Defence in Depth' সম্বন্ধে ২৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকা স্মরণীয়। তাই এই অর্থে এই কথা প্রয়োগ না করাই শ্রেয়ঃ। ইহাকে বলা উচিত—Defence from Interior বা Defence by the People.

পৃঃ ২৬৩, ১৯ পংক্তিতে 'যন্ত্রযুদ্ধ ;' নয়, 'যন্ত্রযুদ্ধ।' হইবে।

পৃঃ ২৬৫, ৮ পংক্তিতে 'অন্যদিকে জনশক্তির' নয়। 'অ[illegible]কের শক্তি জনশক্তি' হইবে।

পৃঃ ২৬৫, ১৫ পক্তিতে 'নিষ্ফল', নয়, 'নিষ্ফল,—' হইবে।

পৃঃ ২৬৭, ১৪ পংক্তিতে 'তাহার চাই' স্থলে 'তাহার সঙ্গে সঙ্গে চাই' হইবে।

পৃঃ ২৬৭, ১৮ পংক্তিতে 'বরং আরো' স্থলে 'বরং সেই ব্যবস্থা আরো' পড়িতে হইবে।

পৃঃ ২৬৮, ৮ পংক্তিতে 'প্রারম্ভিক রূপ'-এর পরে 'কমা' বসিবে।

পৃঃ ২৬৮, ১৮ পংক্তিতে 'আমার' নয়, 'আমাদের' হইবে।

পৃঃ ২৬৮, ২১ পংক্তিতে 'প্রত্যেক দেশে আয়ত্ত করে,' নয় 'প্রত্যেক দেশে ফ্যাশিস্তরা আয়ত্ত করে' হইবে।

পৃঃ ২৬৯, ২য় পংক্তিতে 'জনগণের পরিবারের' নয়, 'জনগণের পরস্পরের' হইবে।

পৃঃ ২৬৯, ৭ম পংক্তিতে 'আত্মরক্ষার' স্থলে 'আত্মরক্ষার এবং' হইবে।

পৃঃ ২৭০, ৯ম পংক্তিতে 'অপেক্ষা অনেক কম' স্থলে 'অপেক্ষা অবশ্য অনেক কম' হইবে।

পৃঃ ২৭০, ১৯ পংক্তিতে 'সমবায়ে' নয়, 'সমবায়িক' হইবে।

পৃঃ ২৭১, ১ম পংক্তিতে 'হইল' স্থলে 'হইলে' হইবে।

১৭ পংক্তিতে *Illustrated London News*-এর (Aug. 9, 1941, pp. 166-7,) চিত্রাবলী বিশেষ উল্লেখ্য।

পৃঃ ২৭১, পাদটীকা—ইংরেজি কথা কয়টি একেবারে ভুল ছাপা হইয়াছে ; হইবে—'Defence in Depth', 'Defence from Interior' বা 'Defence by the People'।

পৃঃ ২৭৩, ১৯ পংক্তিতে 'উপায় পথঘাটের' নয়, 'উপায় ও পথঘাটের' হইবে।

পৃঃ ২৭৪, মধ্যখানকার সমস্ত প্যারাটাই উদ্ধৃতি।

পৃঃ ২৭৪, শেষ পংক্তিতে 'বনিয়াদ' নয়, '[illegible]দ,' হইবে।

পৃঃ ২৭৫, প্রথমাংশ কমা, দাড়ি প্রভৃতির অপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগে দুর্বোধ্য হইয়াছে। ২য় পংক্তিতে 'উজান ঠেলিয়া' নয়, 'উজান ঠেলিয়া ; এবং' হইবে। ৩য় পংক্তিতে 'আসুক,' নয়, 'আসুক—' হইবে। ৪র্থ পংক্তিতে 'মহাবাহিনী—আর' স্থলে 'মহাবাহিনী—' হইবে। ৫ম পংক্তিতে 'ছিন্ন করিয়া।' নয়, 'ছিন্ন করিয়া' হইবে।

পৃঃ ২৭৭, 'সংযোজনী ও সংশোধনী' ১৯৪২-এর নবেম্বর মাসে লেখা হইয়াছে। ইহার পরে অনেক ঘটনাই ঘটিতেছে। ম্যাপও সেই অর্থে পুরানো হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই অংশেও ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে ; হয়তো তাহা সহজেই চোখে পড়িবে। যেমন, ২৮১ পৃঃ, ৯ম পংক্তিতে 'চক্রশক্তির স্বগৃহাক্রমণ' নয়, 'গৃহাক্রমণ' ; ১৩ পংক্তিতে 'Intiative' নয়, Initiative' ; ১৮ পংক্তিতে 'তাহারা' স্থলে 'শাসকশ্রেণী' ; শেষ পংক্তিতে 'হইবে ;' নয় 'হইবে।' হওয়া চাই। ২৮২ পৃঃ, ১২ পংক্তিতে 'উর্দু জঙ্গী বিভাগের' স্থলে 'জঙ্গী বিভাগের উর্দু' ও শেষ পংক্তিতে 'সর্বভারতীয় হিন্দুস্থানী' স্থলে 'সর্বভারতীয় বা হিন্দুস্থানী' হইবে। বলা বাহুল্য, স্থান ও তারিখের উল্লেখে আরও ত্রুটি রহিয়াছে।

মিত্রশক্তির সরবরাহের পথ
মিত্রশক্তির অধিকারে
জাপানের অধিকারে
চীন
ভারতবর্ষ
কলিকাতা
বর্মা রোড
আন্দামান
ফিলিপাইন
দ্বীপ পুঞ্জ
ওয়েক দ্বীপ পুঞ্জ
মিডওয়ে দ্বীপ পুঞ্জ
হাওয়াই
দ্বীপ পুঞ্জ
সামোয়া
অষ্ট্রেলিয়া
মিত্রশক্তির সরবরাহের পথ